প্রকাশ কালঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশকঃ শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা—৯

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়

ভিতরের আলোকচিত্র : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :

শ্রীসুকুমার ঘোষ

নিউ বৈশাখী প্রেস

৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন

কলকাতা—৬

অশোককুমার সরকার

মণীন্দ্রনাথ সেন

গৌরাঙ্গসুন্দর চৌধুরী

সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁচ খাম্পা

বন্দু জয়াল

কেদার সিং

আজীবা

পেম্বা নরবু

পাসাং ফুটার

কারমা

এবং অন্য সবাই

যাঁরা 'জায়গা বানানে কো লিয়ে'

এর মধ্যেই

হিমলোকে চলে গেছেন।

শেরপারা মৃত্যু মানে না।

কেউ ইহলোক ত্যাগ করে গেলে

ওরা বলে

সাথীদের জন্ত তাঁবুর জায়গা বানাতে

উপরে চলে গেছে।

ভূমিকার বদলে

মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য শিষ্যা শ্রীমতী মীরা বেন তাঁর জন্মভূমি অস্ট্রিয়ায় নব্বুই বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। মীরা বেন ছিলেন নিবেদিতা, অ্যাণ্ডরুজ প্রভৃতির কনিষ্ঠতমা। পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় যে তাঁর ভারতের কথা মনে পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মীরা বেনের শেষ-ইচ্ছায় সেই ভারতবর্ষ এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে হিমালয়ে। মীরা বেন তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত শেষ-মিনতিতে বলেছেন, হিমালয়ের পরিবেশটা রক্ষা কর।

মীরা বেনের এই মিনতিটা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ সে-কথা একদিন আমাদের অনেক চোখের জলের মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে। গত সিকি শতাব্দীর মধ্যে হিমালয়ের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমনভাবে নষ্ট করা হয়েছে যা এর আগে পাঠান-মোগল-ফিরিঙ্গি আমলেও হয়নি। পরিহাসের কথা এই যে, ঠিক এই সময়টিতেই আবার হিমালয়কে নিয়ে হৈ-হৈ করা হয়েছে সবচাইতে বেশি। পর্বতারোহণ, পর্যটন আরও কতো। এই হই-চইয়ের মধ্যে একটা কথা আমরা বেমালুম ভুলে গেছি—সেটি হল হিমালয়ের পরিবেশ—যেই পরিবেশে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে, যেই পরিবেশ নষ্ট হলে ভারতবর্ষও নষ্ট হবে। সত্য কথা এই যে হিমালয়ের পরিবেশ বলতে সঠিক কি বোঝায় সে-সম্পর্কেই আমাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই।

হিন্দুরা কোনদিনই হিমালয়কে নিছক একটা প্রাকৃতিক বিস্ময় বলে ধরে নেয়নি। হিমালয়কে দেবভূমি করে তুলেছে। অন্তত পাঁচ হাজার বছরের সাধনা। কত সাধক, পর্যটক, কবি, যাত্রী—যার যত কিছু আছে সবকিছু দিয়ে—এই হিমালয় গড়ে উঠেছে। হিমালয়কে আমরা যেমন একটা জড়পদার্থ থেকে ত্র্যম্বকের যুগ যুগ সঞ্চিত অট্টহাসিতে পরিণত করেছি, হিমালয়ের কাছ থেকে তেমনি আমরা পেয়েছিও দুহাত ভরে। ভারতবর্ষ বলতে আজও আমরা যেটুকু যা বুঝি প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে তার সবকিছুই এই হিমালয় থেকে প্রবাহিত। হিমালয়ের পরিবেশ নষ্ট হলে ভারতের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

গত পাঁচ হাজার বছরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিপর্যয়কর কত অজস্র উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্তু আমাদের হিমালয়-সাধনা কখনোই তেমনভাবে বিঘ্নিত হয়নি। কখনো কোনো জোরওয়ার সিং অথবা অন্য কেউ হয়তো হুড়মুড় করে

ঢুকে পড়েছে—হিমালয় তাদের আপন করে নিয়েছে, তারাও হিমালয়-সাধনার সমিধ হয়ে গেছে। হিমালয়ের পরিবেশের উপর প্রথম আক্রমণ শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশরা শিকার করে খুব গৌরববোধ করতেন। সুবিস্তৃত ডুন এবং তরাই এলাকা ছিল তাঁদের লীলাক্ষেত্র। এই এলাকার যাবতীয় পশুপাখি তাঁরা মোটামুটি সাফ করে গেছেন। হিমালয়ের অরণ্য সম্পদেও হাত দিতে হয়েছে, কেন না বাষ্পীয় এঞ্জিন চালাবার জন্য কাঠের দরকার হয়। আজ যখন বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য সাহেবরা খুব উৎসাহের সঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে তখন হাসি পায়। এতটুকুতেই এতবড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে তা হতে পারে না। ব্রিটিশরা কিছু কিছু রাস্তাঘাটও খুলেছিল, কিন্তু তেমন কোনো বাণিজ্যিক সম্ভাবনা না থাকায় তার জন্য কোনো তাড়া ছিল না। ধীরে সুস্থে যে কয়টা রেল বা মোটর পথ তৈরি হয়েছে তা হিমালয়ের ধ্যান ভাঙবার মতো নয়।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মন্দাকিনী উপত্যকায় কেদারযাত্রীর ও কালীগঙ্গা উপত্যকায় কৈলাসযাত্রীর সাক্ষাৎ মিলত। দেখে চট করে বোঝা যেত না, কিন্তু এরা ছিল আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সৃষ্টিশীল হিমালয়-যাত্রার একেবারে শেষের দিককার যাত্রী। পেছন দিক থেকে মোটর রাস্তা ধাওয়া করে আসছে, মাঝে মাঝে ডিটোনেটরের বিকট আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু সেসব সত্ত্বেও হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকা পথে তখনও যাত্রীদের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যেত।

তারপরই সবকিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। উন্নয়ন এল, র্যটন এল, আর সবশেষে ভীমগর্জনে এল প্রতিরক্ষা। চতুর্দিকে মোটর রাস্তা ছড়িয়ে পড়লো, পুরানো তীর্থপথ বাতিল হয়ে গেল, চটিগুলো মুখ থুবড়ে পড়লো, আর তার বদলে গজিয়ে উঠলো অজস্র ছোট টাউনশিপ। বিবিধ-ভারতীর কোলাহলে পাহাড়ী ঝর্ণার কলতান চাপা পড়ে গেল। ছড়িদারকে হটিয়ে দিয়ে এল সরকারী ট্যুরিস্ট অফিসার, নম্র চটিওলার বদলে এল ধূর্ত হোটেলওলা। কুড়ি বছর আগেও তুষার-রেখায় পৌঁছতে হলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্যপথ অতিক্রম করতে হতো। সেই অরণ্য এখন উধাও হয়ে গেছে, এখন মোটরে চেপেই তুষার-রেখায় পৌঁছে যাওয়া যায়। আর এইসব তো রোগের বহির্লক্ষণমাত্র।

গত বছর কুড়ির মধ্যে হিমালয়ের যে কতদূর সর্বনাশ হয়ে গেছে চেষ্টা করেও এখন আমরা তা বুঝতে পারব না—সে ক্ষমতা আমরা হারিয়েছি। পাঁচ হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা একটা গৌরবময় ঐতিহ্য মাত্রই কুড়ি বছরের মধ্যে একেবারে উধাও হয়ে গেল—পুরাতত্ত্ববিদদের একদিন এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

পুরানো দিনের ধর্মকর্ম, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিংবা বিকৃত হয়ে বীভৎস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের ক্ষেত্রে যা অনেকদিন ধরে দুশো বছর আগে ঘটে গেছে, ওদের বেলায় তাই ঘটল মাত্র দশ-পনেরো বছরের মধ্যে—আমাদের চোখের সামনে—আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের তত্ত্বাবধানে।

হিমালয়ের এই সর্বনাশ রোধ করা প্রয়োজন একথা সকলেই মুখে বলেন, কেউ বিশ্বাস করেন না। হিমালয় না থাকলে আমরাও থাকব না এই সহজ কথাটির লেশমাত্রও যদি আমরা বুঝতাম তবে আমাদের আচরণ ভিন্নরকম হতো। আমরা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি যে যুগের গতি রোধ করা সম্ভব নয়, হয়তো সমীচীনও নয়। কিন্তু এর মধ্যে কপটতা আছে। আসল কথা এই যে মোটর-রাস্তা সম্প্রসারিত করবার সময় হিমালয়ের কথা আমরা ধর্তব্য বলেই গণ্য করিনি—ওটা তখন নিছক একটা জড় প্রতিবন্ধকতা। সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করাটাই যখন সবচাইতে জরুরী কাজ হয়ে দাঁড়ায় তখন এমনই হয়—ভবিষ্যতটাও যে বিপন্ন হয়ে পড়ছে সেদিকে খেয়াল থাকে না। পাপ ঢাকবার জন্য শীঘ্রই হয়তো একটা 'সেভ হিমালয় সোসাইটি' স্থাপন করা হবে।

একদিকে যখন পূর্ণোদ্যমে ধ্বংসের কাজ চলেছে ঠিক তখনই আবার হিমালয়কে পূর্বগৌরবে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখা হাস্যকর। মীরা বেন তা জানতেন না এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। তবুও তাঁর অন্তিম প্রার্থনা—হিমালয়ের পরিবেশ রক্ষা করো। এই প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল। এতে করে আমাদের আবার মনে পড়ল যে উত্তরোত্তর ক্রততর গতিতে হিমালয়ের পরিবেশ নষ্ট হয়ে চলেছে। মীরা বেন আবার মনে করিয়ে দিলেন যে, ভারতের প্রাণ হিমালয়।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে যাকে বাঁচানো যাবে না তার কথা চিন্তা করে কি হবে? এই প্রশ্ন কেবল তাকেই শোভা পায় যে চিরতরে হার মেনেছে। সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে বলেই হিমালয় চিরদিনের মতো হেরে গেছে এমন কথা চিন্তা করা পাপ। হয়তো সময় নেবে, দু-চার-পাঁচশ বছর তো হিমালয়ের চোখের নিমেষ, কিন্তু হিমালয় আবার একদিন উজ্জ্বলতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবেই। এখানেই কেউ যেন ফস করে বলে না বসেন যে তাহলে তো আর কিছু করবার প্রয়োজন রইল না—সব আপদ চুকল। ঠিক তা নয়, এ-ব্যাপারে আমাদের দিক থেকেও কিন্তু কিছু করবার আছে। আলপস বা অ্যানডেস বা পামীরে যা হয়নি হিমালয়ে তাই হয়েছিল। হিমালয় দেবতাত্মা হয়ে উঠেছিল। সেটি ঘটেছিল অনেকের অনেকদিনের সাধনায়। বুড়োবয়সে হিমালয়-তীর্থে যাবে বলে গৃহস্থ যখন সারাজীবন ধরে নিজের গ্রামের প্রান্তে বসে পাথেয় সঞ্চয় করেছে তখনই সে হিমালয়কে সৃষ্টি

করেছে। যে হিমালয় যুগযুগান্তর ধরে ভারতকে রক্ষা করেছে, সেই ভারতকে রক্ষা করবার নামেই আজ হিমালয়কে বিদীর্ণ করা হচ্ছে—একেই বলে ইতিহাসের পরিহাস। হিমালয় থেকে আমরা দূরে সরে এসেছি বলেই হিমালয়ের উপর আমাদের অধিকার শিথিল হয়ে গেছে। আগের মতো প্রাণমন সমর্পণ করে না হোক, বেঁচে-বর্তে থাকতে হলেও হিমালয় আমাদের চাই-ই, একথাটা আমরা যেদিন সত্য করে বুঝতে পারব সেদিন থেকেই আবার নতুন করে হিমালয় সৃষ্টির কাজ শুরু হয়ে যাবে। ধ্বংসও তখন পিছু হঠতে শুরু করবে। কথাটা মনে থাকলে নিতান্ত প্রমোদভ্রমণে গেলেও প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু পরিমাণ হিমালয় সৃষ্টি করে আসা সম্ভব হবে। এমনি করেই হিমালয় একদিন গড়ে উঠেছিল। এমনি করেই হিমালয় আবার গড়ে উঠবে। বিদায় নেবার আগে মীরা বেন যে প্রার্থনা করে গেছেন তার আবশ্যকতা ছিল—জীবনের শেষ-মুহূর্তেও তিনি কিঞ্চিৎ হিমালয় সৃষ্টি করে গেলেন।

আমার হিমালয়-যাত্রা শীঘ্রই ত্রিশ বছরে পা দেবে। অন্তত একটি বিষয়ে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে একনিষ্ঠ থেকেছি—ঘটনাটা বিশ্বাস করতে নিজেরই কেমন কষ্ট হয়। তবুও এটিকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে দাবী করা চলবে না। এই কলকাতা মহানগরীতেই এখনো এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা এ-ব্যাপারে রজত-জয়ন্তী, এমনকি হীরক-জয়ন্তী অতিক্রম করে এখনো পরমানন্দে হিমালয়-যাত্রা করে চলেছেন। এঁরা আমার সশ্রদ্ধ ঈর্ষার পাত্র। তবে ঐতিহাসিক না হলেও আমার হিমালয়-যাত্রার মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

আমি প্রথম হিমালয়ে যাই তীর্থযাত্রী হিসেবে। প্রায় দু'শ মাইল হেঁটে কেদার বদরি করেছি, দু'মাস ধরে প্রায় ছয় শ' মাইল হেঁটে কৈলাস মানস-সরোবর ঘুরে এসেছি। অন্য দশজন তীর্থযাত্রীর মতোই পথের সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি। তবে একটা তফাৎ ছিল। অন্য সবাইয়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল, আমার তা ছিল না। থাকবার কথাও নয়। যে শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজে আমি লালিত-পালিত সেখানে পঁচিশ বছর বয়সে ঈশ্বরে মতি হলে তা পাগলামি বলে ধরে নেওয়া হয়—পরীক্ষা অথবা চাকরির ইনটারভিউ দিতে যাবার সময় অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়েও তাহলে কেন এত কষ্ট-স্বীকার করে হিমালয়ে যেতাম? কিছুটা আত্মগরিমা বোধ করতাম ঠিকই কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না। আসলে কোন বড়ো ঘটনাই কারণ দেখিয়ে দলিল পেশ করে ঘটে না। ঘটনা অনেকদূর গড়িয়ে গেলে তখন চৈতন্য হয় যে, আকণ্ঠ ডুবে আছি। এখানে বলবার কথা এটাই যে, ধর্মে মতি না থাকলেও তীর্থ-মাহাত্ম্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইনি। সৎসঙ্গে পড়লে তার প্রভাব পুরোপুরি এড়ানো যায় না। তীর্থযাত্রীদের অনুগামী হয়ে সেই এক হিমালয় দেখেছি—শান্ত গম্ভীর নির্মম নির্বিকার নিরবধি। অবিশ্বাসের বেড়াটা ছিল তাই রক্ষা, নইলে কি হতে কি হয়ে যেতে পারত তা কে বলতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি হিমালয়ে যাই পর্বত অভিযাত্রী হিসেবে। কয়েকটি

আকস্মিক যোগাযোগের পরিণামে আমাকে লাঠি ছেড়ে আইস-অ্যাক্স্ ধরতে হয়। নন্দাঘুন্টি অভিযানের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। ওই একই দলের সঙ্গে তারপরে আরো চারটি বড়ো মাপের হিমালয় অভিযানে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। এই অভিযানগুলোর কথা ভাবলে এখন প্রায় জন্মান্তরের স্মৃতি বলে মনে হয়। এমন পুঞ্জ পুঞ্জ আনন্দ-কোলাহলের মধ্যেও দিন কেটেছে—পুরানো অ্যালবাম খুলে না বসলে আজকাল আর সেকথা নিজেরই বিশ্বাস হয় না। দল বেঁধে হিমালয়ে যাবার পৃথক একটা উন্মাদনা আছে। সবাই মোটামুটি একই মেজাজের—তাই একই সমস্যায় সবাই একসঙ্গে মুহ্যমান হয়েছি, একই আনন্দে সবাই একসঙ্গে নর্তিত হয়েছি। অভিযানের দুঃখ-কষ্টগুলি স্থায়ী হয় না, আনন্দটা দিন দিন আয়তনে এবং গভীরতায় বাড়তে থাকে। পর্বত অভিযানের সেই দিনগুলি এখন গুচ্ছ গুচ্ছ হাসির মতো একটু অনুকূল বাতাস পেলেই হো-হো করে ওঠে, জীবনের যন্ত্রণা বঞ্চনা অনেকটা লাঘব করে দেয়।

এই পর্বত অভিযানগুলোর কাছে আমাদের আরও কিছু প্রত্যক্ষ ঋণ আছে। এই অভিযানের সূত্র ধরেই আমার একটি স্থায়ী চাকরী হয়—সাংবাদিকের চাকরী। ঘটনাটা আরও কিছুদিন আগে ঘটলে পুরো ব্যাপারটিকে সাক্ষাৎ পুণ্যফল বলে চালিয়ে দেওয়া যেত—এই বিজ্ঞানের যুগে কথাটা মনের মধ্যেই পুষে রাখা নিরাপদ। এছাড়া আরও একটি প্রাপ্তি ঘটেছিল। আমরা সবাই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলাম। নন্দাঘুন্টি নিয়ে বাঙালী যত হৈ-হল্লোড় করেছে, ব্রিটিশরা এভারেস্ট নিয়েও ততটা করেনি—দুঃসাহস জিনিসটা বাঙালী যেমন তারিফ করতে জানে তেমন আর কেউ নয়। দিনের পর দিন কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে। লক্ষ্মী পূজার দিন পুরুতমশাইকে নিয়ে যেমন টানা-হ্যাঁচড়া হয়, সম্বর্ধনা দেবার জন্য আমাদের নিয়েও তেমনি টানা-হ্যাঁচড়া করা হয়েছে। মোহনবাগানকে নিয়েও ১৯১১ সনে এতটা করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। কলকাতা পৌরসভাই দু-দুবার নাগরিক সম্বর্ধনা দিয়েছে। বাঙালীর মাথা, এই পাবলিসিটির ঠেলায় যদি বিগড়ে যেত তবে সেটাকে কোনক্রমেই জাতীয়তাবিরোধী কাজ বলা চলত না। আমরা বেঁচে গেছি কারণ অভিযানগুলো থেকে আমার প্রচুর হাসি সংগ্রহ করে এনেছিলাম—মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তার পর বক্তা যখন আমাদের দুঃসাহসিকতার কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলতেন আমরা তখন চোখের ইশারায় পুরানো দিনের কোন রসিকতা স্মরণ করে মনে মনে হেসে কুটিকুটি হতাম। নির্মল আনন্দ আর কাকে বলে।

কিন্তু আমার এই অভিযাত্রী ভূমিকার মধ্যেও একটু গোলমাল আছে। পর্বত

অভিযাত্রী হিসেবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধার কিছু কিছু এখনো ভোগ করে চলেছি— এখনো সাংবাদিকের চাকরি করছি এবং পৌরসভার দেওয়া হাতঘড়িটি এই মুহূর্তেও কব্জিতে টিকটিক করছে, প্রথম পরিচয়ের সময় আজও কেউ কেউ বিস্ময়-প্রকাশ করে বলে,—'আপনিও সেখানে ছিলেন।' —কিন্তু তবুও সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রচলিত বিধি অনুযায়ী আমি নিজেকে একজন পুরোদস্তুর অভিযাত্রী বলে দাবী করতে পারি না। পর্বতারোহণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারী অর্থানুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে এদেশে গুটিকয়েক সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলোর কোন একটি থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া গেলে তবেই কেবল প্রকৃত পর্বতারোহী হওয়া যায়, তবেই কেবল কোন পর্বত অভিযানের সদস্য হয়ে পাহাড়ে চড়বার অনুমতি পাওয়া যায়—চাকরির বেলায় যেমন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি, অনেকটা সেরকম।

পর্বতারোহণ বিষয়ে আমার কোন ডিগ্রি নাই, আমি নিরক্ষর। যাত্রী হিসেবে পথে বেরিয়ে দশচক্রে অভিযাত্রী হয়ে গেছি। কাঠবেড়ালী না হলে রামায়ণের সেতুবন্ধন হয় না, অতএব অধিকারবলেই অভিযানে স্থান পেয়ে গেছি। তবে নানারকম ভেক ধরতে হয়েছে—কখনো ম্যানেজার, কখনো রিপোর্টার। এদের কাজেই মূলশিবির থেকে আরও উপরে উঠবার প্রয়োজন হয় না। আরও উপরে উঠবার একটুকু বাসনাও আমার কোনকালে ছিল না। দৈহিক কষ্টকে উপভোগ করতে হলে তাকে একটা সীমার মধ্যে রাখতে হয়। কারো কারো সীমা এভারেস্ট শীর্ষ হতে পারে; কিন্তু আমার সীমা অভিযানের মূল শিবির। উপরে না যাওয়ার আরও একটি নারেতি যুক্তি এই ছিল যে, উপরে গিয়ে হঠাৎ যদি কোন দুর্ঘটনায় পড়ে যায় তবে তাই নিয়ে পুরো দলটা নৈতিক মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়বে— শত্রুরাও হাসবে।

মনে বিশ্বাস ছিল না বলে যেমন তীর্থযাত্রীদের সহচর হয়েও তাঁদের থেকে কিছুটা দূরে থাকতে হয়েছে, পর্বতারোহণের ডিগ্রি নেই বলে তেমনি অভিযাত্রী-দের সহচর হয়েও তাদের থেকে আমাকে অনেকটা পিছিয়ে থাকতে হয়েছে। এতে করে নিশ্চয়ই বহুকিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তাই বলে কেবল লোক-সানের দিকটাকেই ভারি করে দেখলে চলবে না। যাত্রী এবং অভিযাত্রী উভয়কেই একটু তফাতে থেকে দেখবার সুযোগ পাওয়া গেছে এজন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

যাত্রা ও অভিযাত্রী একই হিমালয়ে যান বটে কিন্তু সেটা কেবল মানচিত্রের সত্য। হিমালয় এক এবং অদ্বিতীয়—কিন্তু তার বাইরে এদের দু'জনের ক্রিয়াকাণ্ড,

পূজাপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও উপায় সবকিছুই পৃথক, এমন কি পরস্পরবিরোধী। যাত্রী হিমালয়ে যায় পরজন্মের জন্য পুণ্য অর্জন করতে—ব্যক্তিগত উদ্যোগ, নিজেকেই পাথেয়র ব্যবস্থা করতে হয়—আর এর সাফল্য-অসাফল্যের হিসেব-নিকেশ হয় জন্মান্তরে—কোন তাড়াহুড়ো নেই। অপরদিকে অভিযাত্রীরা হিমালয়ে যায় বিশেষ একটি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করবার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্যয়বহুল ব্যাপার—দশজনের কাছ থেকে টাকা তুলতে হয়। অভিযানের সাফল্য-অসাফল্য তখন আপনা থেকেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাফল্যের জন্য এতটা উদগ্রীব হয়ে থাকতে হয় যে হিমালয়টাই অনেক সময় আড়ালে পড়ে যায়। অভিযাত্রীর কাছে হিমালয় হল কতকগুলি বিপজ্জনক প্রতিবন্ধকতার সমাহার—সেগুলো অতিক্রম করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হল। অপরদিকে যাত্রীর কাছে হিমালয় হল একটা আশ্রয়—যেখানে সে বিশ্রাম চায়।

তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, হিমালয়ের পথে যাত্রীকেও যেমন কখনো কখনো দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হতে হয়, তেমনি অভিযাত্রীকেও কখনো কখনো গিরিরাজের শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্যে মোহিত হতে হয়। দু'জনের পথ মাঝে মাঝে মিলে যায়। মিলে যে যায় তার অধিকতর নির্ভরযোগ্য সাক্ষীও আছে—স্বামী রামানন্দ ভারতীর লেখা 'হিমারণ্য' এবং ফ্র্যাংক স্মাইথের লেখা 'কামেট কনকার্ড' বইদুখানি পড়লেই বোঝা যায় যে, আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও এরা দু'জন আসলে একই পথের যাত্রী। যাত্রী ও অভিযাত্রীর এই আপাত বিরোধ ও নিগূঢ় একাত্মতা নিয়ে একটা বড়ো মাপের বই লেখবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল—সেটা খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে আর অভিযাত্রীরাও নানাকারণে বিভ্রান্ত। ভারতের হিমালয় যাত্রায় যে ঐশ্বর্য থাকলেও কোন চেষ্টা নেই, এই মূল্যবান কথাটি বর্তমানের মতো সকলের অজানা রইল। যাই-হোক, এই আলোচ্য গ্রন্থটি—না, আদ্যোপান্ত পাঠ করিনি—কেবল একটু নেড়েচেড়ে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। পুরোদস্তুর যাত্রী অথবা অভিযাত্রী না হওয়ায় যদি কিছু লোকসান হয়ে থাকে তবে সেজন্য ক্ষোভ করতে বসা চূড়ান্ত কৃতঘ্নতা হবে।

কথায় বলে—হিমালয় যাকে একবার ধরে—তাকে আর ছাড়ে না। কথাটির সত্যতা আমার উপর দিয়েই নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে। নেশা ও পেশা একাকার হয়ে যাওয়া নাকি খুব ভাগ্যের কথা। আমার এমনই গুরুবল যে, সাংবাদিকের চাকরি পাবার খুব অল্পদিনের মধ্যেই একদিকে ভারত-চীনে সীমান্ত সংঘর্ষ বেধে গেল এবং অপরদিকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য উত্তর-

পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিরা একের পর এক সশস্ত্র উপদ্রব শুরু করে দিল। দেশের এবং দশের উপকারার্থে এইসব গুরুতর বিষয়ে আলোকপাত করবার জন্য টানা দশ বৎসর আমাকে পূর্ব হিমালয়ে টহল দিয়ে বেড়াতে হয়েছে। অপিসের খরচে অথবা সরকারী বদান্যতায় পশ্চিমে দার্জিলিং থেকে সিকিম, ভূটান, নেফা বা অরুণাচল, এবং তারপর নাগা, মিজো, ত্রিপুরা, গারো, খাসিয়া প্রভৃতি তাবৎ পাহাড়ী এলাকায় প্রায় অবিরত ঘুরে বেড়িয়েছি অবশ্যই যতদূর জিপ যায় এবং অথবা সরকারী বাংলো আছে। এখানে বলা দরকার যে, হিমালয়ের সঙ্গে শেষোক্ত পাহাড়গুলোর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পর্ক না থাকলেও অন্যসব ব্যাপারেই এরা একই সুরে বাঁধা।

তবে নেশা আর পেশা একাকার হয়ে গেলে ব্যাপারটা পুরোপুরি লাভজনক নাও হতে পারে। নাথু-লাতে যতবারই গেছি, অথবা টাওয়াং যাওয়ার পথে সেলা'য় ততবারই বরফ পেয়েছি। হাটু অব্দি ডুবে যায় এমন নরম বরফ। কিন্তু এই বরফ সেই বরফ নয়—এই বরফের শেষে কোন পর্বতশীর্ষ বা তীর্থস্থান নেই। সরকারী সু-কভারের ভিতর থেকে এই বরফ কখনো একটু কৌতুকপ্রদ, কখনো একটু ক্লান্তিকর—তাছাড়া আত্মশ্লাঘা বোধ করবার অবাধ সুযোগ আছে। জিপের উইণ্ডস্ক্রীনের আড়াল থেকে বা সরকারী আনোয়াক্ গায়ে জড়িয়ে হিমালয়ের অন্তঃপুরে গিয়ে হাজির হলেও প্রকৃত হিমালয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—বা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

কিন্তু হিমালয় কখনও কাউকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে না। সাংবাদিকতার সুবাদে হিমালয়ের একটা অজ্ঞাত দিক একটু অন্তরঙ্গভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে —এরও কিছু মূল্য আছে। এর আগে হিমালয়ের অধিবাসীদের সম্পর্কে একটা প্রায়-রোমান্টিক ধারণা ছিল—ওদের দারিদ্র্য-টারিদ্র্য সমেত। ওদেরকে অভিশপ্ত দেবদূত বলে মনে হত—ওদেরকে একটু আবছাভাবে শ্রদ্ধা করতাম এবং ভালবাসতাম। পূর্ব হিমালয়ে এসে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম যে, ওরাও আমাদের মতোই মানুষ—তবে ততটা পোড় খাওয়া নয়। আমরা যেখানে রফা করি, ওরা সেখানে বিদ্রোহ করে। ত্রিশ বছরের উপর হয়ে গেল। পূর্ব হিমালয়ের সেই বিদ্রোহ যে কবে কোথায় শেষ হবে তা কেউ জানে না।

এখানে একটা প্রশ্ন আছে যা কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসা করবে বলে মনে হয় না। দায়ে পড়ে নিজেকেই তাই প্রশ্নটা উত্থাপন করতে হচ্ছে—কেননা প্রশ্নটা একটু জরুরি। —গাড়োয়ালে বা কুমায়ুনে যে সমস্যা নেই, নাগা বা মিজো পাহাড়ে সেই সমস্যা এল কোথা থেকে? সমতলবাসীদের প্রতি পাহাড়ী জাতির

সহজাত অবিশ্বাস একসময়ে গাড়োয়ালে কুমায়ুনেও নিশ্চয়ই ছিল—তার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকেনি। আর পূর্ব হিমালয়ে আগুন জ্বলছে আর ছড়াচ্ছে—ক্রমাগত। এই কুৎসিত পার্থক্যের কারণ কি? উত্তরটা খুবই সহজ। সমতলের প্রতিনিধি হিসেবে গাড়োয়ালে এবং কুমায়ুনে প্রথম যারা গেছে তারা যাত্রী। সেখানে প্রথমে হৃদয়ের লেন-দেন হয়েছে। আর পূর্ব হিমালয়ে সমতলের প্রতিনিধি হয়ে যারা প্রথম গিয়ে হাজির হল তারা ব্যাবসায়ী এবং প্রশাসন—সঙিন উঁচিয়ে, টাকারথলি নিয়ে। কথায়ই আছে, যাদৃশী ভাবনা যস্য।

কৈলাস পরিক্রমার সময় একদিন সায়াহ্নবেলায় প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে দিরাফুক গোম্ফায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম। গোম্ফাটির উচ্চতা প্রায় সতেরো হাজার ফুট। পথশ্রমে ও ঠাণ্ডায় আমাদের তখন প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। সেদিনের সেই দুর্যোগের সময় দিরাফুক গোম্ফার লামা ও ডাবাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিলাম তার কথা চিন্তা করলে আজও মন ভরে ওঠে—মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরে আসে। আমরা একে অপরের ভাষা জানতাম না, কিন্তু সেজন্য কোনই অসুবিধা হয়নি। সেদিনের সেই দুর্যোগের সন্ধ্যাটি আমাদের স্মৃতির একটি মূল্যবান সংগ্রহ হয়ে আছে।

পূর্ব হিমালয়ে টাওয়াং গোম্ফার অভিজ্ঞতাটি কিন্তু একেবারে ভিন্ন ধরনের। উচ্চতায় এটিও কম নয়—প্রায় এগারো হাজার ফুট। চারদিকে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী, টাওয়াঙেও সারাবছর তুষারপাত হয়। গোম্ফাটিও বেশ প্রাচীন এবং বনেদি। অনেক মহাত্মার সাধনাস্থল। তিব্বত ছেড়ে চলে আসবার সময় স্বয়ং দালাই লামা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এমন গোম্ফার আবহাওয়া একটু প্রসন্ন হবে সেটাই প্রত্যাশিত। সরকারী দোভাষীর সঙ্গে আমরা কতিপয় সাংবাদিক যখন টাওয়াং গোম্ফার সুপ্রশস্ত আঙিনায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন তা জনমান-বহীন—খাঁ খাঁ করছে। একটু আগেই যে এখানে বেশ কিছু লোক নানাকাজে ব্যস্ত ছিল তা বুঝতে কোনই অসুবিধা হল না। মনে হচ্ছিল যেন অনেকগুলো অদৃশ্য চোখ সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। এমন রহস্যময় অবস্থায় এর আগে কখনো পড়িনি। রহস্য যথেষ্ট ঘনিভূত হবার পর বিভিন্ন দিক থেকে কয়েকজন লামা বেরিয়ে এলেন—যন্ত্রচালিত রোবোটের মতো। সবকজনাই ধৈর্য ধরে সব কথা শোনে কিন্তু তারপরে আর রা কাটে না, চোখের দৃষ্টিও বোবা। এত কাছাকাছি এলেও মানুষে মানুষে এত দূরত্ব—ভাবলে আজও মন বিষিয়ে ওঠে। হিমালয়ের উপর বিশ্বাসটাই টলমল করে ওঠে। টাওয়াং গোম্ফা আমাদের স্মৃতির একটা অনারোগ্য ক্ষতবিশেষ।

এই সবকিছুই দেখা দরকার ছিল। গত ত্রিশ বছরে হিমালয়ের উপর দিয়ে যা সব হয়ে গেছে তাকে এককথায় বলে যুগান্তকারী। মোটরপথের দাপটে সুপ্রাচীন তীর্থপথ সাফ হয়ে গেছে। পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মবোধ, আচার-নীতি—সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে। বদলে এসেছে বিবিধ ভারতী এবং আরও সব আধুনিক ঠাট। পাঁচ হাজার বছরের অক্লান্ত সাধনায় যে হিমালয় গড়ে উঠেছিল মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে তা ফেটে চৌচির হয়ে গেল—আমাদের চোখের সামনেই। যত নগণ্যই হই না কেন। এই যুগান্তকারী ঘটনার আমি একজন সাক্ষী। বিস্ময়ে বাক্‌রহিত হয়ে আছি তাই রক্ষা।

হিমালয় পরিক্রমা মোটামুটি সম্পূর্ণ করে গত বছর আটেক কলকাতায় বন্দী আছি। শিলঙের শ্যামলিমা থেকে হঠাৎ করে যখন এই লোড-শেডিং আর ভিড়-ভাট্টার মুলুকে এসে পৌঁছলাম, তখন খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মহানগরীর বহুবিধ অত্যাচারে যখন মাঝে মাঝে জীবনটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়তে লাগল তখনই আস্তে আস্তে নিজেরই অজান্তে আমি হিমালয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করি। অল্পদিনের মধ্যেই সবকিছু বেশ সড়গড় হয়ে যায়। এখন আর একটুও অসুবিধা হয় না—ভিড়ের ট্রামে যেতে যেতে যুগপৎ দম এবং চোখ বন্ধ করে ধা করে চলে যাও মানস-সরোবরে অথবা বসুধারা তালে, যেখানে মন চায়। অপিসের কাজ একঘেয়ে লাগছে, সহধর্মিণী খুব ভ্যাজর ভ্যাজর করছে—চোখদুটো একটু ঘোলাটে করে চলে যাও নন্দাঘুন্টি পাহাড়ে বা ঋষিখাদের দুর্গম অরণ্যে। স্টপ-ওয়াচ নিয়ে মাপা হয়নি, কিন্তু এখন প্রায়-সময়ই আমার প্রায় বারো আনা অংশ হিমালয়ে বিচরণ করে থাকে সবসময় নিজেও খেয়াল থাকে না, নিজেই নিজেকে কতদিন খপ্‌ করে ধরে ফেলেছি! মাত্র চার আনা অংশ সম্বল করে ভবসংসারে সদাসর্বদাই হাবুডুবু খেতে হয়—তবু জানি যে বেশ আছি, এখনো লাভের দিকে আছি।

এটা সকলেরই জানা যে মনের ভিতরে কোন ভাব একবার জমে গেলে তখন তা প্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু হিমালয় নিয়ে রসিয়ে একটু বাক্যালাপ করা যায় এমন মানুষ কলকাতায় খুব সুলভ নয়। এ-ব্যাপারে যাদের উৎসাহ আছে তারা সবাই—আমারই মতো—কেবল বলতে চায়, কখনো শুনতে চায় না। অগত্যা আরও ছড়িয়ে জাল ফেলতে হল। খেলার আসর এবং দেশ পত্রিকার কাছ থেকে এ-ব্যাপারে প্রচুর প্রশ্রয় ও প্ররোচনা পেয়েছি। এই সবকিছুর যোগসাজসে হিমালয় প্রসঙ্গে কিছু লেখা জমে যায়—তাই নিয়েই হিমালয়-কথা।

কৈলাস যাত্রার সেকাল ও একাল

কৈলাস ও মানস-সরোবর যাত্রা বিষয়ে অবশেষে কিছু কিছু পাকা সংবাদ পাওয়া গেছে। এই লেখা ছাপা হয়ে বেরোবার আগেই হয়তো প্রথম সারির পুণ্যবানেরা তীর্থ-পরিক্রমা শেষ করে ঘরে ফিরে আসবেন। তাঁদের যাত্রা শুভ হোক।

তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, খবরটা বেরোবার পর প্রতীক্ষাকারী পুণ্যার্থীদের মধ্যে একটা গভীর হতাশা দেখা দিয়েছে। চীনের বিদেশ মন্ত্রী এদেশে আসবার আগে থেকেই কানাঘুষায় খবর আসছিল। তারপরে যখন চীন সরকারের সম্মতির কথাটা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হলো তখন থেকেই অনেক শর্মা যাত্রার জন্য মনে মনে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিল সংখ্যায় এরা অগুনতি। হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ এদেশের চিরাচরিত ব্যাপার। কিন্তু গত ২০/২২ বছরে হিমালয়ের প্রতি এদেশের ঝোঁক যেমন বেড়েছে তেমন আর কোনকালে নয়। হিমালয়ের এধারটা দেখবার পর ওধারটা দেখবার ইচ্ছা হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খবর যেটুকু বেরিয়েছে তাইতে অনেকের মনেই নানারকম সংশয় দেখা দিয়েছে—যার নির্গলিতার্থ. শেষ পর্যন্ত কৈলাস যাওয়া হবে তো?

খবরে জানা গেছে যে, কেবলমাত্র লিপুধুরা অতিক্রম করেই কৈলাসখণ্ডে যেতে দেওয়া হবে। ভারতবর্ষ থেকে কৈলাস তীর্থে যাবার শতাধিক গিরিপথ আছে যার অধিকাংশই অত্যন্ত দুর্গম। এর মধ্যে গোটা কুড়ি গিরিপথ ধরে সাধারণ যাত্রীদের গতায়াত ছিল। এই কয়টির মধ্যেও সবচাইতে বেশি যাত্রীপ্রিয় ছিল লিপুধুরা। লিপুধুরা দিয়ে গেলে কৈলাস ও মানস-সরোবর সবচাইতে কম সময় কাটাতে হয়। লিপুধুরার প্রতি তীর্থযাত্রীদের দুর্বলতার আরেকটি কারণ সম্ভবত কুমায়ুন এলাকার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি। টনকপুর থেকে চম্পাবৎ পিথোরাগড়, ধারচুলা হয়ে প্রায় গার্বিয়াঙ পর্যন্ত এমন সুসমৃদ্ধ এলাকা হিমালয়েও দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। আর হিমালয়ের যতো বৈচিত্র্য, যতো সৌন্দর্য সব যেন একটার পর একটা পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে। একেবারে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যাঞ্চল থেকে নির্জন তুষারপ্রান্তর অতিক্রম করে লিপুধুরার এই পথটি যেন একটি আদ্যোপান্ত মহাকাব্য।

খবরে আরও জানা গেছে যে, তাওয়াঘাট পর্যন্ত যাত্রীদের মোটরযানে করে নিয়ে যাওয়া হবে। টনকপুর থেকে পিথোরাগড়, আসকোট, ধারচুলা ছাড়িয়ে তাওয়াঘাট —পদযাত্রা শুরু হবে সেখান থেকে। এই তাওয়াঘাট থেকেই বলতে গেলে গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ শুরু হয়ে গেল। তাওয়াঘাটের সামনেই একটা খাড়া চড়াই— এত খাড়া যে যথাসাধ্য ঘাড় হেলিয়েও চড়াইয়ের শেষটা দেখা যায় না। তাওয়াঘাটের সাড়ে তিন হাজার ফুট থেকে চড়াইটা তড়াক করে থানীধরের নয় হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে গেছে—তিন মাইলের দূরত্বে প্রায় ছয় হাজার ফুট-ভাবলেও বিষম লাগে। যাত্রার প্রথম দিনেই এমন শ্বাসরুদ্ধকর একটি মহাকাব্য দেখে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। হঠাৎ মাঝখান থেকে একটা মহাকাব্য পড়তে শুরু করলে এমন বিপর্যয় ঘটতেই পারে। এই নিয়ে ক্ষোভ করে লাভ নেই।

তবে শেষ পর্যন্ত কয়জন দুঃসাহসী এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার সুযোগ পাবেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কৈলাসযাত্রা করতে হলে তার আগে কি-কি করতে হবে সে-বিষয়ে একটি সরকারী বিজ্ঞাপন দেশের বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটিতে অনেক প্রয়োজনীয় খবরই নেই। তাতে কিছু এসে যায় না। এখন কৈলাসযাত্রা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে। অতএব সরকারের খাতায় নাম লেখানোটাই এখন সবচাইতে গোড়ার কথা। কাজটি খুব সহজ নয়। এখানে অনেকেই কুপোকাত হবেন।

বছরকুড়ি আগে, পথটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, কেবল একটা জিনিসই সম্পূর্ণ অপরিহার্য ছিল—সেটি হল কৈলাস যাবার ইচ্ছা। ধর্মের জন্য হতে পারে, সৌন্দর্যের জন্য হতে পারে, দুর্গমতার জন্য হতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ অকারণেও হতে পারে—কিন্তু ইচ্ছাটা প্রবল হওয়া চাই। ১৯৫৭ সনে নির্পানির কুখ্যাত চড়াইয়ে একজন দক্ষিণ ভারতীয় কৈলাসযাত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল —সে জন্মান্ধ। একজন বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সাধু আমাদের তাঁবুতে কিছুদিন নৈশাশ্রয় নিয়েছিলেন তুষারপাতের উৎপাত এড়াতে। অন্য সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হলেও একটা বিষয়ে এদের দারুণ জোর ছিল, ইচ্ছার জোর। ইচ্ছার জোরেই অধিকার জন্মায়। অর্থাৎ তখনো পর্যন্ত জন্মাতো।

নব-বিধান অনুযায়ী কৈলাস যেতে হলে প্রথমেই যা প্রয়োজন হবে তা একটি পাসপোর্ট। র‍্যাশন কার্ড করবার অভিজ্ঞতা থেকে যতটা অনুমান করতে পারি তাতে ব্যাপারটা খুব সহজসাধ্য হতে পারে না। কিন্তু উপায় নেই, পাসপোর্টের নম্বর না দিলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য তো দূরস্থান, গ্রহণ করাও হবে না। অতএব

কৈলাসে যাবো এইটে মোটামুটি স্থির করে ফেলবার পর আর কৈলাসের কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই, ফুরসতও মিলবে না। এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি পাসপোর্ট।

মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে দুমড়ে-মুচড়ে দেবার জন্য আজও পর্যন্ত যতোকিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে আমলাতন্ত্র হোল সবচাইতে অব্যর্থ। স্বয়ং আমলারাও একথা মাঝেমধ্যে বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করে থাকেন। কৈলাস-যাত্রার ইচ্ছাটিকে এইবার এই ইক্ষু মাড়াই-কলটির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। পাসপোর্ট অফিসের কাকে কতো ঘুষ দিতে হবে, কাকে কতটা তোষামোদ করতে হবে, কোন উপযুক্ত পদাধিকারীর কাছ থেকে সই আনতে হবে, পুলিশ রিপোর্টের জন্য কি কি করতে হবে—এসব জানি না বললে চলবে না—পাসপোর্ট বার করতে হলে এইসব জানতে হবে।

এইবারে পাসপোর্টের নম্বর উল্লেখ করে দিল্লিতে বিদেশ দপ্তরের কাছে দরখাস্ত পাঠাতে হবে যে, কৈলাসে যেতে চাই। কোন্ বছরের কোন্ ঋতুতে যেতে চাই তা উল্লেখ করলেও চলে, না করলেও চলে। এ-ব্যাপারে যাত্রীর মতামত প্রকাশের কোন সুযোগই নেই। কে কোন্ বছর যাবে, কোন্ ঋতুতে যাবে, আদৌ যাবে কিনা—সবাই ঠিক হবে লটারি করে। এই লটারির মধ্যে দুর্নীতি ঢুকবে এখনই এমন কথা বলা অসঙ্গত হবে, তবে ঢুকে পড়লে তা বিস্ময়কর হবে না। তাছাড়া সরকারের নিজস্ব প্রতিনিধিদের জন্যও কয়েকটি আসন নিশ্চয়ই সংরক্ষিত থাকবে, অন্য যেকোন দেশের যেকোন সরকারই তা রাখতো।

প্রতিবছর কয়জন যাত্রীকে কৈলাস নিয়ে যাওয়া হবে তা এখনো সুনির্দিষ্টরূপে জানা যায়নি। ষোড়শ-দুশোজন হবে, বাদ-সাদ দিয়ে শতখানেক। অপরদিকে কৈলাস যাবেন বলে যাঁরা পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে অনেককাল তৈরী হয়ে আছেন তাঁদের সংখ্যা এই কলকাতারই কয়েক সহস্র হবে, সারা ভারতে তাঁদের সংখ্যা কত হতে পারে তা যে-যেমন খুশি অনুমান করে নিতে পারেন। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যেখানে এতো ফারাক সেখানে কিছুটা কারচুপি হবেই—তার উপরে পুরো ব্যাপারটাই আবার সরকারের হাতে! স্বাভাবিক অবস্থায় এই লটারিতে কেউ যোগ দিত কিনা সন্দেহ—কিন্তু কৈলাস বলে কথা।

কিন্তু কৈলাসপতির এক্সট্রা-পাওয়ারফুল ও ভেরি স্পেশাল অনুগ্রহে এত সবের পরেও অন্তত কয়েকজন লটারিতে জিতবেনই। কিন্তু লটারিতে নাম উঠলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে না? তারপরে আছে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, মানে ডাক্তারের

মর্জি,—আর এখনকার ব্যবস্থামত সেটি হবে নয়াদিল্লিতে।

কৈলাসের পথ অত্যন্ত দুর্গম। একনাগাড়ে মাইলের পর মাইল চড়াই ভাঙতে হবে। এমন জায়গা আছে যেখানে বসে বসে পেছন ঘষটাতে ঘষটাতে যেতে হয়, পা ফেলতে দু-ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলে পাশেই অতলস্পর্শী খাদ মুখ ব্যাদান করে আছে। প্রায় পুরোটা যাত্রাপথই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুট উঁচুতে; অন্তত আট-দশদিন থাকতে হবে পনেরো হাজার ফুট অথবা তার চাইতেও উঁচুতে। সেই লিপুধুরা হয়ে গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে তার উচ্চতা প্রায় সতের হাজার ফুট। কৈলাস পরিক্রমা করতে হলে দো মা-লা হয়ে কৈলাস রেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে, তার উচ্চতা প্রায় উনিশ হাজার ফুট। এইসব হলো স্থাবর দুর্গমতা। এছাড়া বৃষ্টি আছে তুষারপাত আছে হাওয়া আছে, তুফান আছে, তুষার ঝটিকা আছে, আর আছে তিব্বতের খ্যাপা হাওয়া যা রোজ বেলা এগারোটা নাগাদ বইতে শুরু করে, যার তীব্রতায় গায়ের চামড়া পুড়ে যায় নাক-মুখ ফেটে রক্ত বেরোয় যার দাপটে ১৯৫৭ সনে আমাদের একটা মালবাহী ঝব্বু তার ওই সুবিশাল দেহ নিয়ে আমাদের চোখের সামনেই মরে গিয়েছিল। এ পথের দুর্গমতার কথা বলে শেষ হয় না।

একসময়ে এই পথে অন্ধ খঞ্জ সবাই যেত সেইটে কোন কথাই নয়। তখন ব্যাপারটা ছিল একটা তীর্থযাত্রা। কৈলাসপতি টানলে তখন আর যাত্রী নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা বা স্বাস্থ্যের কথা চিন্তাও করতো না। পথে দেহান্ত ঘটলে সেটাকেও পুণ্যের ঘরে জমা করত। তখনকার হিসেব-নিকেশই ছিল অন্যরকম।

কিন্তু এখন থেকে কৈলাসযাত্রা হবে সরকারী তত্ত্বাবধানে। কিছু ঘটলে তার দায় কৈলাসপতির উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না—সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতএব আগে থাকতে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া তো একেবারে প্রাথমিক সতর্কতা। ব্যাপারটা হয়তো সামরিক বিভাগে যতটা হয় ততটা কড়াকড়ি হবে না, কিন্তু যতই শিথিল হোক পুরোনোদিনের অধিকাংশ যাত্রীই যে এই পরীক্ষায় মর্মান্তিকরূপে অকৃতকার্য হতেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—একজন অন্ধ বা ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধকে কোন্ সরকারী ডাক্তার কৈলাস যাবার জন্য ফিট্ সার্টিফিকেট দিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে যাবে? তাছাড়া সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেই যে উচ্চতায় উঠে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে না (অলটিচ্যুড সিক্‌নেস) সেকথা কে বলতে পারে? ডাক্তারকে তো সেইটেও তলিয়ে দেখতে হবে!

মোদ্দা কথা এই যে, ইদানীংকালের ডাক্তারি পরীক্ষা হলো নানারকম অনি-

শ্চয়তার আস্তরণে ঢাকা একটি রহস্যপূর্ণ প্রহেলিকা। এই রহস্য ভেদ করতে হলে আবারও বড় এক ডোজ কৈলাসপতির ডবল-অ্যাকশন অনুগ্রহ ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত তো কেবল কাগজে-পত্রেই কৈলাসযাত্রা। অতএব ধরে নিলে ক্ষতি কি যে লটারিতেও নাম উঠেছে, আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া গেছে—অঘটন তো আজও ঘটে! কৈলাসে যাবার এখন আর বিধিগত কোন অসুবিধা নেই।

এইবারে প্রথমেই সরকারের খাতায় আড়াই হাজার টাকা জমা করে দিতে হবে। এই টাকার যাত্রাপথের কোন্ কোন্ খরচ বহন করা হবে তার কোন বিশদ বিবরণ সরকারী বিজ্ঞাপনে নেই। মনে হয় গাড়ি-ভাড়া, তাঁবু ইত্যাদির ভাড়া, নির্দিষ্ট ওজনের মালবহনের খরচ প্রভৃতি এর মধ্যে ধরা আছে। আহারাদি এবং অন্য সব ব্যাপারে যাত্রীকে হয়তো পৃথকভাবে টাকা খরচ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কৈলাসযাত্রায় মোট খরচ কোথায় দাঁড়াবে কাগজে-পত্রেও তার হিসেব করতে সাহস হয় না।

সেখানেই শেষ নয়। এরপরে আবার তিব্বতের রাহা খরচের জন্য তু'শো মার্কিন ডলারের সংস্থান করতে হবে। তার মানে লগভগ আরও দু'হাজার টাকা। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য চীন সরকার তিব্বতে কি-কি ব্যবস্থা করবেন তা এখনো জানা যায়নি, জানানো হয়নি। অনুমান হয় লিপুধুরা থেকে তিব্বতের দিকে নেমে গেলেই পালা-য় যাত্রীদের জন্য টুরিস্ট বাস অপেক্ষমান থাকবে। বাসে করেই তাদের নিয়ে যাওয়া হবে মানস-সরোবরের তীরে, কৈলাসের আঙ্গিনায়। সে-একটা দারুণ ব্যাপার হবে। তিব্বতের নিষ্ঠুর ঝড়ো হাওয়া বৃথাই জানালার কাচের বাইরে মাথা কুটে মরবে, ভিখারীদের সেই পঙ্গপাল যদি এখনো থেকে থাকে তবে তারা হাবার মতো চলমান বাসটির দিকে তাকিয়ে থাকবে, বাইরে ঝিরঝির করে বরফ পড়বে এবং তার ছিটেফোঁটাও বাসের ভিতর আসবে না।

মানসের ধারে কি কোন রেস্ট-হাউস করা হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তবে মানস একটা নতুন দৃশ্য দেখবে। এতকাল মানস দেখে এসেছে যে ভারত থেকে আসা যাত্রীরা প্রথমেই তার জল মাথায় ঠেকায় আর তারপর ক্লান্ত দেহটা বালুর উপর বিছিয়ে দেয়। এখন দেখবে তারা খিলধরা আড়ষ্ট দেহে বাস থেকে নামছে এবং তারপর রেস্ট-হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত-পায়ের খিল ছাড়াবার জন্য নানারকম অঙ্গভঙ্গী করছে। সাবধান, মানস কিন্তু মুখ টিপে হাসতে জানে!

যদি তাই হয়, লিপুধুরা থেকে নামলেই যাত্রীর দায়িত্ব যদি চীন সরকার গ্রহণ

করে তবে আজকের মূল্যমান অনুযায়ী দু'শো ডলার এমনকিছু বেশি নয়। যাই-হোক, এই দুটো খাতেই সাড়ে চার হাজার টাকা বেরিয়ে গেল। এছাড়াও দিল্লি আসার খরচ আছে; লটারিতে যাতে নাম ওঠে বা ডাক্তার যাতে প্রসন্ন হয় সেসবেও বেশ কিছু খরচ হয়েছে। তাছাড়া প্রচণ্ড শীতের পোষাক-আশাক টর্চের ব্যাটারি, ক্যামেরার ফিল্ম, চাটনি লজেন্স, আচার, এসবেও নেহাৎ কম খরচ হয়নি।

১৯১৮ সনে প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কৈলাস-মানস পরিক্রমা করে আসতে খরচ হয়েছিল আশী টাকা পনেরো আনা। ১৯৫৭ সনে আমাদের খরচ হয়েছিল মাথাপিছু সাতশ' টাকা। সেসব এখন সত্যযুগের কথা বলে মনে হবে।

প্রস্তুতি-পর্ব মোটামুটি এখানেই শেষ। এরপর নির্ধারিত সময়ে দুর্গা বলে যাত্রা শুরু।

সরকার স্থির করেছেন পনেরো বা কুড়িজন যাত্রীর এক-একটি দল করে কৈলাস পরিক্রমা করিয়ে আনবেন। আগেও এমনি দল বেঁধেই কৈলাসযাত্রা হোত, দুর্গম দীর্ঘ পথে দল বেঁধেই যেতে হয়। একসময়ে এই দল বাঁধাটাই ছিল কৈলাস-যাত্রার একেবারে গোড়ার কথা। শ্রদ্ধেয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুলিখিত ভ্রমণ কথা শুরুই করেছেন এই বলে যে—"সঙ্গ-সংযোগের কথাটাই প্রথম। কারণ বিনা সঙ্গে এত বড় তীর্থ ভ্রমণ হইত না।"

তবে তখনকার দলে আর এখনকার দলে একটু তফাত আছে। আগে দল আপনা থেকেই দানা বেঁধে উঠত। গেঁজেল যেমন করে গেঁজেলের সন্ধান পায়, দুর্গম পথের যাত্রীরাও তেমনি করে অপরের সঙ্গে মিলিত হোত, ঘনিষ্ঠ হোত। দলটা দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধলে, দলের নিজস্ব একটা মেজাজ গড়ে উঠলে—তারপরে কৈলাস।

কিন্তু এখন থেকে দলের সদস্য নির্বাচন করা হবে লটারির সাহায্যে। লটারিতে যদি প্রচণ্ডরকমের কারচুপি না হয় তা হলে আশা করা যায় যে, এই পনেরো-কুড়ি-জনের এক-একজন ভারতের এক-এক দিক থেকে আসবেন। জাতীয় সংহতি খুব মহৎ জিনিস, কিন্তু এঁদের আচার-আচরণে কিছুটা পার্থক্য থাকবেই, মেজাজও হবে এক-একজনের এক-একরকম। টনকপুর অথবা দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু করবার আগে সাক্ষাৎ-পরিচয় তো দূরস্থান, হয়তো পরস্পরের নামটাও জানা যাবে না। প্যাকেজ ট্যুরে এমনটাই হয়ে থাকে।

দুর্গম তীর্থপথে সম-মেজাজের সহযাত্রী না জুটলে যে কি বিপত্তি ঘটে প্রমোদ-কুমারের সঙ্গী-মহাশয়ই তার প্রমাণ। এক্ষেত্রে তো তবু যাত্রার আগে কলকাতায়ই উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল, উভয়েই বাঙালী এবং একই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

ভাবধারার মানুষ। এখন যে ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে পারে তা ভাবলেও গায় জ্বর আসে।

টনকপুর থেকে বাসে তাওয়াঘাট যেতে সাধারণভাবে দুদিনের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। সরকারী মেহমানদের সুবিধার্থে সেটাকে বাড়িয়ে তিনদিন বা চারদিন করা হতে পারে। ওর মধ্যেই যাত্রীদের পরস্পরের নাম জানতে হবে, আলাপ-পরিচয় করতে হবে, ঘনিষ্ঠ হতে হবে, মেজাজ বুঝতে হবে, মেজাজ মানিয়ে নিতে হবে। কাজটা খুবই জরুরি। কেননা, তাওয়াঘাটে পৌঁছে তার পরদিনই পদযাত্রা শুরু হয়ে যাবে—আর সেই যাত্রারম্ভের দিনই তিনহাজার ফুট থেকে খাড়া দশহাজার ফুট উঁচুতে উঠে যেতে হবে। এমন কষ্টসাধ্য পথে সান্ত্বনা দেবার জন্য, সাহস জোগাবার জন্য তেমন কেউ পাশে না থাকলে কি এপথে মরতে আসা হয়েছে!

তবে জরুরি হলেও ব্যাপারটি একটু জটিল। একে তো পাহাড়ী পথে বাসযাত্রার সময় খোশ-গল্প একেবারেই জমে না, তাছাড়া অন্যসব কারণও আছে। বিষয়টি সবদিক থেকেই বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন, কেননা, যাত্রা শেষ পর্যন্ত কতটা সফল হবে তা বহুলাংশে এর উপরই নির্ভর করছে।

নতুন যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে কেবল বিত্তবান অথবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরাই কৈলাস যেতে পারবেন। প্রায় দশ হাজার টাকা এবং দিল্লির দরবারে পর্যাপ্ত প্রভাব—এর পর থেকে কৈলাস যেতে হলে এ-দুটো জিনিস চাই-ই। এখন এ-দুটো জিনিস যাঁদের থাকে তাঁরা নিজেদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে একটু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকেন। চট্ করে অপরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারেন না। নিজের ব্যক্তিগত কথা বলতে বা অপরের ব্যক্তিগত বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। পাহাড়ী পথে বাসযাত্রার ভোঁ-ভোঁ অবস্থায় এঁরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবেন এতোটা আশা করা একটু বাড়াবাড়ি হবে।

তাছাড়া ভাষা, শিক্ষা, রুচি, আচার-আচরণ, যাত্রার উদ্দেশ্য প্রভৃতি আরও অজস্র বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে কেবল বৈসাদৃশ্য নয়, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাব থাকাও সম্ভব। বাসযাত্রার মাত্র তিন-চারদিনের মধ্যে এতসব জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা কোনরকমেই সম্ভব হতে পারে না। সকলেই যদি খুব সজ্জন হন তবে সাময়িক একটা বোঝাপড়া হতে পারে, কিন্তু তা দুর্গম পথের ধকল সইতে পারবে কিনা সন্দেহ। পথের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই যখন দম বেরিয়ে যাবে তখন যদি আবার সহযাত্রীদের সঙ্গেও বোঝাপড়া করে চলতে হয়—তাহলে দুর্গম কৈলাস-যাত্রার কতটুকু আর অবশিষ্ট থাকবে?

আগেকার দিনে এই ঝামেলাটি একেবারেই ছিল না। তখন যাঁরা কৈলাস-

যেতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত অথবা প্রায়-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। ভারতের যে প্রান্ত থেকেই আসুন না কেন এঁদের আচার-ব্যবহারে মোটা দাগের কোন অসাযুজ্য ছিল না। ধর্ম করতেই আসুন বা হিমালয় দেখতেই আসুন—পথের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা নিয়ে এঁরা আসতেন। এই শ্রদ্ধায় সব অসঙ্গতি ধুয়ে-মুছে যেত। কৈলাসের পথের এতো যে খ্যাতি তার পেছনে এঁদের দানও কম নয়। আগেকার দিনে যে-ই কৈলাসে যেত সে-ই কিছুটা কৈলাস সৃষ্টি করে আসত। কৈলাসের পথে অজস্র জায়গায় প্রমোদকুমারের সৃষ্টি আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসেছি।

কিন্তু কৈলাসের পথে সৃষ্টির এই চিরায়ত ধারাটি বোধহয় এবার একটা প্রচণ্ড বাঁক নেবে। নতুন ব্যবস্থায় কেবল অবস্থাপন্ন ক্ষমতাপন্নরাই কৈলাসে যেতে সমর্থ হবেন। এঁদের শ্রেণী-চরিত্রের বয়স বেশি নয়। তার উপরে সঙ্গে থাকবে সরকারী লোক-লস্কর। সরকারী ব্যাপারে কাজের চাইতে হই চই বেশি হয়, এক্ষেত্রে তা হবে না। এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। সব মিলিয়ে কৈলাসের পথে ব্যাপার যা দাঁড়াবে তা এককথায়—অচিন্তনীয়।

কয়েকটি সম্ভাব্য বিভ্রাটের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত, স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করবার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ থাকবে না। সরকারী সবকিছুর প্রতি আমাদের যেমন শ্রদ্ধা, পাহাড়ীদেরও সেইরকম। সরকারী তাঁবুতে স্থানীয় লোকেরা নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলতে আসবে না—যারা আসবে তারা অন্য ধান্ধায় আসবে। আগেকার সময়ে কৈলাস-যাত্রার একটা বড়ো পুরস্কার ছিল এই পথের বন্ধুরা। প্রমোদকুমারের বইয়ে লেখায় এবং রেখায় কতিপয় বন্ধুরা কয়েকটি ছবি আঁকা আছে। কৈলাসের দুর্গম পথ ছাড়া এমন সৌহার্দ হয় কিনা জানি না।

তার চল্লিশ বছর পরে—১৯৫৭ সনে—আমরা যখন কৈলাসে গেছি তখন পথ কিছুটা হ্রস্ব হয়েছে, পাহাড়ের দূরতম প্রদেশেও আধুনিকতার ছটা পৌঁছতে শুরু করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পিথৌরাগড় থেকে শুরু করে তারচেন পর্যন্ত আমরা এমন অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, যাদের পিতা বা পিতামহদের কথা প্রমোদকুমারের বই-এ আমাদের আগে থেকেই পড়া ছিল। নাম-ধাম সবই হয়তো পৃথক, তবুও একনজরেই সম্পর্কটা ঠিক বোঝা যায়। তখনকার দিনে কৈলাসযাত্রার একটা বড়ো পুণ্যফল ছিল এই স্থানীয় লোকদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য। চার হাজার বছরের ঊর্ধ্বকাল ধরে কৈলাসের যে এত নাম-ডাক তার অনেকটাই

এইসব অজ্ঞাতনামা মহাত্মাদের সংযোজন। কৈলাসযাত্রা থেকে এরা বাদ পড়ে গেলে বাকি থাকবে শুধু পথক্লেশ।

ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হবে। কাঠগুদাম বা পিথৌরাগড় থেকে পায়ে হেঁটে এসে সঙ্গীসাথীদের সাথে যে আত্মীয়তা হোতে পারত মোটর-বাসে চেপে আসায় সেটি হলো না। তারপর তাওয়াঘাটে পৌঁছে সেদিনই সাড়ে তিন হাজার ফুট থেকে এক লপ্তে প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে যেতে হবে। যাত্রার শুরুতেই এমন উত্তুঙ্গ একটা চড়াই আর যাইহোক ঠিক উৎসাহবর্ধক নয়। ওই উচ্চতায় হঠাৎ করে উঠে সব যাত্রীরই মেজাজ কিছুটা বিগড়াবেই। ইংরেজিতে একে বলে অলটিচ্যুড সিক্‌নেস। গা গুলোয়, মাথা ঝিমঝিম করে, ভালো ঘুম হয় না, ক্ষুধা হয় না এবং মেজাজটি সর্বক্ষণ তিরিক্ষে হয়ে যাবে—কারণে-অকারণে ঝগড়া-বিবাদ হয়, ভিতর থেকে বিতৃষ্ণা গবগবিয়ে ওঠে। সবচাইতে বড় বিপদ এই হয় যে, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি জানতে পারে না যে, তার ব্যাধি হয়েছে। অগ্নিমান্দ্য, অনিদ্রা প্রভৃতির জন্যও তখন সহযাত্রীদের উপর আক্রোশটা আরও বেড়ে যায়।

তবে ব্যাধিটি সাধারণত স্থায়ী হয় না। সহযাত্রীদের সাহচর্যে দু-এক দিনের মধ্যেই নিরাময় হয়ে যায়। কিন্তু কৈলাসযাত্রীর ক্ষেত্রে তাওয়াঘাটের চড়াইয়ের পর অবস্থাটা একটু ভিন্নরকম দাঁড়াতে পারে। একে তো সহযাত্রীরা তখনো আপনজন হয়ে ওঠেনি, তার উপরে আছে ভাষা সমস্যা। কঠিন পথশ্রমের পর কাতরোক্তিটুকুও যদি ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে তারপর উচ্চারণ করতে হয়—তবে তাতে সান্ত্বনা কোথায়? সহযাত্রীরা পরস্পরের মেজাজ জানে না, অতএব পরস্পরের মেজাজ বুঝে চলবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নাই। অবস্থাটা দাঁড়াবে এই যে—নিজের শারীরিক অসুস্থতার জন্য যে অসন্তোষ তার ঝালটা গিয়ে পড়বে দুর্গম পথের উপরে, দুর্গম পথ তাতে দুর্গমতর হবে। সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে গিয়ে যে ক্লান্তি ও যন্ত্রণা, পথাতিক্রমের পর সহানুভূতিহীন সহযাত্রীদের তিক্ত সান্নিধ্যে তা একটা বিকট বিস্ফোরক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু মন খুলে দেশী-ভাষায় বিস্ফোরণের কোন সুযোগ নেই। সেই রাগ যত গুমরোবে তত তার তিক্ততা ও তীব্রতা বাড়তে থাকবে। রাত পোহালে সেই রাগ গিয়ে পড়বে নতুন আরেকপ্রস্থ দুর্গম পথের উপর। রাগ অন্ধ—যে-পথে প্রতিটি পদক্ষেপে অত্যন্ত সজাগ সতর্কতা প্রয়োজন কথাটা সেখানে আক্ষরিক অর্থেও সত্য হবার আশঙ্কা আছে। সে-ক্ষেত্রে কৈলাসপতির পক্ষপাতিত্ব না থাকলে যা-কিছু হয়ে যেতে পারে। অন্তত হিমালয়ের সৌন্দর্য তথা কৈলাস-যাত্রার পুণ্যফল যে তাতে সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে বাদ পড়ে যাবে সে-কথাটা লাল কালি দিয়েই লিখে রাখা যায়।

একালের যাত্রীরা সম্ভবত আরও একটি মহৎ জিনিস থেকে বঞ্চিত হবেন। যাত্রীদের পথ দেখাবার জন্ত বোধহয় গার্বিয়াং থেকে আর গাইড বা পথপ্রদর্শক নিয়োগ করবার প্রয়োজন হবে না। হলেও তা সরকারী লেভেলে হবে। সেক্ষেত্রে যাত্রী ও ছড়িদারের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকবেই। এটা যে কত বড়ো একটা লোকসান একালের যাত্রীরা তা জানতেই পারবেন না।

এই পথপ্রদর্শকরা যে কৈলাস-যাত্রার কতোখানি তা বলে বোঝানো যাবে না। প্রমোদকুমারের সঙ্গে ছিলেন রুমা দেবী, আমাদের সঙ্গে ছিল কীচ থাম্পা। এই কীচ থাম্পার কথা মনে পড়লে আজ আপনা থেকেই মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। প্রায় পার্বিয়াঙের পর থেকেই আর সত্যকারের কোন পথরেখা নেই—যা আছে তা হলো পাথর তার বরফের এক অন্তবিহীন ওয়াইল্ডারনেস্ আমাদের কপালগুণে সে-বছর আবার আবহাওয়া একটু খারাপ চলছিল। লিপুধুরার এধারে-ওধারে ষোল মাইল সম্পূর্ণ তুষারাবৃত দুরন্ত আমরা সেবার সারারাত হেঁটে অতিক্রম করেছিলাম। বরফের উপর তারার আলো পড়ে সামান্য একটু ফেকাসে আলো, তার উপরেও আবার কুয়াসার অনচ্ছ আবরণ। আগে আগে 'ওম্ মণিপদ্মে হুম' আওড়াতে আওড়াতে কীচ থাম্পা চলেছে, আমরা আক্ষরিক অর্থে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। কলকাতার জল-জমা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আজো হঠাৎ যখন সে-রাতের কথা মনে পড়ে যায় তখন কেমন কৌতুক লাগে।

কেবল কঠিন পথের উপর দিয়ে নিরাপদে নিয়ে গেছে বলেই যে কীচ থাম্পাকে মহৎ বলছি তা নয়। অত্যন্ত দুর্গম পথের শেষে তাঁবুর বাইরে হয়তো বরফ পড়ছে, হয়তো ঝড় উঠেছে, নিতান্ত পক্ষে হাড় জমানো ঠাণ্ডায় মাটির দশ হাত নীচে পারদ সেঁধিয়ে গেছে—সারাদিনের পথশ্রান্তিতে আমরাও সম্পূর্ণ অবসন্ন। কিন্তু এই সন্ধ্যাগুলোই কৈলাস-যাত্রার সবচাইতে মূল্যবান সঞ্চয় হয়ে আছে। আমরা যাত্রী-চতুষ্টয় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে কীচেনের ছোট্ট তাঁবুটার ভিতরে ঢুকে পড়েছি। তাঁবুর খোলা দিকটায় পিছন ফিরে বসে কীচ থাম্পা থেকে থেকে আগুনটাকে উস্কে দিচ্ছে। আর হিরিং নামে কীচেন-অ্যাসিস্ট্যান্ট খিঁচুড়ি পাকাচ্ছে বা রোটি বানাচ্ছে। এমনিতে কীচ থাম্পা খুব মিতভাষী, দরকার ছাড়া কথা বলে না। কিন্তু সেইসব সন্ধ্যায় ওর কথা আর ফুরোতো না। টুকরো টুকরো করে কতো কথাই বলত—বিভিন্ন যাত্রার কথা, বিভিন্ন যাত্রীর কথা, কৈলাস-মানসের কথা, নিজের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা এমন অনায়াসে বলে যেতো যে, আমরা শহরের ঘুঘুরাও তা হতবাক হয়ে শুনতাম। বিশ্ব-সংসার সম্পর্কে অমন সুষম ও সংযত দৃষ্টিভঙ্গী আর

কোথায়ও দেখেছি, শুনেছি বা পড়েছি বলে মনে পড়ে না। নিজের এক মর্মান্তিক পদস্খলনের কথাও কীচ খাম্পা বলেছিল, কিন্তু তাতে এতটুকু ছন্দঃপতন ঘটেনি। অথচ কীচ খাম্পা সম্পূর্ণ নিরক্ষর। মানসের তীরে পৌঁছবার বা কৈলাস পরিক্রমা করবার যে প্রচণ্ড বিস্ময়—কীচ খাম্পা আগে থেকেই সেজন্ত আমাদের যথাসাধ্য তৈরী করে দিয়েছিলেন। কীচ খাম্পাকে বাদ দিলে আমাদের কৈলাস-যাত্রা হয়ে দাঁড়াবে ডেনমার্কের রাজপুত্রকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের মতো। কিছু পয়সার বিনিময়ে আমরা কীচ খাম্পাকে নিয়োগ করেছিলাম, কিন্তু ওর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি শুধু টাকার অঙ্কে তার পরিমাপ করতে যাওয়া কেবল হাস্যকর হবে না, মহাপাতকও হবে।

ইতিমধ্যে কীচ খাম্পার দেহান্ত হয়েছে। আমরা যখন গিয়েছিলাম তার আগেই রুমা দেবীরও দেহান্ত হয়েছিল। গত প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে কৈলাস-যাত্রা বন্ধ ছিল। অতএব কীচ খাম্পার কোন উত্তরাধীকারিকে আজ হয়তো চট করে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সেই ঐতিহ্য মরে যাবার বা লুপ্ত হয়ে যাবার জিনিস নয়। কৈলাস-যাত্রা যথাবিহিত শুরু হলেই পুরানো দিনের সবাই আবার এসে হাজির হবে—অমানিশার পরেও যেমন সূর্যোদয় হয়।

এবে সরকারী উদ্যোগে নতুন করে যে কৈলাস-যাত্রা শুরু হলো তার ফলে উরা কতটা ত্বরান্বিত হবে বলা শক্ত। সরকারী ব্যবস্থায় আগে থাকতেই মজুরির রেট, খোরাকির রেট সব ঠিক করে নেবার নিয়ম আছে—টেণ্ডার ডাকা না হলেও কিছুটা দরাদরী হবেই। কীচ খাম্পা যে এসবের ধারেকাছে ঘেঁষত না সেকথা হলফ করে বলতে পারি। কীচ খাম্পার সঙ্গে এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমাদের কোন কথাই হয়নি; কৈলাস থেকে ফিরে এসে অনেক গবেষণার পর আমরা যে এনভেলপটি ওকে দিয়েছিলাম কীচ খাম্পা সেটি খুলেও দেখেনি। তাছাড়া কীচ খাম্পা কারো হুকুম শুনে কাজ করবার পাত্র ছিল না, নিজের খেয়াল মতোই কাজ করত। এদের মতো মানুষ এবারে আর পাওয়া যাবে না। সরকারী খাতায় নাম লেখালে সকলেরই চরিত্র পাল্টে যায়। কীচ খাম্পার সাক্ষাৎ রি-ইনকার্নেশনকেও যদি দলে পাওয়া যায় তবে দেখা যাবে তারও চরিত্র পালটে গেছে।

এতসব ভজকট নিয়ে কৈলাস-যাত্রার অবস্থা শেষপর্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে সেটা একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। আগেই বলেছি যে, এবারে পথক্লেশ একটু বেশি হবে। তার কারণ, প্রথমত, এবারে যাত্রার প্রথমদিনই যাত্রীকে প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে যেতে হবে—উচ্চতার সঙ্গে দেহমনের খাপ খাইয়ে নেবার,

অ্যাক্লাইমেটাইজেশনের, পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, এবারে পথক্লেশ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার মতো নির্ভরযোগ্য অংশীদার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কৈলাস যাবেন বলে যাঁরা এতদুর পর্যন্ত চলে এসেছেন তাঁরা সকলেই নিশ্চয়ই খুব সজ্জন, কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিদের মধ্যেও আত্মীয়তা গভীর হতে একটু সময় লাগে, নানারকম সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

তাছাড়া সরকারের মেহমান হয়ে কৈলাস-যাত্রা করবার আরও কিছু বাড়তি ঝামেলা আছে। আশা করা যায় সারাদিনের পথশ্রমের পর তাঁবুতে পৌঁছেই দেখা যাবে সরকারী পেয়াদাবা চা-কফি রেডি করে বসে আছে। ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু এতে যতটুকু লাভ হবে তার চাইতে বেশি লোকসান হবার ভয় আছে। আগেকার সময়ে চায়ের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকতে হোত এবং তারপরে যা এলো তাতে ধোঁয়ার গন্ধ ভকভক করছে। প্রথমটায় খুব রাগ হোত, কিন্তু রাগ করে লাভ নেই। অবশেষে কেমন করে নিঃঝুম হয়ে বসে থাকতে হয় সেটা শিখে নিতে হয়েছিল। কৈলাসের পথে এই নিঃঝুম হয়ে বসে থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—এতে করে পথের সঙ্গে আত্মীয়তা জমানো অনেকটা সহজ হয়।

সরকারী পেয়াদা এসে নিঃঝুমতাটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে যাবার পরই হয়তো এসে হাজির হবেন সুগ্রীব দোসর—ডাক্তারবাবু। তিনি নাড়ি টিপবেন, রক্তের চাপ দেখবেন, হৃৎস্পন্দন গুণবেন। যেসব ঝুট-ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার আশায় কৈলাস-যাত্রা তার কিছু কিছু এখন থেকে সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। ভাবলেও শরীর কণ্টকিত হয়। এইসব ডামাডোলের মধ্যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হবেই—ভিতরের আত্মশক্তিটুকুকে আর যথাসাধ্য গড়ে তোলা হবে না। কৈলাসের সুদুর্গম পথে ডাক্তার পেয়াদার চাইতেও ওই জিনিসটার প্রয়োজন হয় বেশি।

কৈলাস-যাত্রার একটা বড় আকর্ষণ—নির্জনতা। পথের ও পথশেষের এই নির্জনতা বাদ পড়লে কৈলাস-যাত্রার অনেকটাই বাদ পড়ে যাবে।

কেউ যেন মনে না করেন যে, নিজেরা যেতে পারছি না বলেই অপরের যাত্রা নিয়ে সকলের কানভারি করবার চেষ্টা করছি। মনের ভেতরে এতটুকুও ঈর্ষা নেই এমন কথা হলফ করে বলতে পারব না। কিন্তু টাকার কথা বাদ দিলেও, পাসপোর্ট, ডাক্তার, দিল্লি-দিল্লি—অতসব আর পড়তায় পোষাবে না। ইচ্ছাটা যেখানে দুর্বল হবেই, ক্ষোভটাও সেখানে একটু দুর্বল হবেই, অগত্যা ঈর্ষাবোধটুকুও।

তাছাড়া এ-ব্যাপারে পুরোপুরি, দুষ্ট অথবা পবিত্র, কল্পনার উপরও নির্ভর করা হয়নি। হিমালয়ের অনেক দুর্গম তীর্থই গত কয়েক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ অথবা বহুলাংশে মোটর-গম্য হয়ে গেছে। আগেকার সেই চটিওয়ালারা ছড়িদারেরা বিদায় হয়েছে। তার জায়গায় এসেছে টুরিস্ট এজেন্টদের সহৃদয় সেলস্‌ম্যানেরা। এর ফলে কতটা-কি লোকসান হয়েছে—তা যারা হারিয়েছে তারাও জানে না। কিন্তু একটা জিনিস তো খুবই স্পষ্ট—আজকাল আমরা যেমন যেমন হিমালয়ে যাই প্রায় তেমন তেমনই ফিরে আসি। আজকাল আমরা কেদারনাথ-বদ্রিনাথ 'যাই'—'যাত্রা' করি না।

তবে কপাল ভালো যে, কৈলাস-যাত্রার এখনো তেমন শোচনীয় হাল হয়নি। কৈলাস যেতে হলে এখনো খানিধর, গুমরিয়াধর, নির্পানী, বুদি প্রভৃতির চড়াই পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতে হবে। পায়ে হেঁটেই কৈলাসপতির নাম জপতে জপতে লিপুসঙ্কট পেরোতে হবে। বিত্তবানেরা ঝব্বু ভাড়া করতে পারেন।। তার পরেও আছে প্রায় উনিশ হাজার ফুট উঁচু দোলমা-লা। কৈলাস পরিক্রমা করতে হলে দোলমা গিরিবর্ত্ম দিয়ে কৈলাস গিরিশ্রেণী অতিক্রম করতে হয়। খুব দুর্গম পথ।

তিব্বতের ওদিকে কৈলাস-যাত্রীদের জন্য চীন সরকার কি ও কেমন ব্যবস্থা করেছেন তা এখনো যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। লিপুধুরা থেকে তিব্বতের দিকে নেমে গেলেই নাকি সেখানে বাস অপেক্ষা করবে; জায়গাটির নাম পালা। পালা থেকে মানসসরোবর পায়ে হেঁটে পাঁচদিনের পথ। মোটর বাসে গেলে হেসেখেলে একদিনেই পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে। তাকলাকোট থেকে মাইল বারো দূরে খোজর-জো, সেখানে হয়তো নিয়ে যাওয়া হবে না। তবে তাকলাকোট মণ্ডির উপরেই সিম্বিলিং-গোম্ফা—আধঘণ্টার জন্য স্বচ্ছন্দেই ব্রেক-জার্নি করা যেতে পারে। তারপর ডানদিকে গুরলা মান্ধাতা ছেড়ে সোজা মানস।

বাসে চেপে যাবার একটা সুবিধে এই যে, তিব্বতের ভয়ঙ্কর হাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই হাওয়ার মধ্য দিয়ে, সেই আদিগন্ত লালাভ-ধূসর মালভূমির উপর দিয়ে, সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত অবস্থায় পথাতিক্রম করতে করতে মনে হোত যেন সৃষ্টির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। তারপরে মানসের তীরে পৌঁছে মনে হতো—কি শান্ত। কৈলাস পরিক্রমা করবার সময় মনে হোত—কি গম্ভীর, কি মহৎ। সরকারী ট্যুরিস্ট বাসের ভিতরে বসে এ-সবের কতটা কি হবে তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া বলা যাবে না।

তবে কি এখন থেকে যাঁরা কৈলাস যাবেন তাঁদের যাত্রা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে? মোটেই নয়, আদৌ না। রামায়ণটা হঠাৎ একজায়গায় খুলে এবড়ো-খেবড়ো দুটো-একটা শ্লোকের উপর তড়িঘড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেও যেটুকু পুণ্য হয়। তাইতেই আর পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। হিমালয়েও সেইরকম। গিয়ে পড়লে কিছু-না-কিছু পুণ্যার্জন হয়েই যায়—এবং তাইতেই ভীরু অঞ্জলি উচ্ছলিত হয়ে ওঠে।

বিকজ ইট ইজ দেয়ার

আজ থেকে পুরো কুড়ি বছর আগে, নন্দাঘুন্টি পর্বত অভিযানের উদ্ভট আইডিয়াটি নিয়ে, শূন্য চাঁদার খাতা হাতে যখন দেশের গণ্যমান্যদের দরজায় দরজায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন সব জায়গায়ই আমাদের সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হতো সেটি হলো, পাহাড়ে গেলে কি হয়? ক্রত টাকা খরচ করে, এত পরিশ্রম স্বীকার করে, এত বিপদ মাথায় নিয়ে তোমরা কেন পাহাড়ে যাও?

এখন আর স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই যে, এই অত্যন্ত প্রাথমিক প্রশ্নটির জবাব তখন আমাদের একজনেরও সঠিক জানা ছিল না। ব্যাপারটি যে খুবই শ্বাসরুদ্ধকর এবং খুবই গৌরবময় তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম—সেই বিশ্বাসটুকু সম্বল করেই মহার্ঘ নন্দাঘুন্টি অভিযানের স্বপ্ন দেখবার দুঃসাহস। কিন্তু অমন রোমাঞ্চকর গৌরব অর্জনের তো আরও দশটা উপায় আছে—সেসব পথে গেলে রুজি-রোজগারও হয়, দেশের কাজও হয়—তবে পাহাড়ে যাওয়া কেন?

আমরা কিন্তু নাস্তানাবুদ হবার পাত্র নই। স্বদেশী করবার সুযোগ হয়নি বটে, কিন্তু স্বদেশী নেতাদের বক্তৃতা অনেক শুনেছি: প্রশ্নটির জবাবে আমরা একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে দিতাম—'অনাদিকাল থেকে হিমালয় পর্বত ভারত-ভূমিকে ধর্ম দিয়েছে, জ্ঞান দিয়েছে, জল দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, শিয়রে বসে পাহারা দিয়েছে আমাদেরই হিমালয় পর্বত, সেই হিমালয়ের শৃঙ্গে উঠে দেশ-বিদেশের লোকেরা বছরের পর বছর বিজয়মাল্য নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু ভারত কেবলি পিছায়ে রয়।' শেষের দিকে 'ভারত' কেটে 'বাঙ্গালী' করেছিলাম। ফল হয়নি।

শেষ পর্যন্ত যার দুঃসাহসিক বদান্যতায় আমাদের নন্দাঘুন্টি অভিযান—ভারতের প্রথম বেসামরিক পর্বত অভিযান—সফল হয়েছিল, তিনি কিন্তু আমাদের কোন প্রশ্নই করেননি। কেন যাই, গিয়ে কি হয়, কিছু না। আমরা একেবারে থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। হাজার হাজার টাকার মামলা—প্রস্তাব পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই 'গ্রিন-সিগন্যাল!'

এমনই হয়। কোন একটা বিষয়ে সমগ্র সত্তা যখন উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন আর কার্যকারণ বিচারের অবকাশ থাকে না, তার প্রয়োজনও হয় না। এই

উন্মাদনার সামনে অনেক অসম্ভব জিনিসও সম্ভব হয়। টিকে থাকতে যাদের জামিন লাগে তাদের এক উদ্ভট অভিযানের জন্য হাজার হাজার টাকা এসে যায়—আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়েছে। বিশ্বের সব পর্বত-আরোহীর ক্ষেত্রেই সম্ভবত এমন হয়। কেননা, বারবার পর্বতে না গেলে, পর্বতারোহণের রহস্যটা পরিষ্কার হয় না, হতে পারে না। অতএব যতদিন পর্যন্ত তা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কেন? কি? এসব না বুঝেই পর্বতে যেতে হবে। উদ্যোগ পর্বটা সুতরাং, ঝোঁকের মাথায় সেরে ফেলতে হয়।

প্রশ্নটা তবু থেকেই যায়—পাহাড়ে কেন যাও?—সব পর্বতারোহীকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বারম্বার এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। পর্বতারোহীরা আবার জবাবদিহির কথা শুনলেই চটে ওঠে। বলে, হাজারটা জবাবদিহি যদি দেব তবে লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে যাব কোন দুঃখে! অথচ জবাবদিহি না করে উপায়ও নেই—রাহা-খরচ যে দেয় সে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবেই।

হাজার জনের কাছে জবাবদিহি করতে করতে কিংবদন্তীর পর্বতারোহী ম্যালোরি একবার রেগে গিয়ে দুম করে বলে ফেলেছিলেন: পাহাড়টি আছে তাই যাই। আসল মন্ত্রটি আরও সংক্ষিপ্ত: বিকজ ইট ইজ দেয়ার। একেবারে সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট বচন, বাইবেলের মতো সহজ ভাষায়। তবে মুশকিল এই যে, ধর্ম-কথারই মতো, এই মন্ত্র বাক্যের যাথার্থ্য বুঝতে হলে তার আগে পাহাড়ের নেশায় একেবারে বুঁদ হতে হবে: পাহাড়ের নির্জনতায় দেহমনের যাবতীয় কোলাহল স্তব্ধ হলে তারপর এই মন্ত্রের মর্মোদ্ধার হবে তবুও নাবালক পর্বতারোহীরা অনেক সময় উপরের মন্ত্রটি আউড়ে নিজেদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে থাকে—ব্যাপারটিকে যতদিন বৈষয়িক বৈভবের সোপান বলে চিনতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত।

অপর দিকে হিমালয়ে পর্বতারোহণের অন্যতম পথিকৃৎ এরিক সিপটনের বিধান হল: হিমালয়ের পথ যারা চিনেছে তাদের হিমালয়ে যাওয়াই মঙ্গল। পাগলকে যে পাগলা-গারদে রাখাই মঙ্গল এটুকু না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এতো চিকিৎসা-বিধি, রোগের হেতুটা কি? মূলটা কোথায়? মানুষ আদৌ কেন পাহাড়-পাগল হয়!

হিন্দু নামে জাতি যতদিন বেঁচেছিল, ততদিন পর্যন্ত তাদের কাছে এটা একটা প্রশ্নই ছিল না। মহাভারতেরও অনেক অনেক আগে থাকতে তারা হিমালয় —মানে গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ অতিক্রম করে ফি বছর কৈলাস মানস-সরোবর যেতেন—পর্বতারোহীদের যারা ঈর্ষার বস্তু—তারা পাহাড়ে যেতেন ধর্মের জন্য।

ধর্ম মানে রিলিজিয়ান নয় ; মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ নির্ভেজাল অংশটুকু নিয়ে এর কারবার। অন্তত এইটুকু বিধর্মীরাও স্বীকার করে থাকেন যে সাইট সিলেকশনে, মানে স্থান নির্বাচনে হিন্দুরা ছিলেন যাকে বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শিবের হেড কোয়ার্টার্স করলেন কোথায়, না মানসের পারে কৈলাসে। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, মুক্তিনাথ—হিমালয়ের সৌন্দর্যের যেমন শেষ নেই, হিমালয়ের হিন্দু তীর্থেরও তেমনি অন্ত নেই। অথচ আল্পসের দেশের লোকেরা এই শত-খানেক বছর আগেও জানত যে, পাহাড় হচ্ছে পৃথিবীর কুৎসিত কুঁজ, ওখানে দুষ্টশক্তি মানে দৈত্য-দানবের বাস। সম্প্রতি এই ইউরোপীয়দের কাছ থেকেই আমরা নতুন করে পর্বতারোহণের পাঠ নিয়েছি। উল্টো-পুরাণ আর কাকে বলে।

হিটলারের জার্মানিতেও পাহাড়ে যাবার মোটিভ নিয়ে কোনরকম অস্পষ্টতা ছিল না। নাৎসীবাদের গৌরব বর্ধনের জন্য ওরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে, ওই একই উদ্দেশ্যে ওরা হিমালয়েও এসেছে। তিরিশের দশকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নাঙ্গা পর্বতে যাকে বলে ব্লিৎসক্রীগ! পর্বতারোহণের পবিত্র বিধিনিষেধগুলি অবজ্ঞা করে তখন গণ্ডায় গণ্ডায় জার্মান নিহত হয়েছে। আল্পস সমেত প্রায় সমগ্র ইউরোপ হিটলারের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, হিমালয় করেনি। অথচ ওই গর্বোদ্ধত জার্মানদের মধ্যে যে কটি খাঁটি জিনিস ছিলেন—যেমন পল বাউয়ার, পিটার আউফ-টসনেইটার, হার্মান বুহল ইত্যাদি—হিমালয় তাদের প্রাপ্যের চাইতেও অনেক অনেক বেশি পুরস্কার দিতে কণামাত্র কুণ্ঠিত হয়নি।

বিশ ও তিরিশ দশকে ব্রিটিশরা যে অত সমারোহ করে তিব্বত ঘুরে এভারেস্ট-এ আসত তারও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়ঢাক পেটানো। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ওইসব অভিযানের পর্বতারোহীরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী ছিল—তবে সেই ধ্বজা তাদের সবাইকেই বহন করতে হয়েছে। গোনাগুনতি দু-দশ জন যারা নিজেদের আনুগত্য হিমালয় ও সাম্রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি করতে সম্মত হননি—যেমন স্মাইথ, শিপটন, টিলম্যান প্রমুখ—তারা স্বেচ্ছায় দলছুট হয়ে আপন আপন সাধনা সম্পন্ন করেছেন। এই দলছুটদের সাধনাতেই পর্বতারোহণের ঐতিহ্যটা গড়ে উঠেছে, সকলের চোখের আড়ালে গড়ে উঠছে।

কিন্তু ঐতিহ্য তো অনেক পরের কথা-আমাদের জিজ্ঞাসা—মানুষ আদৌ পাহাড়ে যায় কেন? কেউ কেউ পাহাড়ে যায় ফিরে এসে জমকালো বই লিখবে বলে। এভারেস্ট শীর্ষ থেকে ঘুরে এসে তেনজিঙের বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে,

বড় চাকরি হয়েছে, এমনকি দ্বিতীয় একটি বউও হয়েছে। আমি একজনকে খুব অন্তরঙ্গভাবে জানি, পাহাড় থেকে ঘুরে এসে সে সাংবাদিক হয়ে গেছে! কিন্তু পরবর্তী কালের এইসব হিসেবপত্র ঘেঁটে আমাদের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুন্দরের যে নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে এবং হিমালয় যে বাস্তবিকই খুব সুন্দর, সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই উদার সৌন্দর্যকে বসবার ঘরের শো-কেসে সাজিয়ে রাখবার উপায় নেই। তাকে ঝটিতি একবার চাক্ষুষ করবার জন্যে আজকের দিনের ছাঁট-কাট করা মানুষেরা এমন হন্যে হয়ে উঠবে—এটা বিশ্বাস করতে কেমন খটকা লাগে। ভগবানের রাজ্যে সবই নিশ্চয়ই সম্ভব, কিন্তু যারা সারাটা জীবন অসুন্দরের সঙ্গে নির্বিবাদে ঘর করবে বলে চুক্তিপত্রে সই করে বসে আছে, তারা হঠাৎ হঠাৎ সৌন্দর্যের পিপাসায় উতলা হয়ে পাহাড়ে ছুটবে—প্রকৃতির রাজ্যে এমন বৈসাদৃশ্য অধিকদিন চলতে পারে না। বায়ু পরিবর্তনের মতো নিছকই মেজাজ পরিবর্তনের জন্য মাঝে মাঝে যারা হিমালয়ে গিয়ে থাকেন তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। পাহাড়ের প্রতিবাদের একটা প্যাশন আছে, পাহাড়ে কিছু দিন না যেতে পারলে যাদের দম বন্ধ হয়ে আসে, শহরের অফিসে থেকে যাদের ফেরারী আসামী বলে মনে হয়,—আমাদের জিজ্ঞাসা, পাহাড়ের জন্য তাদের এই উন্মাদনার উৎসটি কোথায়?

এক এক সময় সন্দেহ হয় যে, সাধারণভাবে প্রশ্নটির হয়তো কোন সর্বজনগ্রাহ্য জবাবই নেই। মানুষ দল বেঁধে কেন কালীঘাটের মন্দিরে যায়। চার্চে যায়। দীঘায় বা দার্জিলিঙে যায়, কোর্ট-কাচারিতে এবং বিদ্যালয়ে যায়—তা মোটামুটি বুঝে নিতে বা বুঝিয়ে দিতে বিশেষ অসুবিধে নেই। কিন্তু পাহাড়ে যাওয়াটা একটু ভিন্ন ধরনের ব্যাপার। এরাও দল বেঁধে পাহাড়ে যায় বটে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ দল না বেঁধে পাহাড়ে যাবার উপায় নেই—সে উপায় থাকলে পর্বতারোহণের চেহারাটাই ভিন্ন রকম হতো।

পর্বতারোহীদের লেখা বই পড়েও আমাদের জিজ্ঞাসার স্পষ্ট কোন উত্তর পাবার আশা নেই। বইগুলিতে অনেক অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা আছে যা পড়তে পড়তে গা হিম হয়ে যায়। প্রায় হতচেতন হার্মান বুহল নাঙ্গা পর্বতের শীর্ষ থেকে রাত্রিবেলা একা একা ফিরে আসছেন,—একেবারে শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা, কিন্তু আদৌ কেন সেখানে যাওয়া হয়েছিল, বইয়ে তার কোন উল্লেখ নেই। পর্বতারোহণের অধিকাংশ বইতেই এ-প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র নেই। এমন হতেই পারে, খুব বড়ো কিছু একবার পেয়ে গেলে তখন জিনিসটা যে আদৌ কেন

চেয়েছিলাম তা আর স্মরণ থাকে না, পাহাড়ে যাবার আগেও অনেক হিসেব-নিকেশ করতেই হয়, কিন্তু পাহাড়ে একবার পৌঁছে যেতে পারলে তখন লাভ-লোকসানের হিসেবটা সম্পূর্ণ তুচ্ছ হয়ে যায়। অতএব আমরা আবারও সেই অথৈ জলে।

তবে পর্বতারোহীদের লেখা পড়ে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, নগর জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হবার পরেই এরা একে একে পাহাড়ে এসে আশ্রয় নেয়। পাহাড়ের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ, প্রায় সকলের বেলায়ই, ঘটে নেহাৎ আকস্মিকভাবে। ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের সাধ ছিল পাইলট হবে। কিন্তু বিমানবাহিনী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বলল, কলজে বড় দুর্বল। স্মাইথ পরে এভারেস্টের ষষ্ঠ শিবিরে—সমুদ্রবক্ষ থেকে প্রায় আটাশ হাজার ফুট উঁচুতে—সেই দুর্বল কলজে নিয়ে উপর্যুপরি তিন রাত নিঃসঙ্গ কাটিয়েছে! পর্বতারোহীর কলজেও একটু খ্যাপাটে ধরনের হয়। কেউ হয়তো ছাত্র পড়াতে পড়াতে, কেউ হয়তো অফিস করতে করতে, কেউ হয়তো বারম্বার মানসিক হোঁচট খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে পাহাড়ে এসে পৌঁছেছে। তবে এদের পাহাড়ে আসার সাক্ষাৎ কারণগুলো যতই ব্যক্তিগত হোক সেগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ ধুয়া আছে। আর সেটি হলো, এককথায়, নগর-বিতৃষ্ণা।

পর্বতারোহণের ইতিহাসেই এর সমর্থন আছে। প্রয়াসটির জন্ম ইউরোপে। সেই ইউরোপ কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিশ্বাস করত যে পর্বতটা আসলে ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা ইত্যাদির স্থায়ী ঠিকানা। শতখানেক বছর আগে সাগর সম্পর্কে আমাদের সমাজে যেমন একটা বিরূপ ধারণা ছিল, ইউরোপেও তখন পাহাড় সম্পর্কে তেমনি বিরূপতা। তারপর ইউরোপীয় সভ্যতা যতই নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে লাগল, পর্বত সম্পর্কে ইউরোপীয় ধারণাটাও ততই বদলে যেতে থাকল। গোড়ার দিকে একটু সঙ্কোচ ছিল, তাই পর্বতারোহণের দুঃসাহসিকতাটুকুর উপর তখন খুব জোর দেওয়া হত, বলা হত, অজানাকে জয় করতে যাচ্ছি। এইটে ইউরোপের খুব প্রিয় স্লোগান। ইউরোপ পাহাড়কে স্বীকার করে নিল। তারপরে নগর সভ্যতা জটিল হতে থাকল, পাহাড়ের প্রতি আকর্ষণও ততই জোরদার হতে থাকল। দুটো বিশ্বযুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর পর্বতারোহী জন্ম নিয়েছে—কেউ কেউ বলে, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের ওই একটাই যুক্তি বা জাস্টিফিকেশন।

প্রথম প্রথম ইউরোপীয় পর্বতারোহীরাও বিশ্বাস করত যে, দুঃসাহসিক কিছু

একটা করবার জন্যই তারা পাহাড়ে যায়। পাহাড়ের চুড়োয় এইবার পদার্পণ করে এলে তারপর কত গৌরব, কত সম্বর্ধনা। কিন্তু আসল সত্যটা এই হিরণ্ময় আবরণে সম্পূর্ণ চাপা পড়ল না। জাতকাট পর্বতারোহীরা আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করল যে, দুঃসাহস-ফুঃসাহস আসলে বাজে কথা। পাহাড়ের চুড়োয় পদার্পণ করা-হোল-কি-হোল-না সেটাও অপ্রাসঙ্গিক। পাহাড়ে যাবার আসল কারণ, পাহাড়ে না গিয়ে পারি না। পাহাড়ে এলে বুক ভরে দম নিতে পারি। পর্বতারোহণের আনন্দ ও চরিতার্থতা পাহাড়ে চড়বার সময়, চুড়োয় কোন গুপ্তধন নেই। পাহাড়ে এসে নিজের চাইতেও বড়ো কিছুকে প্রত্যক্ষ করি, সমীহ করতে শিখি, তাই পাহাড়ে আসি।

ব্যক্তিগতভাবে মাত্রই দু'জন ইউরোপীয় পর্বতারোহীর সঙ্গে আমার বাক্যালাপের সুযোগ ঘটেছে। স্যর এডমাণ্ড হিলারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল গ্রাণ্ড হোটেলের একটা স্যুইটে—১৯৬০ সালে। ঘরময় কাগজ-পত্র ছড়ানো, সোফা কৌচগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, দুটো-তিনটে স্যুটকেস হাঁ করে তাকিয়ে আছে সুন্দরী একটি বউ সোফার কোণে নিঃশব্দে হারিয়ে গেছে, আর সেই সুবিস্তীর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে কার্পেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে এলো গায়ে স্যর এডমাণ্ড হিলারী খুব ব্যস্তভাবে খুব জরুরি কিছু একটা টাইপ করছেন। দেখলেই বোঝা যায় যে, গ্র্যাণ্ড হোটেলের স্যুইটে থাকবার সুবিন্যস্ত যোগ্যতা এর একেবারেই নেই। এমন লোক পাহাড়ে গেলে হাড় জুড়োয়।

অন্নপূর্ণার সেই দুর্দম ফরাসী পর্বতারোহী লায়োনেল টেরো-র সঙ্গে দেখা হয়েছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি কোন সময়ে—গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের লাউঞ্জে। ভদ্রলোকের তখন চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হয়েছে। মাথায় চুল নেই বললেই হয়। পোষাক-আশাক বাহুল্য-বর্জিত। নিতান্তই সাদামাটা চেহারা। এর সম্পর্কে যেসব দুর্ধর্ষ কাহিনী পড়া গেছে সে সবের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ আছে বলেই মনে হয় না। কিন্তু ওর চোখ দুটোর দিকে তাকালেই সব সংশয় দূর হয়ে যায়—অমন সুদূর প্রশান্ত চাউনি কেবল খাঁটি পর্বতারোহীর চোখেই সম্ভব। টেরো আমার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গেই কথা বলছিলেন, কিন্তু বারবারই মনে হচ্ছিল যে, তার দৃষ্টিটা আমাকে ভেদ করে সুদূর কিছুর দিকে স্থির হয়ে আছে। ভদ্রলোক খুব কম কথা বলেন, অনেক থেমে থেমে,—অভিযানের উচ্চতর শিবিরে অক্সিজেন কম বলে পর্বতারোহীরা এমনি থেমে কথা বলে থাকে। ভাবটুকু প্রকাশের জন্য মুখ যতটুকু না-নাড়লে নয়। টেরোর সঙ্গে সেদিন টানা পঁয়তাল্লিশ

মিনিট ধরে কথা হয়েছিল, নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে। কিন্তু সেদিন কথা বলা শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে আসবার পর কেমন যেন একটা অস্পষ্ট সংশয় হচ্ছিল: এতক্ষণ কি সত্যিই টেরোর সঙ্গে কথা বলে এলাম? সংশয়টা যে অমূলক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সংশয়টা তবু আজও পর্যন্ত থেকে গেছে। কুলীন পর্বতারোহীদের এই এক ধারা। শহরের দশজনের ভিড়ের মধ্যে ও নির্জন পাহাড়ের নিঃসঙ্গতা দিয়ে ঘেরা। এরা যখন পাহাড়ে যেতে পারে না, তখন পাহাড়কে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। পাহাড়ের জন্যই উৎসর্গীকৃত।

ঘটনাক্রমে কিছু কিছু ভারতীয় পর্বতারোহীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। এদের সম্পর্কে বিশেষ করে বলবার কিছু নেই। শুধু এটুকু উল্লেখ করতে হয় যে, অন্য কোন লাইনেও এরা সমান সাফল্য অর্জন করত। তবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতি বছর যেসব ছোটখাট অভিযান বেরোয় সেগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু কিছু খাঁটি জিনিস থাকে। এইসব অভিযানের খবর স্থানীয় কোন কাগজের ভিতরের পাতায় কাচিত কখনো বেরোয় অথবা বেরোয় না; এইসব অভিযাত্রীদের সাফল্য অসাফল্য পরিচিত গণ্ডীর মধ্যেই কালে মিলিয়ে যায়। প্রায় সব সময়ই এরা পুরোপুরি বিকশিত হবার আগে ঝরে পড়ে। যেমন গৌরাঙ্গসুন্দর চৌধুরী ১৯৬১ সনে আমাদের সঙ্গে মানা অভিযানে গিয়েছিল। তার বছর তিনেক পরেই বোম্বাইয়ের একটি দলের সঙ্গে গিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে হারিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে অমন পাহাড়-পাগল ছেলে আদৌ জন্মাবারই কথা নয়, ভুল শুধরে নিতেও বিলম্ব হয়নি। গৌরাঙ্গ নেহাতই ব্যতিক্রম। ওর ক্ষেত্রে এমন কথা বলা চলবে না যে, রেলের ভাড়ায় রেয়াই মেলে বলে পাহাড়ে যায়।

সে যাই হোক, এতক্ষণে এটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে, প্রশ্নটির কোন স্পষ্ট জবাব নেই। মানুষ কেন পাহাড়ে যায়?—এই প্রশ্নের কোন সাধারণ, সর্বজনগ্রাহ্য জবাব হতেই পারে না। পাহাড়ের সঙ্গে পর্বতারোহীর সবসময়ই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমনই গভীরভাবে ব্যক্তিগত যে স্বয়ং পর্বতারোহীই সবসময় ব্যাপারটা সঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অতএব মানুষ কেন পাহাড়ে যায়?—এই প্রশ্নের একমেবাদ্বিতীয় কোন জবাব নেই। কিন্তু জবাবদিহি আছে অজস্র—আজও পর্যন্ত যতজন পর্বতারোহী পর্বতের আশ্রয় নিয়েছে ঠিক ততগুলি জবাবদিহি আছে—কেন না, প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে পাহাড়ে যায়। রাম যে কারণে পাহাড়ে যায়, শ্যাম সে কারণে যায় না, যদু আর মধুরও ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে।

সুতরাং, মানুষ কেন পাহাড়ে যায়? আমাকে কেউ এই প্রশ্ন করলে তখন আমি নিজে কেন পাহাড়ে যাই সেটা যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিই। ঘটনাটি

আজো স্পষ্ট মনে আছে। বি. এ, এম. এ পাশ দেবার পর, পুরো সাড়ে চারবছর বেকার জীবন-যাপন করে, তার কিছুদিনমাত্র আগেই একটা চাকরি পেয়েছি। ভালো চাকরি; তখনকার দিনে আড়াই শ' টাকা মাইনে—ইচ্ছা করলে উপরির রাস্তাও আছে। কিন্তু দশটা-পাঁচটা বজায় রাখতেই প্রাণান্ত হয়ে উঠলাম—তার উপর আবার সকলের সঙ্গে হেসে কথা কইতে হয়। এতসব যে তখন ঠিক বুঝতাম তা নয়, কিন্তু ভিতরের জলুনিটা যাবে কোথায়? জলুনিটা শান্ত রাখবার জন্য নগর সভ্যতায় যেসব বিধি-ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার দুটো-একটা ব্যবহার করে যেন হিতে বিপরীত হল। দুঃসহ জিনিসগুলো অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। সেই সময়ই একদিন, অফিসে গিয়ে চোখ তখনো জড়িয়ে আসছে, খবরের কাগজে কুণ্ডু স্পেশ্যালের একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল আড়াইশ' টাকায় কেদার-বদ্রী। এই বিজ্ঞাপন-এর আগেও বহুবার চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই—কিন্তু এইবারে মেজাজটা ভালো ছিল না, তাই ঘটনা আরও একটু গড়ালো। এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, সেই ১৯৫৫ সনেই প্রায় দু'শ মাইল পথ হেঁটে, কেদার-বদ্রী ঘুরে এলাম। ব্যাস, বীজ বপন হয়ে গেল। তারপর থেকে সিজন এলেই পায়ের তলা চুলকোতে শুরু করে। সেই থেকে অদ্যাবধি হিমালয়ে যাওয়া আর আমার শেষ হলো না। হিমালয়ের বৈচিত্র্য একটু একটু করে যতই বুঝেছি, হিমালয়ের আকর্ষণও ততই নিবিড় হয়েছে। এই বৈচিত্র্যেরও শেষ নেই, এই আকর্ষণেরও শেষ নেই।

কিন্তু এতসব ব্যাখ্যা করে বলবার সময় কোথায়? বললে শুনবেই বা কে? তাই কেউ যখন জিজ্ঞেস করে, যে বলতো পাহাড়ে কেন যাও? তখন আমিও দাঁত চেপে সংক্ষেপে জবাব দিই—পাহাড়টা আছে। অতএব যাই। 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার।'

ত্র্যম্বকের অট্টহাস

১৯৫৫ সালে কেদার-বদ্রী পরিক্রমা উপলক্ষ্য করে আমার হিমালয় যাত্রা শুরু হয়। সেই যাত্রা আজও শেষ হয়নি।

গত পঁচিশ বছরে কতবার যে হিমালয়ে গেছি আজ আর তা সঠিকরূপে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। প্রায় ছয়শ মাইল পথ পরিক্রমা করে, গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ ডিঙিয়ে কৈলাস মানস-সরোবর গিয়েছিলাম। অসময়ে নেপালের উত্তর সীমায় মুক্তিনাথ যাবার চেষ্টা করে হাটু ভেঙে মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হই। চারটে বড়ো মাপের পর্বত অভিযানের সহযাত্রী হয়েছি। পেশাগত কারণে একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকের ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা হিসেবে সমগ্র পূর্ব-হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পার্বত্য-এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি পাকা দশ বছর। নেশায় ও পেশায় এমন যুগল মিলন সচরাচর ঘটে না। একদিকে পূর্ব-নেপাল, সিকিম, ভুটান ও পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য মহকুমাগুলো এবং অপরদিকে নাগা মিজো, গারো, খাসিয়া পাহাড় এবং অরুণাচল—ভাবলে নিজেরই তাক্ লেগে যায়—পুরো দশ বছর ধরে এইসব এলাকার আনাচে-কানাচে যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়াবার সুযোগ ঘটেছে। এমন অত্যাশ্চর্য সুযোগ পেয়েও হিমালয়ের যতটুকু দেখতে পেয়েছি—ধারণ তো দূরস্থান—এই মুহূর্তে সে হিসেব না তোলাই নিরাপদ হবে।

গত পঁচিশ বছরে হিমালয়েরই কত পরিবর্তন ঘটে গেল। এই পরিবর্তনের কত ভাগ আশীর্বাদ ও কত ভাগ অভিশাপ, কতোটা অনিবার্য ছিল ও কতটা আরোপিত, এই রূপান্তর আর কতদূর গড়াবে ও কতদিন স্থায়ী হবে—সেসব বিচার করবার মতো এলেম যে আমার নেই সেকথা অম্লানবদনে কবুল করব। কিন্তু পরিবর্তনটা ঘটেছে একেবারে চোখের সামনে। ১৯৬১ সালে মানা অভিযানের মূল শিবিরে পৌঁছতে আমাদের হাঁটতে হয়েছিল, সাকুল্যে সতেরো দিন, ১৯৬৬ সালে মাত্র পাঁচ দিন। মোটরযানের কল্যাণে হিমালয়ের দূরত্ব অনেক কমে গেছে, দুর্গমতা বহুলাংশে খর্ব হয়েছে। এক সময়ে যোশীমঠে মাংসের নামোচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল, এখন তার হাফ প্লেট দেড় টাকা; আগে যারা ক্ষেতে কাজ করত মাল বইতো এখন তারা ট্রাকের হ্যাণ্ডিম্যান হয়ে ড্রাইভার হবার স্বপ্ন দেখে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিকট সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যে, ভাবলে মাথা ঘুরে যায়, দেখলে চোখে জল আসে।

চোখে জল আসবার অন্য কারণও আছে—অরুণাচলের টাওয়াঙে, হিমালয়ের তুষার দুর্গের অন্তঃপুরে, ভেজাল ডালডায় ভাজা গরম গরম পুরি খেলে পরিণামে চোখের জল আসবেই। তবে এক্ষেত্রে অশ্রুজল গোপন করতে হয়েছে, কেননা, আমরা যে মোটরযানে চেপে সেখানে পৌঁছেছিলাম ভেজাল ডালডাও সেই মোটরযানে চেপেই সেখানে হাজির হয়েছে। এক কথায়, গত পঁচিশ বছরে আধুনিক কাল একেবারে হুড়মুড় করে হিমালয়ের চিরন্তনতাকে তছনছ করে দিয়েছে। এর ফলে কোথায়ও ধস নেমেছে, কোথাও আগুন জ্বলেছে, কোথায়ও নদী শুকিয়েছে, কোথাও নদী প্রবাহিত হয়েছে; সবকিছু যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউ জানে না। এমন বিশাল ও বিপুল একটা পরিবর্তন নিজের চোখে ঘটতে দেখা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এই সৌভাগ্য উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হয়েছে কিনা এখনই সেই প্রশ্ন তোলা নিরাপদ হবে না।

বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরের ওই পরিবর্তনগুলো এখন থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগেকার বিশেষ কোন একটি দিনে হঠাৎ ঘটতে শুরু করেনি। লড়াইটা তার বহু আগেই শুরু হয়ে গেছে—একদিকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা অপরপক্ষে সদাশিব হিমালয়—অসম লড়াই, ফলাফলটাও মর্মান্তিক রকম স্পষ্ট—তবুও লড়াই তখনো চলছে, মরণপণ লড়াই। রুদ্র প্রয়াগে ১৯৫৫ সালের সেই প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে, পেট্রোলের অশুচিতা তখনো অলকানন্দা অতিক্রম করেনি, মন্দাকিনী নদীর ধারা অনুসরণ করে সেদিন বিকেলেই আমাদের পদযাত্রা শুরু হবে দুর্গম কেদারনাথের উদ্দেশে। নিজের সম্ভাব্য রোমহর্ষক কাণ্ডটির কথা ভেবে একেবারে জবুথবু হয়ে আছি। মোটরের আওয়াজ তখনো পর্যন্ত অলকানন্দা পেরোতে পারে না, নিস্তব্ধতায় কানে তালা লেগে যায়, চারিদিকের পর্বতশীর্ষগুলো কালের প্রহরীর মতো অনড় অটল, আধুনিকতার কোলাহল থেমে গেছে, চিরন্তনের হাওয়া বইতে শুরু করল বলে—এমন সময় ডুম! অশ্লীল আওয়াজটা কিছুক্ষণ ধরে গুমরে গুমরে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হলো। একটু পরেই আবার ডুম। পাহাড়গুলো আবারও কেঁপে কেঁপে উঠল, প্রতিধ্বনিটাকে হাহাকারের মতো শোনাল। কিছুক্ষণ এই অত্যাচার সহ্য করে তারাদা সেদিন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, 'দানবেরা সব সময়ই প্রথম রাউণ্ডে জিতে থাকে।' দেবতাদের সম্পর্কে আমার অতটা ভরসা ছিল না। খুব স্পষ্টভাবে না হলেও আমি সেদিন বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, এক-একটা ডিটোনেটর ফাটছে আর হিমালয় এক-এক পা পিছু হটছে। হঠাৎ ধনীদের দাপটে বনেদি-ধনীরা যেমন পিছু হটে যায় এ তার চাইতেও মর্মন্তুদ। রুদ্র

প্রয়াগে সেদিন আমি অটলকে টলতে দেখেছি, হিমালয়কে শিউরে উঠতে দেখেছি।

আরো একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে, কৈলাস মানস-সরোবর যাবার পথে পিথোরাগড় এসে আটকে গেছি। মালবাহক পাওয়া যাচ্ছে না বলে পদযাত্রাও শুরু হচ্ছে না—দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। রোজ সকালে গিয়ে মালবাহকদের সরকার অনুমোদিত ঠিকাদার নয়ন সিং হোন্দারের দরবারে ধর্ণা দিই—তিনি তার মঙ্গোলীয় চোখ দুটি ঈষদুন্মুক্ত করে সবুর করতে বলেন। মালবাহকেরা পেটের দায়ে এরই আজ্ঞাবহ। তীর্থযাত্রীরা তো আজ আছে কাল নেই—কিন্তু ইনি আছেন এবং থাকবেন। অবশেষে আমাদের যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার অবস্থা তখন হঠাৎ ঘনশ্যাম পুনেথা নামে এক কুমায়ুনী ভদ্রলোকের নাগাল পাওয়া গেল। একেবারে সাক্ষাৎ দেবদূত। মাত্রই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুনেথাজী নিঃশব্দে আমাদের জন্য মালবাহক সংগ্রহ করলেন, লাঠির তলায় লোহা লাগিয়ে আনলেন, সস্তায় চালটা-চিঁড়েটা কিনে দিলেন এবং কৈলাসের পথে মাইল দুয়েক পথ এগিয়ে দিয়ে গেলেন —অথচ পুনেথাজী নিজে কখনো কৈলাস যাননি। ঘনশ্যাম পুনেথা ও নয়ন সিং হোন্দার—হিমালয় যা ছিল আর হিমালয় যা হবে—এই দু'জনকে সেবার একই সঙ্গে পিথোরাগড়ে দেখেছিলাম। তারপরে আর পিথোরাগড়ে যাওয়া হয়নি। গেলে, নয়ন সিঙের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই আজও পাওয়া যাবে, কিন্তু ঘনশ্যাম পুনেথাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে কি? পুনেথাজীরা অনেকদিন হারিয়ে গেছেন।

হিমালয়ের আরও কত কি যে হারিয়ে গেছে। গঙ্গা, অলকানন্দা, মন্দাকিনীর তীর ধরে পথের দু'ধারে তখন কতশত চটি ছিল। এক বেলা কিম্বা এক রাত্রির ক্ষণস্থায়ী পরিচয়, কিন্তু তার মধ্যেই কি অসীম অন্তরঙ্গতা। ক্লান্তদেহে চটিতে এসে পৌঁছলে মনে হত যেন মায়ের স্নেহে ফিরে এলাম। দিনের যাত্রা শেষ হয়েছে, আর কোন তাড়াহুড়ো নেই। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে, নদীর কলস্বর পঞ্চমে উঠবে, গনগনে আগুনের সামনে বসে পণ্ডিতজীরা রুটি সেঁকতে শুরু করবেন। মোটর রাস্তার দৌরাত্ম্যে সেইসব চটি—কলকাতার ছ্যাকড়া গাড়ির মতো—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলতে এখনো কোথায় যেন একটু আটকায়। এখনো কোথায় যেন একটু আশ্বাস আছে যে, একদিন আবার এই দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে পুরানো দিনের চটিতে আবার পুরানো দিনের সন্ধ্যা ফিরে আসবে।

কাদিকা চটির কথা মনে পড়ে। কৈলাসের পথে বালুয়াকোট আর ধারচুলার

মাঝখানে ছিল এই কালিকা চটি। প্রতিপদে পথ সৌন্দর্য অতিক্রম করতে করতে সেদিন আমাদের এমনিতেই একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার উপর ভাগ্যদোষে পথের শেষের দিকটায় বৃষ্টি ঝেঁপে এল। কাকভেজা অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে কালিকা চটির একটা চায়ের আটচালায় মাথা গুঁজলাম। আক্ষরিক অর্থেই মাথা গোঁজা, কেন না, দোকানের বেঞ্চে বসবার পর কেবল মাথাটাই বৃষ্টির প্রত্যক্ষ ঝাপটা থেকে রেহাই পেল, পৃষ্ঠদেশ অসহায়ের মতো যেমন ভিজছিল তেমনি ভিজতে থাকল। কিন্তু হাতে চায়ের গ্লাস আসতেই আমরা চাঙা হয়ে উঠলাম। প্রমাণ সাইজের মোটা কাঁসার গ্লাসে আধাআধি দুধ ও দা-কাটা চায়ের লিকার মিশিয়ে পুরো এক গ্লাস ডবলহাফ। গ্লাসটা এত গরম ছিল যে, অন্য সময় হলে ছ্যাঁকা লেগে যেত। অন্য সময় হলে ওই তপ্ত তরলিকার উষ্ণ লেহনে ঠোঁট, জিভ, গাল, অন্ননালী সব পুড়ে খড়খড়ে হয়ে যেত—কিন্তু সেদিন দেহের শিরা-উপশিরায় যেন একটা আনন্দধারা প্রবাহিত হল। গ্লাসটায় খোদাই করে লেখা ছিল—খড়্গ সিং। সেই কালিকা চটি সেই বৃষ্টি বিধ্বস্ত সন্ধ্যা, সেই খড়্গ সিং—এরা সব আজ কোথায় অন্তর্ধান করল?

আরো কত চেহারা, কত চরিত্র। গার্বিয়াঙের কীচ খাম্পার বাসনা ছিল একশ বার কৈলাস পরিক্রমা করবে। আমাদের সঙ্গে ১৯৫৭ সনে ৮৫ নং পরিক্রমা করেছিল। তার অল্পদিন পরেই দিল্লি পিকিং কি মন কষাকষি হল—কৈলাস পথ বন্ধ হয়ে গেল। কীচ খাম্পার বোধহয় আর বন্ধুত্ব লাভ করা ঘটে ওঠেনি। ওর পথ প্রদর্শকের পেশাটিও সেই সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তাই নিয়েও কোন রকম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বলে শুনিনি। মাথা সমুন্নত রেখে পরাজয় বরণ করবার ক্ষমতা ধরত গার্বিয়াঙের কীচ খাম্পা। রিনীর কেদার সিং, গাজুর তুলা সিং, দার্জিলিঙের আং সেরিং, পামাং ফুটার প্রভৃতি শেরপারা, পিথোরাগড়ের ঘনশ্যাম পুনেথা আসলে এরা সবাই, এবং আরও অনেকে, ওই কীচ খাম্পার দলেরই লোক। আমি এদের সংস্পর্শে আসবার অব্যবহিত আগেই এরা নিজেদের সত্তা, উদারতা, পারদর্শিতা, দৃঢ়তা এবং নম্রতা নিয়ে পেশা থেকে অবসর গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। একদিনের তরেও এদের এতটুকু বিচলিত হতে দেখিনি। অর্বাচীনদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এরা নিজেদের অমর্যাদা করবে এমন কথা ভাবাই যায় না—এমন প্রস্তাব শুনলে ওরা অপমানিত বোধ করত। আধুনিককালের উদ্ধত ধাঁধ দেখেই এরা বুঝেছিল যে, এর সঙ্গে লড়তে গেলে গায়ে কাদা লাগবে। তার উপরে লড়াইয়ের পুরানো নিয়ম-কানুনগুলো এই অর্বাচীনের জানা নেই, অনায়াসে

যখন তখন যজ্ঞাগারে এসে হাজির হয়। এরা তাই লড়াইয়ের আগেই সসম্মানে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। হিমালয়ের উপরে এদের অগাধ আস্থা আছে। এরা জানে যে, হিমালয়ের কাছে এই অর্বাচীন একদিন হেরে যাবেই। ততদিন এরা কেবল তাদেরই পাশে গিয়ে দাঁড়াবে যারা এদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করবে। এমন সগৌরবে পরাজয় বরণ করা যে সম্ভব তা এদের না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

অথচ পূর্ব-হিমালয়ে আধুনিককালে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের অভ্যর্থনা জুটেছে। পূর্ব-হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পাহাড়ী এলাকার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি—১৯৬৪ সালে। সিকিম আর ভুটানের কর্তা ব্যক্তিরা তখন দিল্লিকে ডিঙিয়ে বহির্বিশ্বে চরে বেড়াবার ষড়যন্ত্র করছে। পশ্চিমবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় নেপালীরা সুযোগ মতো সমতলবাসীদের চড়টা-চাপড়টা মারতে শুরু করেছে। সশস্ত্র আন্দোলনের পর আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাগাল্যাণ্ড স্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে সশস্ত্র আন্দোলন চলছে। মিজোরামে খুব দ্রুত ইন্ধন সংগ্রহের কাজ চলছে, শীঘ্রই দপ করে আগুন জ্বলে উঠবে। খাসিয়া এবং গারো পাহাড়েও পৃথক রাজ্যের দাবীতে কানফাটা তর্জন গর্জন শুরু হয়ে গেছে, যে কোন সময় কামড় বসিয়ে দিতে পারে। আর নেফায় মানে পরবর্তীকালের অরুণাচলে, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে, সকলের অগোচরে, একটা অসম্ভব কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে : নেফার উপজাতি জীবনধারা সম্পূর্ণ অটুট রেখে বা কিছুমাত্র বিঘ্নিত না করে সেখানে আধুনিককালের যাবতীয় সুখ-সুবিধা প্রসারিত করে দেওয়া ; এক কথায়, ডিমটি না ভেঙে ওমলেট ভেজে খাওয়াবার আয়োজন।

১৯৬৪ সন থেকে বাকি দশ বছর পূর্ব-হিমালয়ের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এই সুবিস্তৃত এলাকায় এমন একজন লোকের সঙ্গেও পরিচয় হয়নি যাকে কাঁচ খাম্পার বা আং শেরিঙের বা পাসাং ফুটারের অন্তত ছায়া বলে ভুল হতে পারে। হিমালয়ের কাছ থেকে দু-হাত ভরা পেয়ে পেয়ে আমার প্রত্যাশা তখন খুবই লালায়িত ছিল। কিন্তু আমার অনুসন্ধান সফল হয়নি, প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি।

অবশ্য একথা ঠিক যে, পূর্ব-হিমালয়ের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয় তখন আমার অপেক্ষাকৃত বয়স হয়েছে। সহজ জিনিসকে সহজভাবে গ্রহণ করবার সহজ প্রবণতাটা যে বয়সে খুব জাগ্রত থাকে সে বয়সটা তার আগেই পেরিয়ে এসেছি। তদুপরি আমি আবার তখন পেশাদারী সাংবাদিক—যে পেশাটি সম্পর্কে যত কম

বলা যায় তত ভাল। সাংবাদিক হিসেবে আমি তখন আর সহজে ভুলবার পাত্র নই। আকাশের রঙ তারিফ করবার আগে আমাদের খবর নিতে হয় যে, রঙটা পাকা কিনা, জানতে হয় যে, এমনভাবে সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধাঁনোর পিছনে গূঢ় কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা। সহজ জিনিসের পিছনে জটিলতা আবিষ্কার করা আমাদের পেশাগত দায়িত্ব। শিষ্টাচার আমাদের কাছে সন্দেহজনক, আপ্যায়ন সর্বদাই অভিসন্ধিমূলক এবং ভালোমানুষী মানে ভণ্ডামী। পরিণত বয়সের ঝানু চোখে কি গাড়োয়াল কুমায়ুনকে অমন মায়াময় মনে হত? সাংবাদিক হিসেবে কীচ-থাম্পা বা আং শেরিঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে কি ওদের মহত্বের পরিচয় পাওয়া যেত? এসব কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে সৌভাগ্য কখনো-সখনো ঠিক সময়মত এসে হাজির হয়। তবে এক্ষেত্রেও সৌভাগ্যটি স্থায়ী হয়নি।

পূর্ব-হিমালয়ে সবসময়ই আমি নিজের এইসব দুর্বলতার কথা স্মরণ রাখবার চেষ্টা করেছি। একজন 'রাজনীতি সচেতন' ভারতীয় হিসেবে এইসব এলাকার লোকদের সম্পর্কে যেসব কুসংস্কার আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে সেগুলোর কথাও নিজেকে কখনো ভুলতে দিইনি। কিন্তু এতসব প্রস্তুতি সত্ত্বেও আমার অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। সমগ্র পূর্ব-হিমালয়ে তন্নতন্ন খুঁজেও আমি একজন কীচ থাম্পা বা একজন আং শেরিঙের দেখা পাইনি! যা দেখেছি তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, প্রায় বীভৎস। মানুষের বৃত্তিগুলোকে ঠিক পথে চালাতে না পারলে সেগুলো দ্বিগুণ তেজে বাঁকা পথ ধরে—একথাটা মোটামুটি শোনা ছিল। গাড়োয়ালে বা কুমায়ুনে যে বৃত্তিগুলো সুকুমার হয়ে ফুটে উঠেছে। পূর্ব-হিমালয়ে সেগুলোই হয়েছে ফণি-মনসার ঝাড়।

টাওয়াঙের কথা মনে পড়ে, জীপে করে গিয়েছিলাম। চির-তুষারের পটভূমিকায় প্রায় শ'পাঁচেক বছরের প্রাচীন-টাওয়াং গোম্ফাটি বাইরে থেকে ফটো তুললে খুব শান্ত সমাহিত দেখায় মনে হয় ভগবান বুদ্ধের কাছে আত্ম-নিবেদন করবার উপযুক্ত জায়গা। কৈলাসের পথে গোয়ুল, ভিরাফুক, জুথুলফুক ইত্যাদি গোম্ফা আমার দেখা ছিল, ভেবেছিলাম বহুখ্যাত টাওয়াং সেসবের চাইতে উন্নততর কিছু হবে। ভেবেছিলাম, স্মৃতির ভাণ্ডারে মূল্যবান একটি সংগ্রহ জমা পড়বে। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি।

সরকারী জীপ টাওয়াং গোম্ফার সদর ফটকে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে একদল শিশু-লামা (তাবা) এসে আমাদের ছেঁকে ধরল, শুঁকে দেখল, তারপের চোখের নিমেষে

আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আমাদের কেউ বাধা দিল না, কেউ আপ্যায়ন করল না, গোম্ফার ছোট, বড়, মাঝারি লামারা সন্দেহাকুল চোখে আমাদের দিকে তাকাল—আহত পশু যেমন সন্ত্রস্ত শিকারীর দিকে তাকায়—কিন্তু কেউ কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না। এক দঙ্গল অপরিচিত লোক গোম্ফার ভিতরে ঢুকে পড়েছে অথচ তাতে কেউ এতটুকু বিস্মিত নয়, দুঃখিত নয়, পুলকিতও নয়। অস্বস্তি লাগছিল। এমন বিভ্রান্তিকর আপ্যায়নের পর সুবিশাল গোম্ফার যে মহলেই যাই সেখানেই সন্দেহ থিক থিক করছে। অবশেষে সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখ্য লামার সঙ্গে শিষ্টাচার সেরে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন মনে হল—একটুও বাড়িয়ে বলছি না—যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বহির্গত হলাম।

যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস টাওয়াং গোম্ফায় পুঞ্জীভূত দেখেছিলাম—পুরো দশ বছর ধরে তারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখেছি সুবিস্তৃত পূর্ব-হিমালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। অধিকাংশ জায়গায় অবস্থা ততোধিক খারাপ। সেই একই সন্দেহ নাগাল্যাণ্ডে ও মিজোরামে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেহারা নিয়েছে, মণিপুরে মুক্তিযুদ্ধ করছে, আসামে ও মেঘালয়ে বীভৎস সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের কারণ হয়েছে। সর্বত্রই সদাসর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়—সন্ত্রস্ততা ঢাকা দেবার জন্য পদাধিকার অনুযায়ী নানারকম ব্যবস্থা আছে। কেউ চোখ রাঙায় কেউ বন্দুক উঁচিয়ে ধরে, কেউ কেউ আবার এমন ভাব করে যেন সব কুছ ঠিক হ্যায়। কিন্তু হিমালয়ের উদার উদ্দাম হাওয়ায় যে একবার বুক ভরে দম নিয়েছে—এখানকার গুমোট আবহাওয়ায় তার শ্বাসরুদ্ধ হবেই।

গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের যখন যেখানে গেছি, তখন সেখানেই পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার পেয়েছি, পূর্ব-হিমালয়ে নিকট বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েও আড়ষ্টভাবটা কাটেনি। মধ্য-হিমালয় ও পূর্ব-হিমালয়ের মধ্যে এই ব্যবহারগত বৈপরীত্যের অনেক কারণ আছে। বহু বহু সভ্যতার উত্থান-পতন দেখে মধ্য-হিমালয় মোটামুটি স্থির করে নিয়েছে যে, যা অনিবার্য তার প্রতিরোধ করে কোন লাভ নেই, তাতে কেবল তিক্ততা বাড়ে ; ভেজাল জিনিস আপনা থেকেই একদিন খারিজ হয়ে যাবে! কিন্তু পূর্ব-হিমালয়ের আত্ম-বিশ্বাস এখনো ততটা মজবুত নয়। হবার কথাও নয়। পূর্ব-হিমালয়ের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি কিছুই এখনো সুনির্দিষ্ট একটা আকার নেয়নি, সবকিছু এলোমেলো হয়ে আছে। কোন ব্যাপারে কার কতটুকু এক্তিয়ার তা যতদিন স্থির না হয় ততদিন রেষারেষি থাকবেই। একদিকে রেষারেষি করব আরেকদিকে উদার থাকব—বিশ্বপ্রকৃতিতে এমন সুব্যবস্থা নেই। পূর্ব-হিমালয়ের অনেক জায়গায়ই প্রবেশ করতে হলে আগে থেকে সরকারের

শীলমোহর দেওয়া 'এন্ট্রি পারমিট' মানে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এই দুর্নীতিপরায়ণ দেশে কাজটা মোটেই শক্ত নয়—নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে দু-পাঁচ টাকা গুঁজে দিলেই কার্য সমাধা হয়ে যায়। কিন্তু এন্ট্রি পারমিটের এই সম্পূর্ণ অর্থহীন ব্যাপারটিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর মধ্যে একটা বহুদূরাগত তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব। আসলে পূর্ব-হিমালয়ের সমস্ত ব্যাপ্তি জুড়ে নানা ভাষায়, নানা কায়দায় লেখা আছে: প্রবেশ নিষেধ—সংরক্ষিত এলাকা। মধ্য হিমালয়ের সব দরজাই খোলা সেখানে সকলেরই আমন্ত্রণ আছে, শত্রু বলে প্রমাণিত হবার আগে পর্যন্ত সেখানে সবাই বন্ধু। কিন্তু পূর্ব-হিমালয়ের সব দুয়ারেই আগল আঁটা, পরিচয়পত্র দেখিয়ে প্রবেশলাভ করতে হয়। সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত অবস্থায়ও মধ্য-হিমালয়ের মুখে হাসি লেগেই আছে; পূর্ব-হিমালয়ের চোখে সবসময়ই সন্দেহ-কুটিল দৃষ্টি।

পূর্ব-হিমালয়ের এই রুক্ষ, নিষ্ঠুর মেজাজের বহুবিধ কারণ আছে। ভূগোল এই এলাকাটিকে দীর্ঘদিন বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। প্রকৃতি এখানে করালবদনা। একবার বৃষ্টি নামলে আর থামে না—পাহাড়ে ধস নামে, নদীতে বান ডাকে, ক্ষেত-খামার জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—প্রতি বছর। অরণ্য এখানে এই সেদিন পর্যন্তও সম্পূর্ণ আদিম ছিল—গণ্ডারও হাতির আদিনিবাস—দূর দূর দেশ থেকে সাপুড়েরা বিষাক্ত সাপ ধরতে আসত। আবহাওয়া ছিল নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর। এই এলাকার দুর্ধর্ষ মশকবাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে দুর্জয় মোগলসেনাকেও বারম্বার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হয়েছে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে লেন-দেন বন্ধ থাকায় এই এলাকার ইতিহাসও আপন গণ্ডির মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। ছোট-বড় সম্পূর্ণ আদিম কিম্বা অতি-অল্প-অলোক প্রাপ্ত, অজস্র উপজাতি আপন আপন ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি রক্ষা করবার জন্য অথবা নিজেদের এলাকাটি আরেকটু বাড়িয়ে নেবার চেষ্টায়, নিজেদের মধ্যে লড়াই করত, সন্ধি করত। এমনি করতে করতেই সময় পূর্ণ হলে, এরাও নিশ্চয়ই একদিন ভারতের সঙ্গে এক দেহে লীন হয়ে যেত।

কিন্তু বাদ সাধল ইতিহাস। ইতিহাস একটু ভ্রূ-কুঞ্চন করতেই ব্রিটিশ উপনিবেশের ধ্বজা তুলে আধুনিককাল হঠাৎ পূর্ব-হিমালয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হল—হুড়াম করে। ব্রিটিশরা অতি-বিচক্ষণ দোকানদারের জাত—এই এলাকার পার্বত্য উপজাতিদের ঘাঁটাতে গেলেই যে ঘোঁট পাকিয়ে উঠবে তা সে উত্তমরূপে জানত। তার প্রয়োজনও ছিল না। দোকানদারী তো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়।

কেবল যাতে ওরা পাহাড় থেকে এসে কোনরকম হামলা না করতে পারে, সেজন্য মাঝে মধ্যে দুটো-চারটে ফাঁকা গুলির আওয়াজ আর কিছু ঈশা কথিত সুসমাচারই যথেষ্ট। অবশেষে একদিন ব্রিটিশরাও মঞ্চ ছেড়ে বিদায় হল। এই এলাকার ব্রিটিশোত্তর যুগের লজ্জাকর ও মর্মন্তুদ ইতিহাস সকলেরই জানা। রক্ত কুটিল পথে সেই ইতিহাস আজও বহমান। এর শেষ কোথায়, সেই কথা চিন্তা করে দিল্লি এখন নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে।

আদার ব্যাপারী, জাহাজের জন্য উদ্বেগ বা সমবেদনা প্রকাশ করে লোক হাসাব না। কিন্তু এই রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পূর্ব-হিমালয়ে ভারতীয় মাত্রেই সন্দেহভাজন। এন্ট্রি পারমিটের আমলাতান্ত্রিক তুচ্ছতাটুকু এক তুড়িতেই উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এই এলাকার উপজাতিদের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে হলে তোমাকে সন্দেহ সমুদ্র অতিক্রম করে বোঝাতেই হবে যে তুমি ওদের শত্রু নও, ওদের বন্ধু। অনেকেই অনেক চেষ্টা করেও একাজে সফল হন না—আমাদের সর্বশক্তিমান আমলাতন্ত্র এব্যাপারে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। দার্জিলিঙের শেরপাদের মতো এদেরও একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। শেরপারা যেমন দূর থেকে দেখে বলে দিতে পারে তুষারাবৃত হিমবাহের কোন্ দিকটা নিরাপদ আর কোন্ দিকটা বিপজ্জনক, এরাও তেমনি চোখ বুজে অজস্র সজ্ঞান অথবা অজ্ঞান তোষামোদকারীর মধ্য থেকে আপনজনটিকে বেছে নিতে পারে—নির্দ্বিধায়। বলতে গর্ব বোধ হয় যে, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম মণিপুর, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের বেশ কিছু উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ আমি পেয়েছি! মোনপাদের সঙ্গে আরক, আপাতানি ও ডাফলাদের সঙ্গে আপং, নাগাদের সঙ্গে মধু, মিজোদের সঙ্গে জু, খাসিয়াদের সঙ্গে কাকিয়াদ খেতে খেতে এদের নাড়ির স্পন্দন আমি শুনেছি। দুটো কানই অশিক্ষিত, যতটা শুনেছে, ততটা বুঝে উঠতে পারেনি। তাহোক, যতটুকু বোঝা গেছে ততটুকু শিউরে উঠবার মতো।

গাড়োয়াল বা কুমায়ুন পাহাড়ের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয়েছে, ওইসব এলাকা তার অনেক আগেই ইতিহাসের সব ঝড়-ঝাপ্টা সামলে নিয়ে স্থিতধী হয়ে বসেছে। অপরদিকে, পূর্ব-হিমালয়ে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সেখানে তোলপাড় কাণ্ড চলছে। একদিকে নিষ্করুণ প্রকৃতি, আরেক দিকে ততোধিক নিষ্করুণ আধুনিক-কাল। তারই মধ্যে গভীর যন্ত্রণায় পূর্ব-হিমালয় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। মধ্য-হিমালয়ে যাকে পরিণত অবস্থায় দেখেছি এখানে তারই যৌবনের জীবন-সংগ্রাম। শুধু শিউরে উঠবার মতো ব্যাপারই নয়, অবাক চোখে দেখবার মতোও বটে।

রুদ্ধশ্বাস টাওয়াং গোম্ফা থেকে বেরোলেই সামনে টাংগার তুষারাবৃত

পর্বতশিরা। ওই টাংলার তুষারশুভ্রতায়ও চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষের সময় প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু টাংলা সে ঘটনা স্মরণ রাখেনি, সেজন্য এতটুকু অনুতাপও নেই। টাংলারও সেই অট্টহাসি যা দেখেছি কেদারনাথে, কৈলাসে, নন্দাদেবীতে, নন্দাঘুন্টিতে, নীলকণ্ঠে, মানায়, কামেটে। সেই আকাশজোড়া উদারতা।

অরুণাচলের সুবনসিরি বা সিয়াং এখনো অলকানন্দা বা মন্দাকিনীর কৌলীন্য লাভ করেনি। দু-পারের উপজাতিসমূহের মতোই, সুবনসিরি বা সিয়াং নদী দেখলে প্রথমেই যা মনে হয় তা হল—ভয়ঙ্কর। যেন করাত দিয়ে পাহাড় কেটে পাতাল গভীরে ফুঁসছে, গোমরাচ্ছে। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীকে নিয়ে কত রূপকথা, গাথা, কাব্য-কাহিনী, সিয়ান, সুবনসিরিকে নিয়েও অনেক গল্পকথা আছে, কিন্তু সেগুলো সবই রোমহর্ষক—শুনতে শুনতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। কিন্তু অনেক দিন ক্লান্ত সন্ধ্যায় এইসব ভয়ঙ্কর পাহাড়ী নদীর ধারে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তখন দেখেছি এদের রণবাদ্যের মধ্যেও দূরাগত একটু বংশীধ্বনি আছে। আপন করে নিলে এরাও আপন হবে। এরাও সেই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায়।

হিমালয়ের বৃহৎ একটি অংশ আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে তৈরি অবস্থায় পেয়েছি। সেই হিমালয়েরই নাতি ক্ষুদ্র একটি অংশ তৈরি করে নেবার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন করা চলে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অংশটুকু আমাদের হাতে কি অবস্থায় আছে? তাছাড়া আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তারই বা কতটুকু কি হল?

আগেও বলেছি, গত সিকি শতাব্দী হিমালয়ের পক্ষে একটা অত্যন্ত ঘটনাবহুল সময়। এর সূত্রপাত যদিও তার কিছুদিন আগেই, তবুও গত পঁচিশ বছরে হিমালয়ের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার আগে আড়াই হাজার বছরেও ততটা ঘটেনি। অবশ্যই, কেবল বাইরের দিকের পরিবর্তনের কথাই বলা হচ্ছে, সম্পূর্ণ ফলাফল কষে দেখবার লোক আজ কোথায়! কিন্তু বাইরের পরিবর্তনে ভিতরেও নানারকমের চাপ সৃষ্টি হবেই নানা আকারের, নানা প্রকারের, নানা উত্তাপের। হিমালয়ের কেবল যে বাহিরটাই আক্রান্ত হয়েছে তা নয়, ভিতরটাও রেহাই পায়নি।

বছর দশেক আগে ধৌলী ও ঋষিগঙ্গার সঙ্গমের কাছাকাছি রিনি গ্রামে পৌঁছতে হলে, মোটর রাস্তা ছাড়িয়ে আরও পাঁচ দিনের পথ হাঁটতে হত। এই দূরত্ব অতিক্রম করে মোটরের আওয়াজ আর পেট্রোলের গন্ধ দুই-ই নেহাত কমজোরী হয়ে পড়ত। আজ সেই রিনি গ্রামের অঙ্গন দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বড়ো বড়ো

মিলিটারি ট্রাক আর যাত্রীবোঝাই বাস চলাচল করে। অঙ্গনটিতে চিরকাল মুরগীরা শস্য খুঁটে খেয়েছে, গরু ছাগলরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অলসভাবে জাবর কেটেছে। আজ দূর থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেলেই মুরগীগুলো প্রাণভয়ে ছুটকে এদিক-সেদিক পালিয়ে যায়, গরুগুলো পাহাড়ের বিপজ্জনক ঢাল তুচ্ছ করে দিখি-দিকশূন্য ছুটতে থাকে—কেবল ছাগলগুলো গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে আর বিজ্ঞের মতো বিরক্তি প্রকাশ করে যেন বলতে চায়, ব্যাপারটা কী? অঙ্গনের মাঝখানে যে সুবিশাল পাকুড় গাছটি ছিল, সেটি অনেক দিন আগেই নিরুদ্দেশ হয়েছে।

এইসব নয়-ছয়কাণ্ড তো বাইরে থেকেই দেখা যায়,—কেউ এসবকে বলে প্রগতি, কেউ বলে সর্বনাশ। এই মোটর গাড়ির আওয়াজ ও পেট্রোলের গন্ধে রিনির চিরাগত সেই গ্রাম্য-জীবন আর কোথায় কতটা বিপর্যস্ত হয়েছে? রিনির আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা-ব্যবস্থা, ধর্ম-বিশ্বাস, মহিলা-সমাজ, শিক্ষক ও পড়ুয়ারা—রিনির মোটরযুগে এরা সবাই কেমন আছে? পুরানো হিমালয় হাজার হাজার বছরের সাধনায় যে হিমালয় আমরা গড়ে তুলেছি—আধুনিকতার কোলাহল ও ধোঁয়ায় তা কি চিরদিনের মত হারিয়ে গেল? উৎকণ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করবার মতো আরও কয়েকটি প্রশ্ন আছে। পুরানো হিমালয়ের কতোটুকু কী অবস্থায় এখনো অবশিষ্ট আছে? আদৌ যদি কিছু থেকে থাকে তবে তার দম আর কতটুকু? শেষ পর্যন্ত কুলোবে কি? যদি কুলোয়, তবে এই দুঃসময় কেটে গেলে সেই অক্ষয় বীজ থেকে হিমালয় কি আবার তার সবকিছু ফিরে পাবে?

গত পঁচিশ বছর ধরে অধিকাংশ সময় নিজেরই অগোচরে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি,—এই সেদিন পর্যন্ত প্রশ্নগুলো তেমনভাবে দানাবদ্ধ হয়ে ওঠেনি, সন্ধান তবু চলেছে। তীর্থযাত্রীদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে যাত্রী হিসেবে, পর্বতারোহীদের সঙ্গে প্রায় কুচকাওয়াজ করতে করতে অভিযাত্রী হিসেবে এবং শেষ, পর্যন্ত নোটবুক পেন্সিল হাতে সাংবাদিক হয়ে হিমালয়ে গেছি। কিন্তু এত কল-কৌশল করেও ওই সব জটিল প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব হিমালয়ের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছে ধরেই নিয়েছিলাম যে এসব প্রশ্নের আসলে কোন জবাব নেই। সকলেই আপন আপন সংস্কার মতো একটা ধারণা করে নেয় এবং তারপর সারা জীবন ধরে প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে সেই ধারনাটিকে পরিপুষ্ট করে তুলতে থাকে। এতকাল আমিও ঠিক তাই করেছি।

এমন সময় এই ১৯৮০ সালেই একটা অভাবিত সুযোগ এসে গেল। ১৯৩০ সালের প্রথম নন্দাঘুন্টি অভিযানের বিশতি বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্য করে নন্দাঘুন্টি জয়ন্তী

অভিযানের তোড়জোড় চলছে সেই অভিযানে পুরানো নন্দাঘুন্টির আদি সদস্যদের সাদর আমন্ত্রণ : মূল শিবির পর্যন্ত।

বিশ বছর পরে আবার সেই পুরানো পথ ধরে আবার সেই পুরানো নন্দাঘুন্টি এমন সৌভাগ্য কটা জীবনে আসে? এবারে আর আমি যাত্রী নই, অভিযাত্রী নই, সাংবাদিকও নই। বলতে গেলে এবারে আমার কোন ভূমিকাই নেই। কেবল স্মরণ আর মনন। বর্তমানের দৃশ্যগুলোর পাশে অতীতের ছবিগুলো সাজিয়ে শুধু পত্তিয়ে দেখা যে, পরিবর্তন কতটা এগোল, কী হারে এগোল এবং ঘটনার গতি কোনদিকে। এই নিয়েও কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। এমন সুযোগকে হিমালয়ের আশীর্বাদ বললে কি তা ভাবালুতা হবে?

সে যাইহোক, এবারে হরিদ্বার থেকেই মন খুব খারাপ। ১৯৫৫ সালে হরিদ্বারের পথে ঘাটে সাধু বা যাত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, এবারে তারা একেবারেই কোণঠাসা। ১৯৬০-৬১ সালেও দেবপ্রয়াগ ছিল তীর্থস্থান, এখন সেটা একটা বাস স্ট্যাণ্ড। ১৯৫৫ সালে শ্রীনগরের কোন চটিতে আশ্রয় না পেয়ে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছিলাম এবং একটু ভরসা দেবার জন্যই হয়তো আকাশের তারাগুলো সেদিন রাত্রে শ্রীনগরের খুব কাছাকাছি নেমে এসেছিল—এখন সেখানে দুটো সিনেমা হল। যোশীমঠে পেল্লায় সামরিক ছাউনি হয়েছে, তার দাপটে পুরানো যোশীমঠ কোথায় তলিয়ে গেছে। ট্যুরিস্ট বাসে চেপে অবশেষে রিনি পৌঁছন গেল। পুরানো রিনির সন্ধান করে কোন লাভ নেই, শুধু দেখা গেল যে ধৌলীগঙ্গা আর ঋষিগঙ্গা ঠিক আগেকার মতোই অবারিত মিলেমিশে যাচ্ছে। রিনির অপর যে বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রয়েছে, সে হল মাছি। সমতল-বাসীদের প্রতি রিনির মাছিরা আগেও একটু পক্ষপাতিত্ব করতো, এবারে একেবারে ছেঁকে ধরল।

খবর নিয়ে জানা গেল, আমাদের পুরানো বন্ধু-বান্ধবরাও সবাই ছত্রখান হয়ে গেছে। কেদার সিং, বচন সিং, ভীম সিং কেউ বেঁচে নেই। গোরা সিং বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায় আছে কেউ জানে না।

এর আগে তিন-তিনবার আমরা রিনির স্কুল ঘরটিতে আশ্রয় পেয়েছিলাম। এবারে তা পাওয়া গেল না, কারণ, সেটি এখন সিমেণ্টের গুদাম হয়েছে, স্কুল বাড়িটি শীঘ্রই পাকা হবে তারই আয়োজন। মনটা একেবারেভেঙে গেল। রিনির এই স্কুল ঘরটির সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদীনের আত্মীয়তা। এই পথে এর আগের তিনটি অভিযানেই এই রিনিতে পৌঁছে আমাদের একটি করে বড়ো

মাপের সমস্তার মোকাবিলা করতে হয়েছে। প্রত্যেকবারই প্রায় অভিযান পরিত্যক্ত হবার মতো অবস্থা হয়েছে। রিনির এই স্কুল ঘরটিতে আমাদের অনেকগুলি বিনিদ্র রাত কেটেছে। তারপর প্রতিবারই সুন্দর এক একটি প্রভাতে রিনির এই স্কুল ঘর থেকেই আবার আমাদের আনন্দ অভিযান সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আমাদের অনেক সুখ-দুঃখের সঙ্গী সেই স্কুল ঘরটি এবারে যেন আমাদের চিনতেই পারল না,—লজ্জায়, অপমানে মুখ ঘুরিয়ে রইল। এর আগে প্রত্যেকবার— আমাদের আনন্দে ও বিষাদে—ধৌলী ঋষির সঙ্গম থেকে অবিরত সময়োচিত সঙ্গীত ভেসে এসেছে, কখনো এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি। মোটরযানের কর্কশ আওয়াজ অতিক্রম করে এবারেও সেই সঙ্গীতের টুকরো-টাকরা কানে আসছিল— বড্ডোই ক্ষীণ এবং খণ্ডিত, অর্থহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক। রিনি নামে স্থানটি এখনো আছে—পেট্রোলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে বেশ দাপটের সঙ্গেই আছে—কিন্তু পুরানো রিনিকে সেখানে খুঁজতে যাওয়া মানে যেচে অপমানিত হওয়া।

রিনিতে এসেও বহিরাগতের মতো সেই রাতটা একটু অস্বস্তিতে কাটল—একটা অন্ধকূপ সদৃশ কুঠরির মধ্যে। সমস্ত রাত মনে হোল যেন পুরো হিমালয়টা— সুবিশাল এক প্রস্তর পিণ্ড—বুকের উপর চেপে আছে। হিমালয়ে আবার পাঁচশ বছরের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা—যাকে সজীব জেনে এতকাল এতো যত্নে লালন করেছি—এখন দেখা যাচ্ছে সেসব একটা বোঝামাত্র। কিন্তু অলীক কল্পনার কঙ্কালটা অলীক হয় না। তবে গলদঘর্ম রাত্রিরও শেষ আছে।

রিনির প্রভাতেও এখন একটা ক্লান্তির ছাপ—প্রভাতটা যেন আরেকটু পরে এলে হোত। প্রাতঃরাশের পর্ব শেষ হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল শিবিরের পথে পদ যাত্রা শুরু হবে। বিরক্তি ও হতাশার সঙ্গে ততক্ষণে ভয় মানে ভীতিও এসে প্রবলভাবে সাঁকো নাড়তে শুরু করেছে। এই বয়সে এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে এই দুর্গম ও বিপজ্জনক পথে আসা কী সমীচীন হয়েছে? যে অরূপরতনের আশায় এমন পাগলামীতে মেতে ওঠা সেটি যে পাওয়া যাবে না তা তো জানাই হয়ে গেছে তাহলে এই অহেতুক ঝুঁকি নেবার সার্থকতা কি? সবই জানি, সবই বুঝি— কিন্তু তবু ফিরে আসবার কথা একবারও মনে হয় না। মনে হয় দেখাই যাক না, যতটুকু এগোন যায়।

আইস আক্স বাগিয়ে রিনির মোটর রাস্তার উপর বাঘু পর্বতারোহীর আদলে নাট্যভঙ্গী করছি, এমন সময় নিকটবর্তী মালবাহকদের জটলা থেকে একটা লোক পৃথক হয়ে বেরিয়ে এল। তৎক্ষণাৎ বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে আমরা দু'জন নিঃশব্দে

হাসতে শুরু করলাম। শরীরের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে একটা বিরাট আস্বাদ বয়ে গেল। আমাদের সেই গোরা সিং বিনা খবরেই আবার ঠিক এসে পৌঁছেছে, তাহলে হিমালয়েও হয়তো একেবারে সবকিছুই হারিয়ে যায়নি।

আমাদের প্রথম নন্দাঘুন্টি অভিযানে এই গোরা সিং পথের মাঝে হঠাৎ করে জুটে গিয়েছিল। সামনেই, মানে মাইল তিনেক খাড়া চড়াই ভেঙে, পারেং গ্রামের বাসিন্দা। মোটেই চালাক-চতুর নয়, দশটা কথা বললে একটা কথা বোঝে, কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে। যত বোঝা দাও, যত ঝুঁকি নিতে বলো—গোরা সিং অম্লান বদনে রাজি। সেই গোরা সিং সেই রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে আবার হাজির—হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, হিমালয় নিদারুণ রসিকও বটে।

এরপর ঋষি খাদের—বিপজ্জনক অরণ্য অতিক্রম করবার সময় বারম্বার নিজেকে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার দিয়েছি—এমন শরীর নিয়ে কেউ এই পথে আসে? এবং নিজের ভবিতব্যের বাপান্ত করেছি। কিন্তু গোরা সিং সবসময় কাছাকাছি থেকেছে—নিজের খুশীতেই, পথের অধিকতর বিপজ্জনক জায়গাগুলোতে আমাদের চলার উপর সতর্ক ও সমবেদনাপূর্ণ নজর রেখেছে। গোরা সিং আগে যেন এতটা হুঁশিয়ার ছিল না। একাধিকবার বিপজ্জনক জায়গা পেরিয়ে এসে নিজেই অবাক হয়ে গেছি—এ কেমন করে সম্ভব হল? ভাবাবেগ জিনিসটাকে আমি চিরদিন সন্দেহের চোখে দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এ যাত্রায় সশরীরে একটার পর একটা অসম্ভব কাণ্ড করে হিমালয়ের উপর আমার শ্রদ্ধা এবং আস্থা অনেক বেড়ে গেল। হিমালয় আজও অসম্ভবকে সম্ভব করতে জানে।

বহুমুখী আক্রমণে হিমালয় আজ বিপর্যস্ত এবং ক্ষত-বিক্ষত, ক্ষতের প্রসারও ঘটেছে অনেক গভীর পর্যন্ত। এই ক্ষত আরও কতোটা ছড়াবে, কতোদিন স্থায়ী হবে, তা কেউ জানে না। হরিদ্বার থেকে শুরু করে রিনি পর্যন্ত বারম্বার মনে হয়েছে যে হিমালয়ের অস্তিত্বটাই বুঝি বিপন্ন। আধুনিক যুগের বর্বর আক্রমণে হিমালয়ের বহুযুগসঞ্চিত সব ঐশ্বর্যই বুঝি নয়-ছয় হয়ে গেল। ভারতবর্ষের যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় তার সবকিছুরই উৎস ও আশ্রয় এই হিমালয়। সেই হিমালয়ের এমন বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও কত উদ্বেগ, কত আশংকা! কিন্তু ঋষি অরণ্যের গভীরে একটা ঝর্ণা ধারার পাশে বসে বিশ্রাম করতে করতে ওইসব উদ্বেগ ও আশংকা কেমন যেন অবাস্তব মনে হতে লাগল। এ যেন বন্ধু মারা গেছে শুনে তার বাড়িতে সমবেদনা জানাতে গিয়ে বন্ধুর দ্বারাই আপ্যায়িত

হওয়া। তবে কিনা হিমালয়ে অপ্রতিভ হবার কোন সুযোগ নেই। পুরো ব্যাপারটিকেই হিমালয়-সদৃশ কৌতুক বলে মনে হল। হিমালয় চিরদিনই কৌতুকপ্রিয়।

এরপর ঋষি গঙ্গার উজান পথে যতই অগ্রসর হই হিমালয়ের ততই আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে—চেনা-অচেনা, জানা-অজানা, চির-পুরাতন, চির-নূতন সেই এক হিমালয়। এ পথ আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়, কুড়ি বছর আগে এই পথ ধরেই আমরা নন্দাঘুন্টি থেকে ফিরেছিলাম। কিন্তু সেকথা সবসময় স্মরণ রাখতে পারছিলাম না। সেই পথ কি এমনি দুর্গম, এমনি ভয়াবহ এবং এমনই উদার ও সুন্দর ছিল? আসল কথা, হিমালয়ে পূর্বানুবৃত্তির কোন অবকাশই নেই। হিমালয়ের সঙ্গে যতবার দেখা হয় ততবারই প্রথমবার দেখা হবার মতো। হিমালয়ে পুরাতন কখনোই মুছে যায় না, কিন্তু প্রতিবার নতুন করে অভিসিক্ত হয়। অদূরে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকালে স্পষ্ট প্রত্যয় হয় যে, হিমালয় আজও নতুন নতুন ব্যাস-বাল্মিকী কালিদাসের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

আধুনিক যুগের ঠুনকো কোলাহলে ত্র্যম্বকের যুগ-যুগ সঞ্চিত অট্টহাসি চাপা পড়তে পারে না।

পর্বতারোহণের সূত্রপাত

কথাটা শুনে অনেকেই হয়তো একটু চমকে উঠবেন, অনেকে হয়তো এটাকেও একটা শতবার্ষিকী-স্পেশাল প্রশস্তি বলে ধরে নিয়ে আড়ালে বাঁকা হাসবেন—কিন্তু এ কথা সর্বাংশে সত্য যে এদেশে পর্বতারোহণ উদ্যোগের প্রথম এবং প্রধান উদ্যোক্তা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কথাটা।

অনেকেই জানেন না, অনেকেই ভুলে গেছেন বা ভুলে আছেন, সেজন্যই কথাটা একটু জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন। এইটে একটু বিস্ময়কর। পর্বতারোহণ বিষয়ে যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসাহ আছে তাঁরা সাধারণভাবে সচ্ছল ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোক—হিমালয়ের প্রেমে যাঁরা পড়ে, তাঁরা জেনে-শুনেই পড়েন। ফুটবলের ক-টুকুও জানা নেই অথচ তিন দিন ধরে রোদ বৃষ্টি আর পুলিশের লাঠি উপেক্ষা করে একখানা টিকিটের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী আছে—কলকাতায় এমন একজন ফুটবলপ্রেমী খুঁজে বের করা খুব শক্ত নয়। কিন্তু হিমালয় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকলে হিমালয়ের প্রেমে পড়বার কোনো উপায় নেই। হিমালয় না হোক, অন্তত হিমালয়ে পর্বতারোহণ সম্পর্কে একটু বোধগম্য ধারণা প্রত্যেক পর্বতারোহীরই থাকা প্রয়োজন, ধরে নেওয়া যায়—আছে।

কিঞ্চিদধিক কুড়ি বছর এই লাইনে আছি। বিভিন্ন প্রদেশের নবীন-প্রবীণ, সামরিক-বেসামরিক, কৃত-অকৃতী নানারকম পর্বতারোহীর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটেছে। হিমালয়ে পর্বতারোহণ সম্পর্কে কেউ হয়তো একটু বেশী জানেন, কেউ একটু কম। দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটুট্যট প্রতিষ্ঠা দ্বারাই যে এদেশে পর্বতারোহণের সূচনা হয় সেকথা প্রায় সবাই জানে, যদিও সেটি কবে কোন বছর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে সম্পর্কে সবাই সুনিশ্চিত নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে এরা সকলেই একবাক্যে একমত—সেটি হোল এদেশে পর্বতারোহণের প্রবর্তক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

বিধানচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই ঘটনাটি ঘটতে শুরু করে। সেটা এমন একটা সময় যখন ভালো-মন্দ সবকিছুইরই সুনাম-বদনাম জওহরলালের উপর বর্তাত। এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন জওহরলাল, কাশ্মীর সমস্যাও সৃষ্টি করেছেন জওহরলাল। যখন সব কিছুরই কৃতিত্ব-অকৃতিত্ব জওহরলালের উপর আরোপিত হোত, তখন

পর্বতারোহণের প্রবর্তক হিসেবেও তাঁরই নাম কীর্তিত হবে—সেটাই স্বাভাবিক। অন্য যুক্তিও আছে। আজীবন রাজনীতির পঙ্কে নিমজ্জিত থেকেও জওহরলাল যে হিমালয়কে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, তার অনেক সাক্ষী-সবুদ আছে। তাছাড়া দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনস্টিট্যুটের উদ্বোধন করেছেন জওহরলাল, প্রথম চেয়ারম্যানও তিনিই।

হিমালয় সম্পর্কে জওহরলালের উৎসাহ যে কতোটা অকৃত্রিম ছিল আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করবার লোভ সামলাতে পারছি না। ১৯৬০ সনে আমরা সেবার নন্দাঘুন্টি জয় করে কলকাতায় ফেরার পথে দিল্লি গেছি। নন্দাঘুন্টি নিয়ে সেবারে খুব হই হই হয়েছিল। দিল্লিতেও আমরা দারুণ খাতির পেয়েছিলাম। পৌর সংবর্ধনা ইত্যাদি তো ছিলই, এমনকি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন এঁরাও আমাদের বাড়িতে ডেকে চা খাইয়েছেন। পণ্ডিত নেহেরু এমনিতেই খুব ব্যস্ত মানুষ তার উপর চীনে-হামলার মেঘও তখন আকাশে জমতে শুরু করছে। কিন্তু আনন্দবাজারের অশ্বিনী গুপ্ত মশায় কোন কাজ হাতে নিয়ে মাঝপথে ছেড়ে দিতে জানতেন না। পণ্ডিত নেহেরু শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন—কিন্তু ঠিক পনেরো মিনিট, তার এক সেকেণ্ডও বেশি নয়।

পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়ার ব্যাপার ছিল। অভিযানের আগে তিনি নন্দাঘুন্টি অভিযানের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে খুব-সুস্পষ্টরূপে অনুরোধ করা হয়েছিল যেন নন্দাঘুন্টি অভিযান বন্ধ রাখা হয়। নামে অনুরোধ, আসলে আদেশ। চিঠিটা পেয়ে অশোকবাবু খুব বিচলিত হয়েছিলেন, তবে উল্টোমুখে অশোকবাবুর জেদ বজায় রেখে আমরা শেষ পর্যন্ত নন্দাঘুন্টি জয় করে নিরাপদে ফিরে এসেছি—এরপর পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করবার সময় স্পেশাল একটু চাপ দিতে পারলে তবে আমাদের মনের ঝাল মিটবে।

নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত নেহরু ত্রস্ত কিন্তু হাল্কা পায়ে ক্যাবিনেট রুমে এসে পৌছলেন। হাবভাবে তখনও সকালবেলার সজীবতা। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, 'তোমরা ঝুঁকি নিয়েছ, তোমরা সফল হয়েছো—এরপরে আর তোমাদের যোগ্যতা নিয়ে কেউ কোনরকম প্রশ্ন তোলবার সুযোগ পাবে না।' তারপরে জওহরলাল সেবার ঝাড়া পয়তাল্লিশ মিনিট ধরে হিমালয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করলেন। পরে শুনেছি, এজন্য বিদেশী কোন রাষ্ট্রদূতকে পাক্কা

কুড়ি মিনিট বসে থাকতে হয়েছিল। হিমালয়ের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না থাকলে এমনটা ঘটতে পারতো না। হিমালয় সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলের মাত্রা ও গভীরতা দেখেও আমরা সেবারে একদম থ হয়ে গিয়েছিলাম।

সবকিছু জানা থাকা সত্ত্বেও এমন অভিজ্ঞতার পর অন্য সকলের মতো আমাদেরও কেমন যেন ধারণা হয়ে গেল যে, এদেশে পর্বতারোহণের প্রবর্তক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ডাক্তার বিধানচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন, এই পর্যন্ত। বিধানচন্দ্রের জীবদ্দশায় —তাঁর উপস্থিতিতেই—ঘটনাটি ঘটেছে। তিনি এনিয়ে কোন মনখারাপ করেছেন বলে জানা যায় না। সেই আমলের আলোকচিত্রগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, এ-ব্যাপারে তাঁর সস্মিত সম্মতি ছিল। এমনটাই চলতে থাকত, কিন্তু এ বছর খটকা লাগল একটা কারণে।

এবছর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম শতবর্ষ। এই উপলক্ষে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি বহুবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। বিধানচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ছিল সুবিস্তৃত—তার সবদিকে সমানভাবে আলোকপাত করবার ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব নয়। অতএব নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচী থেকে পর্বতারোহণের ব্যাপারটা প্রায় বাদ পড়ে যাওয়ায় আমরা একটু ব্যথিত হয়েছি, কিন্তু বিস্মিত হইনি। এসব ক্ষেত্রে লোকহিতকর কীর্তিগুলিই বেশি প্রাধান্য পায় এবং সেটাই স্বাভাবিক।

আমাদের চটকা ভাঙল যখন দেখলাম দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনস্টিট্যুটের তরফ থেকেও এ-ব্যাপারে কোন খবর নেই। জন্মশতবর্ষের বেশ কয়েকটি সপ্তাহ কেটে গেছে—ইনস্টিট্যুটের কোনরকম অনুষ্ঠান করবার পরিকল্পনা থাকলে তা নিশ্চয়ই এতদিনে জানা যেত। আরো হতবুদ্ধিকর এই যে, এই কলকাতা শহরের প্রায় অর্ধশত সংস্থা যারা প্রতি বছর পর্বতারোহণ করে থাকে—কিন্তু বিধানচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য তারা কেউ কিছু করছে বলে জানি না।

শতবার্ষিক উৎসবে একটা মালা কম পড়লে তা কারো নজরেই আসবে না,—আর বিধানচন্দ্র কোনদিন খ্যাতি-অখ্যাতির পরোয়া করে চলেছেন এমন দুর্নাম তাঁর শত্রুরাও কখনো দেননি। এতে ক্ষতি কেবল এদেশের পর্বতারোহীদের আর এদেশের পর্বতারোহণের। পর্বতে ও পর্বতারোহণে অকৃতজ্ঞতার কোন কথা নেই। বিধানচন্দ্রের কাছে এদেশের পর্বতারোহণ এবং এদেশের পর্বতারোহীরা যে কী গভীরভাবে ঋণী এ-বছর সশ্রদ্ধচিত্তে সে কথা স্মরণ না করলে তার ফলাফল অশুভ হবে—পর্বত, পর্বতারোহণ ও পর্বতারোহী তিনের ক্ষেত্রেই।

বিধানচন্দ্রের চিন্তারাজ্যে যে পাহাড়ের কোন স্থান আছে—অবসর বিনোদনের আবশ্যকতা ছাড়া—বাইরে থেকে বহুদিন পর্যন্ত তার কোন আঁচ পাওয়া যায়নি। বিধানচন্দ্র ও জওহরলালে এখানে মস্ত পার্থক্য। বিধানচন্দ্র ছিলেন একটু ভিন্ন ধাঁচের কবি। সেটা ধরা পড়ল ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে জুরিখে।

বিধানচন্দ্র সেবছর জুরিখ গিয়েছিলেন চক্ষু চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালে আছেন, মনটা উদ্বেগমুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসক হিসেবে বিধানচন্দ্রও সেই পরামর্শই দিতেন। কিন্তু পাগল আর প্রতিভাবানকে সামলাবে কে! তার মাত্রই মাসখানেক আগে রানীর অভিষেক উপলক্ষ্য করে ব্রিটিশরা এভারেস্টের উপরে উঠে পড়েছে। যদিও ব্রিটেনের খাস তালুকের কেউ উঠতে পারেনি—একজন জ্ঞাতিভাই নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড হিলারী, আর একজন ভূতপূর্ব প্রজা ভারতের টেনজিং নোরগে—তবুও তাই নিয়েই সেকি উল্লাস উদ্দীপনা।

ভারতের হিমালয়ে একজন ভারতীয়—কেবল ভারতীয় নয়, একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী—ব্রিটিশের জয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়ে এল বলে তাঁর জাতীয়তাবোধ দারুণ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এমন কোন খবর নেই। সেই মর্মে তিনি কাউকে কিছু লেখেনওনি। কিন্তু ওই জুরিখের হাসপাতালে অর্ধশায়িত অবস্থায় তিনি যে কাজটি করলেন তা এককথায়—ভারতে পর্বতারোহণ উদ্যোগের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

মনে রাখতে হবে যে ভারতের অবস্থা তখন একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একজন ভারতীয় নাগরিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পর্বতারোহী, অথচ ভারতে পর্বতারোহনের কোন নামগন্ধই নেই। মেডেল পাওয়া গেছে, কিন্তু সেটি ঝোলানো হবে এমন জামিজ কোথায়? অন্য কেউ হলে এ-অবস্থায় কি করতেন বলা যায় না—অচিরেই এ-অভাব পূর্ণ করা হবে বলে হয়তো একটা ভাষণ দিয়ে দিতেন—কিন্তু বিধানচন্দ্র নিঃশব্দে দর্জি ডেকে পাঠালেন। ভাগ্যক্রমে টেনজিং নোরগেও সেই সময় জুরিখে উপস্থিত ছিলেন।

টেনজিং নোরগে জুরিখ গিয়েছিলেন সুইস ফাউনডেশন ফর অ্যালপাইন রিসার্চ-এর নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। বিধাচন্দ্রের অনুরোধে সুইস ফাউনডেশনের কর্মকর্তারা হাসপাতালে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ওই হাসপাতালে বসেই ভারতে একটি পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার বিষয় নিয়ে প্রথম সবিশদ আলোচনা হয়। সুইস ফাউনডেশনের প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে সকলরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। সহযোগিতাকে কেমন করে ধাপে ধাপে কাজে লাগাতে হয় বিধানচন্দ্র তা জানতেন। তিনি ওঁদেরকে একটা রিপোর্ট তৈরী

করতে বলেন। রিপোর্টটা তৈরী করবার সময় মনে রাখতে হবে যে, ভারতে এখন পর্বতারোহণের কোন অস্তিত্ব নেই। একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের শেকড় যেন দৃঢ় এবং গভীর হয় আর সম্ভাবনা যেন হিমালয়ের মতো উদার এবং উঁচু হয়।

সুইস ফাউনডেশন খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা নিখুঁত রিপোর্ট তৈরি করে ফেললেন। রিপোর্ট নয়, একেবারে বিশদ কার্যসূচী। এ-বিষয়ে যেন আগে থেকেই চিন্তা-ভাবনা করে রাখা হয়েছিল—সেটিই কাগজে টাইপ হয়ে একটি সুউচ্চ উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল—সেদিন তারিখ ছিল ২৮ শে জুলাই ১৯৫৩, এভারেস্ট শৃঙ্গজয়ের ঠিক দুই মাসের মাথায়।

বিধানচন্দ্র এতে কতটা উৎসাহিত হয়েছিলেন আজ আর তা জানবার কোন উপায় নেই, তবে রিপোর্টের শুরুতেই বলা হয় যে, ভারতবর্ষে একটি পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হলে তার একমাত্র উপযুক্ত স্থান পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং। দার্জিলিং-এর অন্য সবকিছু তো আছেই, কিন্তু সব চাইতে বড়ো সম্পদ তুং সুং বস্তির শেরপা। এই শেরপাদের কাজে লাগিয়েই ইউরোপীয়রা হিমালয়-অভিযান করতে শিখেছে, এই শেরপাদের উৎসাহিত করে তুলতে পারলে ভারতবর্ষের পর্বতারোহণ আপনা থেকেই সতেজ হয়ে উঠবে।

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে স্থির হয়—১. সুইস মাউনটেনীয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ আর্নল্ড গ্ল্যাটহার্ড নিজে দার্জিলিং-এ এসে দেখে-শুনে শিক্ষা-কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করবেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণীর কোন অংশে শিক্ষা-কেন্দ্র করলে সবরকম 'সুযোগ'-পাওয়া যাবে সে-বিষয়েও তিনি পরামর্শ দেবেন। ২. পর্বতারোহণের আধুনিক কায়দা-কানুনগুলি রপ্ত করবার জন্য অল্প-কয়েকজন শেরপাকে সুইজারল্যাণ্ডে এসে অল্প-কয়েকদিনের ট্রেনিং নিতে হবে। এই শেরপারাই হবে ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ সংস্থার ফিলড্-ইনসট্রাকটর। সুইস ফাউণ্ডেশন এই শেরপাদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়েও ৩. সুইস ফাউণ্ডেশন ফর অ্যাল পাইন রিসার্চ ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পরামর্শ দেবে ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি নির্বাচন করে দেবে।

বিধানচন্দ্র ইঞ্জিনীয়ার হতে হতে ডাক্তার হয়েছিলেন—একথা সকলেরই জানা আছে। ডাক্তার হিসেবে তিনি প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। ইঞ্জিনীয়ার হলেও যে তিনি প্রচুর সুনামের অধিকারী হতেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ

নেই। ভারতবর্ষে একটি পর্বতারোহণ সংস্থা গড়ে তুলতে হলে যাবতীয় যা-কিছু প্রয়োজন তার একটি নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট তিনি সুইজারল্যাণ্ডে রোগশয্যায় শুয়েই তৈরী করে ফেললেন। কেবল প্রতিষ্ঠানের রূপটি কল্পনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, সেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্য যে কাঠ-খড়-মাটি-রং প্রয়োজন হবে তারও ব্যবস্থা করলেন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ-বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের আগে থেকে কোনরকম সলা-পরামর্শ হয়েছিল কিনা। প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক। কেননা একটা বিদেশী সংস্থার সঙ্গে কাজ-কারবার করতে হলে কেন্দ্রের বিদেশ মন্ত্রকের অনুমতি আবশ্যক হয়। এক্ষেত্রে আবার বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্নও আছে।

তা ছাড়া জওহরলাল হিমালয়কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। ব্রিটিশদের উদ্যোগে হঠাৎ একজন ভারতীয় যখন হিমালয়ের সর্বোচ্চশিখর এভারেস্টের উপর উঠে পড়ল, তখন একদিকে যেমন তিনি আনন্দিত ও গর্বিত হয়েছেন তেমনি আরেকদিকে তাঁর কিছুটা অনুতাপও হয়ে থাকবে। ভারতবর্ষে পর্বতারোহণের কোন ব্যবস্থাই নেই—এই অভাবটা স্পর্শকাতর জওহরলালকে নিশ্চয়ই তীব্রভাবে পীড়িত করে থাকবে। সাংবিধানিক অধিকার ও ব্যক্তিগত আগ্রহ—সবদিক বিচার করে দেখলে এমন মনে হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত যে বিধানচন্দ্র রায় সুইজারল্যাণ্ড যাবার আগে জওহরলাল হয়তো এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সলা-পরামর্শ করেছেন। জওহরলালের অনুমোদন না থাকলে বিধানচন্দ্র কি এই ব্যাপারে একটা বিদেশী সংস্থার সঙ্গে এমন পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে ভরসা পেতেন।

সবদিক বিচার করে দেখে আমরা প্রায় সুনিশ্চিত যে সুইজারল্যাণ্ড যাবার আগে এ-বিষয়ে বিধানচন্দ্রের সঙ্গে জওহরলালের তেমন কোন সলা-পরামর্শ হয়নি। ভাসা-ভাসা কথা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বিধানচন্দ্রের উপর দায়িত্ব অর্পণের মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি; না ঘটবার অনেক কারণ আছে।

প্রথমত সময়ের অভাব এভারেস্ট শীর্ষে মানুষ প্রথম আরোহণ করলেন ২৯ মে, আর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আরোস্যাতে বিশ্রামগ্রহণের সময় বিধানচন্দ্র সুইস ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একযোগে পর্বতারোহণের শিক্ষা নিয়ে চুক্তিপত্র তৈরি করেছেন। মাঝখানে কেটেছে এক মাসেরও অল্প দিন। সেই সময়টায় বিধানচন্দ্র বিশেষ অসুস্থ ছিলেন, শ্রীঘ্রই চিকিৎসার

জন্ত ইওরোপ যাবেন। পশ্চিমবঙ্গও তখন একেবারে সমস্যামুক্ত রাজ্য নয়। এমন অবস্থায় জওহরলাল বিধানচন্দ্রের উপর এদেশে পর্বতারোহণ বিষয়ে সবকিছু পাকাপাকি করে আসবার দায়িত্ব অর্পণ করছেন—এমন সম্ভাবনার কথা ভাবলেও হাস্যোদ্রেক হয়।

তা ছাড়া এই অল্প সময়ের মধ্যে জওহরলাল পর্বতারোহণের মতো একটা বিষয়ে সবিশেষ মনঃস্থির করে ফেলেছেন—এটা ঠিক বিশ্বাস হয় না। জওহরলাল ছিলেন একটু দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ—অনেকটা হ্যামলেটের মতো। এমন প্রকৃতির একজন মানুষ যে রাষ্ট্রনীতিতে অতটা সফল হলেন কেমন করে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা তার মীমাংসা করবেন। তবে একথা ঠিক যে খুলতর কোন জরুরী তাগিদ না থাকলে, কোন একটা বিষয়ে সুস্পষ্টরূপে মতিস্থির করতে জওহরলালের অনেক সময় লাগত—শিল্পীদের যেমন লেগে থাকে। পর্বতারোহণের মতো মোহময়ী একটি আইডিয়া মাথায় ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি একটি পর্বতারোহণ শিক্ষাসংস্থার বাস্তবরূপ গ্রহণ করল—সেটা কিছুতেই জওহরলালের চরিত্রানুগ হয় না। তদুপরি বিধানচন্দ্র তখন অসুস্থ, এবং শ্রদ্ধেয় ও নির্ভরযোগ্য অগ্রজ-প্রতিমের স্বাস্থ্যের জন্তও জওহরলাল তখন নিশ্চয়ই খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন আর সেই সঙ্গে পর্বতারোহণের জটিল ব্যাপারটার একটু সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে আসবেন। এমন মনোভাব একেবারে সম্ভব না সেকথা হয়তো আর আজ বলা চলে না—কিন্তু জওহরলাল অমন স্থূল মনোবৃত্তির লোক ছিলেন না। এই অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের যদি দেখা হয়েও থাকে, তবে তখন আর যা নিয়েই সলা-পরামর্শ হয়ে থাকুক—পর্বতারোহণের মতো একটা দূরাগত বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই পাকাপাকি কোন কথা হয়নি।

আমাদের ইতিহাসচেতনা আগে যেমন বিচক্ষণ ছিল এখনও প্রায় তেমনই রয়েছে—রটনা ও ঘটনার মধ্যে চুলচেরা বিচার করতে বসা আমাদের স্বভাবে আসে না, গোড়া থেকেই আমরা কেমন করে যেন ধরে নিয়েছি যে, এদেশে পর্বতারোহণের প্রবর্তনা করেন জওহরলাল। বিধানচন্দ্র হয়তো সঙ্গে ছিলেন, সহায়তা করেছেন, কিন্তু এর প্রবর্তক একজনই—জওহরলাল।

এবারে প্রশ্ন উঠতে পারে বিধানচন্দ্র হঠাৎ করে এতদূরে অগ্রণী হলেন কী কারণে? এইটে ঘটেছিল নিতান্তই আকস্মিকভাবে। বিধানচন্দ্র যখন সুইৎজার-ল্যান্ডে স্বাস্থ্যোদ্ধার বিশ্রামগ্রহণ করছেন, ঠিক তখনই কোনরকম আগাম খবর ছাড়াই—সেখানে হঠাৎ করে একদিন টেনজিং নোরকে উপস্থিত হলেন। টেনজিং

গিয়েছিলেন সুইস ফাউণ্ডেশনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। জুরিখ হলো একাধারে সুবিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ও পর্বতারোহণের পীঠস্থান। স্থান-কাল-পাত্রের এমন সুসমঞ্জস সমাবেশ সচরাচর ঘটে না, ঘটলে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রেই ঘটে। জুরিখের মতো জায়গায় বিধানচন্দ্রের সঙ্গে টেনজিং-এর সেই যোগাযোগ ভারতীয় পর্বতারোহণ ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মাথায় কোন একটি আইডিয়া এসে গেলে সেটি নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে বসা বিধানচন্দ্রের স্বভাব ছিল না। তাঁর মাথায় আইডিয়া অবিলম্বেই একটা সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করত এবং সেটিকে কেমন করে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় তা-নিয়েও চেষ্টা শুরু হয়ে যেত। দুর্গাপুর, সলট লেক, কল্যাণী, স্টেট ট্রান্সপোর্ট—এই সবকিছুই সেই একই ক্ষেত্রের ফসল।

একটা জিনিস এখনো মাঝে-মধ্যে ঘটে থাকে—সত্যকারের বড়ো ও মহৎ কোন কাজে হাত দিলে চারপাশ থেকে এমন সব লোকেরা এসে জড়ো হন যাঁরা অনেকদিন ধরেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই উদ্যোগের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সুইস ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে কথাবার্তা পাকাপাকি করে বিধানচন্দ্র দেশে ফিরে আসবার পরই কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। সংস্থার নাম রাখা হল দার্জিলিং হিমালয়ান মাউনটেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট। সংস্থার সভাপতি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, সহ-সভাপতি হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, মেজর নন্দু জয়াল হলেন অধ্যক্ষ, টেনজিং হলেন ডিরেক্টর অব ফীল্ড ট্রেনিং আর মণীন্দ্রনাথ সেন হলেন কিউরেটর। আং থারকে, গ্যালজেন, নামগিয়াল, ওয়াদিং প্রভৃতি শেরপা-শার্দুলদের নিয়ে গঠিত হলো সংস্থার প্রথম ইনস্ট্রাক্টর বাহিনী। এদেশের অন্য কোন উদ্যোগ উপলক্ষ্য করে এমন সুনির্বাচিত গ্রহ-সমাবেশ ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই।

ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ সংস্থার গঠন-পদ্ধতিটি ছিল খুবই সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত। আশু প্রয়োজনগুলোকে উপেক্ষা করা হয়নি, কিন্তু দৃষ্টি রাখা হয়েছে সুদূর অনন্তের দিকে। এই গঠন-প্রণালীর প্রস্তাবনায় যে অনেক দূর পর্যন্ত বিধান-চন্দ্রের হাত ছিল তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য আছে। সংস্থার অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করবে পশ্চিমবঙ্গ সংস্থার সহ-সভাপতি পদটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা সংস্থার কার্যসমিতির স্থায়ী সদস্য হবেন এবং এই ব্যাপারে যাবতীয় দায়দায়িত্ব রাজ্যের শিক্ষা-দপ্তরের উপরই বর্তাবে। পর্বতারোহণ ব্যাপারটা যে আসলে শিক্ষারই অঙ্গ সেই কথাটি সেই আমলে কোন আমলার জানা ছিল বলে হয় না।

তার প্রমাণও অচিরেই পাওয়া গেল। দ্বিতীয় ডাকে পর্বতারোহণের বৃত্তি বাক্সো সামলাবার বরাত পড়ল প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপর। এইখানেই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হলো। এরপর কালক্রমে ফল ধরবে।

কিন্তু সেই বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠবার আগেই, সেই অল্পকালের মধ্যে, সমবেত উদ্যোক্তারা এমন সব কাণ্ড-কারখানা করলেন যার কথা আজও মুগ্ধ চিত্তে ভাবতে হয়। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ মাত্রই এ-কয়টি বছরের মধ্যে বন্ধু জয়ালের উদার নেতৃত্ব, তেনজিং ও অন্যান্য শেরপাদের সুনিপুণ প্রাণশক্তি, মণীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞ-অনুপ্রেরণা এবং সবার উপরে বিধানচন্দ্রের সুবিস্তৃত ছত্রচ্ছায়া এমন সব কাণ্ড ঘটালো যা পর্বতারোহণের ইতিহাসে চিরবিস্ময় হয়ে থাকবে।

স্থান নির্বাচনের পর ইনস্টিটিউটের ঘরবাড়ি উঠতে সময় লাগবে। কিন্তু উপকরণ নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না—সাময়িক আস্তানা পড়ল রায়-ভিলায়। রায়-ভিলাতেই কোর্স চালু করে দেওয়া হলো, কোর্স শব্দটির তখন ভিন্ন-রকম দ্যোতনা ছিল। যাকে বলে পর্বতারোহণে দীক্ষা। কোর্স চালাবার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপরই ন্যস্ত হলো। ১৯৫৬-৫৭-৫৮ এই তিন বছরে জয়ালের নেতৃত্বে তিনটি বড়ো মাপের হিমালয় অভিযান সংগঠিত হয়—কামেট, সাসের-কাংড়ি ও নন্দাদেবী পর্বতে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নিয়েই দল গঠন করা হয়—তখনকার অ্যাডভান্সড কোর্সে শিক্ষাক্রম ছিল একটি বড়ো মাপের হিমালয় অভিযানের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করা।

ওদিকে সুইস ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় ও মণীন্দ্রনাথ সেনের তত্ত্বাবধানে বার্চ হিলের উত্তর প্রান্তে মাউনটেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট অবয়ব ধারণ করতে থাকল। এই সময়ে যাঁরা পর্বতারোহণে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁরা খুব ভাগ্যবান। দার্জিলিঙের কার্পেট-মণ্ডিত অফিস ঘরে বসে সরকারী ফাইল চালাচালি করাটাকে জয়াল কোন গুরুত্বই দিতেন না। তিনি সর্বদা শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে থাকতেন—দার্জিলিঙে অথবা উচ্চতর পর্বতগাত্রে। কখনো কিছু বলে বোঝাবার চেষ্টা করতেন না, সব-কিছু করে দেখিয়ে দিতেন। জয়াল কেবল পাহাড়ে চড়তে শেখাতেন না, পাহাড়কে শ্রদ্ধা করতে শেখাতেন। জয়ালের মুগ্ধভক্ত নিমাই বসুর মতে—এরকম গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার জন্যই একসময়ে হিউয়েন-সাং-রা কষ্ট করে এদেশে আসতেন।

কিন্তু ১৯৫৮ সনেই মধুযামিনী শেষ হয়ে গেল। দিল্লীর প্রতিরক্ষা দপ্তরের আমলা-প্রধানদের তন্দ্রাভঙ্গে টনক নড়েছে। মাত্র চার বছরের মধ্যে যে-প্রতিষ্ঠান পর্বতারোহণে বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সৌটিকে তো আর হাফ-কেলাসিক বলে

উপেক্ষা করা চলে না। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হওয়া এখন একটা রীতিমত সম্মানের ব্যাপার—একজন মেজরকে হঠাবার জন্ত কর্নেল, ব্রিগেডিয়াররা এগিয়ে এলেন। পরাজয় এবং অপমান অনিবার্য জেনে মেজর নন্দু জয়াল ১৯৫৮ সনের চোইয়ু অভি-যানের সঙ্গে গিয়ে দেহরক্ষা করেন।

বিধানচন্দ্র তখন কী করছিলেন? এর উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত—কিছু না। পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও দম্ভভরে পরাজিত হতে এগিয়ে যাওয়া বীরত্বপূর্ণ হতে পারে কিন্তু সেই বীরত্বও অর্থহীন—তার চাইতেও বেশি অনর্থকর। বিদেশ এবং অর্থ মন্ত্রকের সাগ্রহ সহযোগিতা ছাড়া একা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এমন একটা ইনস্টিট্যুশন চালানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করলে যেটুকু গড়া হয়েছে সেটুকুও ভেঙে ফেলা হবে। তার চাইতে ঘটনা নিজের ধারায় ঘটতে থাকুক।

সেই ১৯৫৮ সনে চো-ইয়ু অভিযানে যাবার পথে মেজর জয়াল চারদিনের জন্ত কলকাতায় থেমেছিলেন—যাবার আগে ব্যস্ত বিধানচন্দ্রকে সবকিছু বলে যাবেন। প্রাক্তন চেলা বিশ্বদেব বিশ্বাস এইসময় জয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সে এক দুঃখমধুর অভিজ্ঞতা। আচার্য জয়াল তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছেন, যে আগুন আগে দীপ্তি ছড়াত, এখন তা থেকে কেবল ধোঁয়া উঠছে।

বিধানচন্দ্র জয়ালের সব কথা শুনেছিলেন। তারপরে খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন—সরকারী অফিস ফাইল আটকে গেলে চলবে কি করে। আর একটি কথাও নয়, এমনকি 'দেখই না কি হয়' জাতীয় কোন সান্ত্বনাও নয়। উপচে পড়া দুধের জন্ত কাঁদতে বসা বা দোষারোপ করতে বসা বিধানচন্দ্রের ধাতে ছিল না। একটা স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে গেছে কিন্তু তখনো অনেক স্বপ্ন সফল করতে বাকি—ঝগড়া করবার মেজাজও নেই, সময়ও নেই।

কিন্তু পর্বতারোহণ সম্পর্কে বিধানচন্দ্রের উৎসাহ তখনই সম্পূর্ণরূপে ফাইল-চাপা পড়ে যায়নি সেটা বোঝা গেল তার দুবছর পরে, এদেশের সর্বপ্রথম বেসামরিক পর্বত অভিযান 'নন্দাঘুন্টি অভিযান' সংগঠিত হবার সময়। সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ হলে আজও গর্বে বুক ভরে ওঠে।

একথা সকলেরই জানা যে, নন্দাঘুন্টি অভিযান সংগঠিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে। কিন্তু অনেকেরই যা জানা নেই তা হলো, আনন্দ-বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার এই অভিযানের নিছক পৃষ্ঠ-পোষকমাত্র ছিলেন না। অভিযান সংগঠনের সময় যখনই কোন বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে তখনই তিনি প্রচুর ঝুঁকি নিয়েও অভিযাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমাদের নন্দাঘুন্টি অভিযানের প্রথম সমস্যা ছিল সাজ-সরঞ্জাম। এ ব্যাপারে ইন-স্টিটিউটের শরণ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, সেই সময়ই অশোকবাবু একদিন আমাদের বিধানচন্দ্রের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বিধানচন্দ্রের সেদিনও মহাকরণ থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল, রোজই বোধহয় দেরি হোত। স্বভাবতই ক্লান্ত ছিলেন। আমাদের দিকে বোধহয় ফিরেও তাকালেন না। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনলেন তারপর বললেন, তোমাদের কি-কি চাই তার একটা লিস্ট করে কাল সকাল দশটার মধ্যে আমার কাছে রাইটার্সে পাঠিয়ে দিও। ব্যস, অশোকবাবুকে নিয়ে বিধানচন্দ্র বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। আমরা বাঙালীর ছেলেরা এমন দুঃসাহসিক একটা কাজ করতে চলেছি সে-বিষয়ে কিছু না বলায় আমরা বিলক্ষণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তবে আমাদের তখন কাজ হাসিল হলেই হলো।

কিন্তু আমাদের কাজ হাসিল হয়নি। ইনস্টিটিউটের তৎসাময়িক কর্মকর্তারা বিধানচন্দ্রের চিঠিটা চেপে দেন এবং পরিবর্তে দিল্লী থেকে জওহরলালকে দিয়ে অশোকবাবুর কাছে অনুরোধ তথা নির্দেশ পাঠান অভিযান বন্ধ রাখবার জন্য। অশোকবাবুর প্ররোচনায় জওহরলালের সেই নির্দেশ আমরা লঙ্ঘন করেছিলাম। এই সবকিছুই নিশ্চয় বিধানচন্দ্রের গোচরীভূত ছিল—কিন্তু বিধানচন্দ্র কোন রা কাড়েননি। জওহরলাল যে কেন বিধানচন্দ্রের কাছে না লিখে অশোকবাবুর কাছে চিঠি লিখতে গেলেন সেটা আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। পর্বতারোহণের ব্যাপারে বিধানচন্দ্রকে বোধহয় তার আগে থেকেই বাইরের লোক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আমরা সরেজমিনে দেখে এসেছি। ইনস্টিটিউটের মধ্যে বিধানচন্দ্র তখন বেঁচেছিলেন এক তেনজিংয়ের কুয়াসাচ্ছন্ন শ্রদ্ধায় এবং মণীন্দ্রনাথের চাপা দীর্ঘশ্বাসে।

সে যাই হোক, আমরা তো নন্দাঘুন্টি অভিযান শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সফল করে ফিরে এলাম। জওহরলাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদারতায় আমাদের স্বাগত জানালেন। সেই সময় বিধানচন্দ্রও দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে গেলাম। গুরুগম্ভীর মানুষটিকে সেদিন আমরা প্রথম হাসতে দেখলাম। তিনি উঠে এসে আমাদের সঙ্গে জনে জনে করমর্দন করলেন না। হাসিমুখে কেবল আমাদের বসতে ইশারা করলেন। তারপরে বললেন, 'সবাই বলে বাঙালী পারে না, পারে না। কিন্তু বাঙালী পারল তো!' বাঙালী হিসেবে সেদিন আমরা সত্যকারের গর্ব অনুভব করেছিলাম।

এই লেখা এখানেই শেষ হওয়া উচিত, কিন্তু আরো দুটো কথা আছে। এবছর বিধানচন্দ্রের জন্ম শতবর্ষ। দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট এই

উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বলে শুনিনি—করলে নিশ্চয়ই কানে আসত। এই অবহেলায় বিধানচন্দ্র আদৌ মর্মাহত হতেন না, আমরাও একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলব না।

তাছাড়া এই কলকাতাতেই এখন গোটা পঞ্চাশেক পর্বতারোহণ সংস্থা সক্রিয় রয়েছে। এদের মধ্যে এ-ব্যাপারে কে-কি করবে বা আদৌ কেউ কিছু করবে কিনা জানি না। কেবল পর্বতাভিযাত্রী সংঘের সদস্যরা স্থির করেছে যে, আগামী বছর বর্ষার আগে তারা যখন কামেট অভিযান করতে যাবে তখন বিধানচন্দ্রের প্রতিকৃতি খোদাই করা একটা ধাতুর ফলক সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কামেট শীর্ষের যত কাছাকাছি সম্ভব সেই ফলকটিকে পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে আসবে। সেটাই হবে বিধানচন্দ্রের প্রতি পর্বত অভিযাত্রী সংঘের কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও শ্রদ্ধা নিবেদন—শতবার্ষিকীর প্রণাম।

গোড়ায় গলদ

এক কলকাতা থেকেই এখন বছরে চার-ছ'টা বড়ো মাপের পর্বত অভিযান সংগঠিত হয়। আরও অন্তত ডজন খানেক অভিযান হাওড়া স্টেশন থেকে 'হিমালয় কি জয়' বলে রওয়ানা হবার আগেই বিভিন্ন পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয়। এছাড়া কেবলমাত্র ম্যাপ ভরসা করে প্রতিবছর কত শত অভিযান যে 'সুসম্পন্ন' হয় তার তো কোন হিসেবই থাকতে পারে না। পর্বত-আরোহণের এই বিশাল বিপুল জন-প্রিয়তা দেখে বিশ্বাসই হবার কথা নয় যে, প্রয়াসটির বয়স এখন মাত্র আঠারো— ভোটাধিকার পেয়েছে কি পায়নি।

আর এই আটারোটি বছর একেবারে যাকে বলে কীর্তিতে ঠাসা। বাঙালী বেসামরিক পর্বতারোহীরাই পর্বত আরোহণ ব্যাপারটিকে এ দেশে প্রথম চালু করে—গৌরবের শুধু সেইখানে। তারপরে এরা ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশীর্ষ কমেট-এ আরোহণ করেছে। মানায় প্রথমবারে ব্যর্থ হয়ে, পরাভূত না হয়ে, দ্বিতীয়বার গিয়ে ফ্ল্যাগ উড়িয়ে এসেছে। কেবল খ্যাতনামা চাকচিক্যময় কয়েকটি পাহাড় নিয়েই এরা বুঁদ হয়ে থাকেনি। অনেক অল্প-পরিচিত হিমবাহে বারবার এদের তাঁবু পড়েছে। অনেক অখ্যাত, এমনকি নামহীন, পর্বতের গায়ে এরা আইস-অ্যাক্স্ ঠুকে এসেছে। কয়েকটি পর্বতের এরা নতুন নামকরণ করেছে। উদ্ধারকার্যেও এরা সমান চমকপ্রদ। ১৯৬৬ সনে মানা অভিযানের শিকট দুর্ঘটনার পর এদের তৎপরতা, মরিস হার্তসগের অন্নপূর্ণা অভিজ্ঞতাকেও অনেক ব্যাপারে অনেকদূর ছাড়িয়ে যায়। সব মিলিয়ে একেবারে চোখ ধাঁধানো কীর্তি-ফলক।

কিন্তু, চোখ-ধাঁধানো কীর্তিফলকের অপর দিকটা কদাচিৎ সমান চোখ ধাঁধানো হয় এবং স্বীকার করতে সংকোচ হয় যে, আমাদের পর্বতারোহীদের কীর্তি-ফলকের উল্টো দিকটাও বিলক্ষণ কুৎসিত। মানুষের যাবতীয় যত রিপু আছে এবং তাদের যতরকমের পারম্যুটেসন কম্বিনেসন হয়, তার সবকিছুই এখানে অত্যন্ত কদাকারভাবে উপস্থিত।

এক রেষারেষিই যে কত অজস্র রকমের হতে পারে, তা জানবার সবচাইতে সহজ উপায় একটি পর্বতারোহী ক্লাবের সদস্য হওয়া। একদিকে ক্লাবে ক্লাবে রেষারেষি। এক একটি ক্লাব যেন এক একটি যুদ্ধ-শিবির। অভিজ্ঞতার বিনিময়

তো নেই-ই, পারলে একে অপরের ক্ষতি করে দেয় স্বচ্ছন্দে। দিল্লী অথবা দার্জিলিঙে গিয়ে অজস্র ক্লাবের নামে কুৎসা রটনা করতে এদের উৎসাহের অন্ত থাকে না। বাইরে রেষারেষি করতে গেলে ভেতরেও রেষারেষি এসে যায়। কলকাতার প্রায় প্রতিটি পর্বতারোহী ক্লাবই—এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোরই মতো—আসলে বহুবচন। প্রত্যেকটি ক্লাবেই কয়েকটি করে গোষ্ঠী আছে। এদের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায় সময়ই তিক্ততায় ও তীব্রতায় বহির্দ্বন্দ্বকেও ছাড়িয়ে যায়। কে নেতা হবে, কে সহনেতা হবে কে কে দলভুক্ত হবে এইসব নিয়ে কলহ-কোলাহলেই অনেক অনেক অভিযান প্রস্তুতি আসারেই সমাধিস্থ হয়ে যায়। পাহাড়ে গেলেই মানুষের স্বভাব পাল্টায় না। অনেক সময় অভিযান চলাকালেও, পাহাড়ের বুকের উপর বসে, পুরোদমে রেষারেষি চলতেই থাকে। এই রেষারেষির পরিণাম সাধারণত সুদূর-প্রসারিত হয়। কচিৎ কখনো হাতে-নাতে দু-চারটে জীবনও দিতে হয়েছে। হিমালয়ের আইনে তুল্যমূল্য বিচারের পরে; আর কোন আপীলের অবকাশ নেই।

রেষারেষি ছাড়াও বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্রে অন্য যত রকমের 'গুণাবলী' হয় তার সব 'কটি এই কীর্তি-ফলকের পেছনদিকে স্ব-স্ব বীভৎসতায় বিদ্যমান। পরশ্রী-কাতরতা: বাবুরা মানায় উঠেছেন। বেস ক্যাম্পে বসে হুল্লোড় করতে করতে বাবুরা মানায় উঠেছেন! আত্মম্ভরিতা: আমি না থাকলে অভিযান হাওড়া স্টেশনেই ট্রেন ফেল করত। স্বার্থপরতা: নেতা নিজে চূড়ায় উঠবেন, অতএব ২২৫০০ ফিট উঁচু পঞ্চম শিবিরে পৌঁছবার পর দশ দিনের জন্য অভিযানের সব কাজকর্ম বন্ধ রাখা হল। মিথ্যাচার: বেশ কয়েকটি সাফল্যের দাবী স্পষ্টতই ভিত্তিহীন। এইসব ছাড়াও আরও কিছু হীনতা আছে যা মুখে আনতে সঙ্কোচ হয়। পাহাড় থেকে কলকাতায় ফিরে এসে অধিকাংশ অভিযাত্রী দলই কেন টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, এতসবের পর তা আর বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

আসল কথা, এই কীর্তি-ফলকের ফলকটিই নেই—গৌরবময় কীর্তির উজ্জ্বল পদকগুলো ঝুলছে জমাট-বাঁধা অপকীর্তির কালো-আবলুস গায়ে। বাঙালী কৌশলিক পর্বতারোহীরা অনেকগুলো কীর্তির অধিকারী হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পর্বতারোহণের একটা স্বকীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারেনি।

এই অপারগতার কারণগুলো খতিয়ে দেখবার আগে কবুল করা প্রয়োজন, পর্বতারোহণে ঐতিহ্য বলতে ঠিক কি বোঝায় তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে লেখা বড়ো সহজ কাজ নয়। পর্বতারোহণ ব্যাপারটিকে পর্বতারোহীরা ফুটবল, গল্ফ, এমনকি কি ক্রিকেটের চাইতেও একটু ভিন্ন ধরনের, একটু উঁচু জাতের খেলা বলে দাবী করে

থাকেন। ওরা বলে, ইট ইজ এ ওয়ে অব লাইফ; পূর্ণ জীবনের একটা উপায়। এই পথের নিজস্ব নিয়ম-কানুন আছে যা লঙ্ঘন করলে শাস্তি বিধানের কোন উপায় বা বিধি নেই। এই খেলায় কোন রেফারি থাকে না, খেলোয়াড়দের, রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই অভিযানের সাফল্য-অসাফল্য নিরূপিত হয়। মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে কিছু দিনের জন্য কিছুলোককে হয়তো বোকা বানানো যায়, কিন্তু তাতে পর্বতারোহণ ঐতিহ্যের স্থায়ী ক্ষতি হয়।

এই ঐতিহ্যটা আছে কি নেই বরং থাকলে কতটা দৃঢ়মূল তা বোঝবার নানা উপায় আছে। হিমালয়ের মতো একটা উদার-সুন্দর অভিজ্ঞতার পর পর্বতারোহণ আচার-আচরণে সেই উদারতা ও সেই সৌন্দর্যের কিছুটা প্রভাব পড়বেই। যদি তা না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে অভিজ্ঞতাটি ত্রুটিহীন হয়নি। একটু আগে দোষের যে সুদীর্ঘ তালিকা পেশ করা হয়েছে, প্রকৃত পর্বতারোহীর চরিত্রে তার কোনটাই থাকবার কথা নয়। পাহাড়টা আছে বলেই—বিকজ ইট ইজ দেয়ার —প্রকৃত পর্বতারোহীরা পাহাড়ে যায়। আমরা অধিকাংশ বাঙালীই পাহাড়ে যাই। ফিরে এসে একটা নাগরিক সম্বর্ধনা পাবার আশায়, নিদেন পক্ষে একটা চাকরি। আমাদের পরশ্রীকাতরতা, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, দলাদলি এইসবই প্রমাণ করে আমাদের দেশে পর্বতারোহণের ঐতিহ্যটা এখনো ঠিক দানা বাঁধেনি। আমরা বছরে চার-ছয়টি করে বড়ো মাপের অভিযান সংগঠন করি ঠিকই, কিন্তু আমরা অনেকেই এখনও পূর্ণাবয়ব পর্বতারোহী হয়ে উঠতে পারিনি। এর কারণ কি?

কারণ অনেক। সেগুলোর শাখা-প্রশাখাও অনেক। গোড়া থেকেই সব কিছু এমন জটিলভাবে জট পাকিয়ে আছে যে, সেগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে সনাক্ত করাই একটা গলদঘর্ম ব্যাপার। যে-সব ব্যাধি বাঙালীর পর্বতারোহণ প্রয়াসকে আজ প্রতিপদে ব্যাহত বিঘ্নিত করছে, তবে কয়েকটির বীজাণু একেবারে গোড়া থেকেই সজীব ছিল। কালক্রমে সেগুলোর বংশবিস্তার ঘটেছে।

১৯৬০ সনে নন্দাঘুন্টি অভিযান করে বাঙালীর পর্বতারোহণ শুরু হয়। এই অভিযানটির সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আমাদেরই প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পতাকাতলে এই অভিযানের কাজ শুরু হয়। নন্দাঘুন্টি অভিযান কলকাতা ছেড়ে রওয়ানা হবার আগেই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথম বিরোধটা বাধে অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিরোধের কারণ,

শেখকিশণ স্বমানা নামে এক মাড়ওয়ারী যুবক। অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে শেখকিশণ প্রাণপাত করে খেটেছিল। তবু ওকে আমরা বাদ দিই। দুটি কারণে : এক ও মাড়ওয়ারী। আর দুই, ও নিরামিষাশী। নন্দাঘুন্টি অভিযানের কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে—ভারতের সর্বপ্রথম বেসামরিক পর্বত অভিযান—চারিদিকে এমন হৈ হৈ পড়ে গেল যে, আমাদের তখনই অভিযান শুরু হবার বা সফল হবার অনেক আগেই মনে হল, এই গৌরবের সবটুকুই অধুনা-হৃতগৌরব বাঙালি যুবশক্তির খাতায় জমা পড়ুক। পড়ে থাকবে! অপরদিকে আমিষীয়ানা নিয়ে আমরা সেবার যে গোয়ার্তুমি করেছি তা যে-কোন কট্টর নিরামিষওলাকেও লজ্জা দিত। এই দুটো ব্যাপারেই উমাপ্রসাদবাবুর তীব্র আপত্তি ছিল। তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। ব্যাপারটিকে সেদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। পর্বত অভিযানের মতো একটা বৃহৎ কর্মকাণ্ড থেকে এইসব বাতিকগ্রস্ত আদর্শবাদীরা যত দূরে থাকে, ততই মঙ্গল। এই নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আমরা তখন ভেবেছিলাম যে, একবার সাফল্যের দামামা বেজে উঠলে এইসব তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনা থেকেই চাপা পড়ে যাবে। দামামাটা অনেকদিন স্তব্ধ হয়েছে কিন্তু, সেই তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আমাদের সযত্ন লালন-পালনে বিশাল-বিপুল হয়ে আসল হিমালয়টাকেই আড়াল করে দিয়েছে।

পর্বতারোহণের আইডিয়াটি আমরা পেয়েছি পশ্চিমদেশ থেকে। ওদেশেই ওর জন্ম, গড়ে ওঠা এবং শ্রীবৃদ্ধি। শতাধিক বছরের নিরলস, প্রায় নিষ্কাম সাধনার পর ১৯৫৩ সনে এভারেস্ট শীর্ষে ওদের ঝাণ্ডা ওড়বার পর আমরা হঠাৎ হিমালয় সম্পর্কে খুব উৎসাহী হয়ে উঠলাম। দার্জিলিঙে হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলো; সেই সঙ্গে সদ্‌গুরু পাকাবার কাজও শুরু হলো। ভারতের সঙ্গে হিমালয়ের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যোগাযোগ দীর্ঘদিনের —মহাভারত রচিত হবারও অনেক আগেই বৈদিক ও হিন্দু মুনি-ঋষিরা হিমালয়ের আগাপাশতলা মোটামুটি জরিপ করে ফেলেছিলেন। প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কালে, প্রাগৈতিহাসিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে, যে সকল দুর্গমতা ওরা অতিক্রম করেছেন, তা ভাবলে আজও হতবাক্ হতে হয়। ওদের সেই ঐতিহ্য—মজা নদীর মতো—আজও তীর্থযাত্রীদের তীর্থ পরিক্রমায় ক্ষীণায়ু হয়ে বেঁচে আছে। দুর্গম হিমালয় ওরা অতিক্রম করেছেন ধর্মের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য, অমৃতের জন্য। হাঁসফাঁস করতে করতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে একটা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিতে পারলেই যে মস্তবড় বাহাদুরী হয় সেই কথাটা ওদের মাথায়ই আসেনি। ওরা পর্বত-পরিক্রমা করেছেন,

পর্বত আরোহণ করেননি। পর্বতারোহণ জিনিসটা—তার প্রতিটি পদক্ষেপ—আমরা পশ্চিমদেশ থেকেই আমদানী করেছি।

একটা জিনিস আমদানী করা সহজ, সেটি পরিপাক করা ততটা সহজ নয়। ধরাচূড়াটা সহজেই আমদানী করা যায়, কিন্তু ঐতিহ্যটা কঠোর সাধনায় স্বকীয় করে নিতে হয়। বিদেশ থেকে আমদানী করা অন্য দশটা আইডিয়ার বেলায় যা ঘটেছে, পর্বতারোহণের বেলায়ও তার অন্যথা হয়নি—মনোহর ছোবড়াটি নিয়ে অনেককাল মেতে থাকবার পর অবশেষে যখন সত্যকারের ক্ষুধার উদ্রেক হলো তখন ছোবড়া ছাড়িয়ে দেখা গেল ভেতরে শাঁস নেই। পর্বতারোহণের নাম করে, প্রচুর ঢক্কা-নিনাদ সহকারে, আমরা যা আনলাম—এখন দেখছি—তা কেবলই পাহাড়ে চড়বার কায়দা-কানুন—তার অতিরিক্ত আর কিছুই না। এই কায়দা-কানুন নিয়ে আমরা এমনই মেতে রইলাম যে পাহাড়টাও তুচ্ছ হয়ে গেল।

পাহাড়কে চিনলে, জানলে, বুঝলে, ভালোবাসলে ও শ্রদ্ধা করলে তবে পর্বতারোহণ; তারপরে পর্বতারোহী। পশ্চিমদেশের ওরা শতাধিক বছরের সাধনায় এসব জিনিস একে একে আয়ত্ত করেছে। পাহাড়ের সঙ্গে পুরাকালে আমাদের যে আলাপ-পরিচয় ও লেন-দেন ছিল তা সম্পূর্ণই ভিন্ন প্রকৃতির। এ ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন সন্তোষজনক সেতু-বন্ধন সম্ভব কি না আমরা জানি না। তার কোনরকম চেষ্টাই করা হয়নি আজও পর্যন্ত। পর্বতারোহণের চালানী আইডিয়াটি নিয়ে তাই আমাদের যাত্রা শুরু হলো বিপরীত দিক থেকে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আমরা যেমন কাণ্ড করেছি—চালানী আইডিয়ার মাপে দেশের বাস্তবতাকে কেটে-ছেঁটে বিকৃত করে লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড—পর্বতারোহণের বেলায় তাই হলো। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও ধ্যান-ধারণার মাপে ধাপ কেটে কেটে আমাদের পর্বতারোহণ শুরু হয়নি।

দশ থেকে গুণতে শুরু করেও এক-শো পৌঁছন যায়, অন্তত থিওরেটিক্যালি। অস্বাভাবিক তাই একটু সময় লাগবে, ক্লেশ হবে, কিন্তু পৌঁছতে না পারার কারণ কোন কারণ নেই। তবে প্র্যাকটিক্যাল কথাটা হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারেও আমাদের ব্যর্থতা অপরিমেয়। যে ব্যাপারে আমাদের প্রাণ ছিল না, শুধু উৎসাহ ছিল, ছুটো চারটে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েই তা ফুরিয়ে গেল।

বিষয়টা এখানে একবার সংক্ষেপে গুছিয়ে নেওয়া যাক। পশ্চিমদেশের সঙ্গে টেক্কা দেবার উদ্দেশ্যে আমরা স্থির করলাম মাউন্টেনিয়ারিং করব। হিমালয়ের কত-বড় ভূখণ্ড, তার অ-আ-ক-খ তখনও আমরা জানি না। হিমালয় সম্পর্কে

বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে কোনরকম চেতনাই ছিল না। বাংলা সাহিত্যেও, প্রবোধ সান্যালের গ্যাঁজালি ছাড়া, হিমালয় নিয়ে দু-চারখানা যা ভাল বই আছে তা অনাদৃত ও অপঠিত। হিমালয় বলতে যেসব নদী উপত্যকা বোঝায়, যেসব লোকজন, গাছপালা ইত্যাদি তার কিছুই আমরা জানি না। কেবল পাশ্চাত্যের কায়দা-কানুনে সুসজ্জিত হয়ে আমরা স্থির করলাম পর্বতারোহণ করব।

সেই অনুযায়ী প্রথমেই আমরা একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলাম, দার্জিলিঙে, আর এই উদ্যোগটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানকল্পে একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় খোলা হলো দিল্লিতে। দুটো সংস্থারই তত্ত্বাবধায়ক হলো আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তর। ছেলেরা দার্জিলিঙের স্কুলে থেকে প্রথমে পর্বতারোহণের ডিগ্রি নেয়; তারপরে মর্জি হলে দিল্লি সদয় হলে, অভিযান সংগঠন করে। আমাদের পর্বতারোহণের, একেবারে গোড়া থেকেই, সব ব্যাপারে, এই দুই সংস্থার উপর নির্ভরশীল। এরা ডিগ্রী দেবে, অনুমতি দেবে, সাজ-সরঞ্জাম দেবে, টাকা-পয়সা দেবে এমন কি শেরপা নিয়োগ করে দেবে তবে আমাদের পর্বতারোহণ শুরু হবে। আমলাতন্ত্রের খাঁচায়, আমদানী করা আইডিয়াটি গায়ে-গতরে বেশ বাড়তে থাকল—কিন্তু আঠার বছর পেরিয়ে গেল। তবু বোল ফোটে না!

আমলাতন্ত্রের সঙ্গে পর্বতারোহণের বিরোধটা একেবারে মূলগত। বর্তমান বিশ্বের আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়া যারা একেবারে হাঁপিয়ে পড়ে তারাই পর্বতা-রোহণের আশ্রয় নেয়। আমাদের দেশে লেজামুড়ো সমেত পুরো পর্বতারোহণ ব্যাপারটিকেই আমলাতন্ত্রের পিছনে গাধা-বোটের মতো বেঁধে দেওয়া হলো। আমলাতন্ত্রকে তুষ্ট করলে তবে পর্বতারোহণ। ফলে যা হবার অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তাই হলো। আসল পূজারীরা পিছিয়ে পড়ল, বিস্মৃত হলো। সামনে এসে দাঁড়াল যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যারা প্রচার চায়, যারা আমলাতন্ত্রকে তোয়াজ করতে পারে।

শেরপাদের নিয়ে কেলেঙ্কারীটা আরও গুরুতর। প্রতিটি অভিযানের জন্য শেরপা নিয়োগ করবার দায়িত্ব শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনের। এই তিনটি সংস্থাই মোটামুটি একই হুকুমে চলে। এই সংস্থাটির দৌলতে শেরপাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা কতটুকু হয়েছে তা হিসাব সাপেক্ষ, কিন্তু এর কল্যাণে দার্জিলিঙের অতি ক্ষুদ্র শেরপা সমাজে যে বিদ্বেষ, যে রেষারেষি সঞ্চারিত হয়েছে তাতে শেরপা ঐতিহ্যটাই মারা পড়বার অবস্থা।

এদেশে পর্বতারোহণের প্রকৃত বিকাশের জন্য শেরপাদের এই ঐতিহ্যটি অত্যন্ত

মূল্যবান। বিদেশী ঐতিহ্যটা হাতে পেলেও হয়তো আমাদের ধাতে সইত না। সেদিক থেকে শেরপাদের প্রাচীনতর ঐতিহ্যটির সঙ্গে আমাদের কিছুটা আত্মিক থাকা সম্ভব। শেরপাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হতে পারলে, হয়তো, দিনে দিনে একদিন আমাদেরও একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে উঠত। কিন্তু সেই গুড়েও বালি দিয়েছে শেরপা অ্যাসোসিয়েশন।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। পর্বত অভিযানে শেরপাদের গুরুত্ব যে কতখানি তা আর আজ বলবার অপেক্ষা রাখে না। খোদ একজন সাহেবই অকপটে স্বীকার করেছেন, তিনি শেরপাদের পিঠে চেপে পর্বতারোহণে যান—ফিরে এসে স্বনামে একখানা বই লিখবেন বলে। কিন্তু পেশাগত নিপুণতা ছাড়াও শেরপাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে যা ছাড়া কোন অভিযানই সম্পূর্ণ নয়। সেটা হলো এদের উদার সৌহার্দ্য। আর এই সৌহার্দ্যের ভিত হলো মেজাজ। সব অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সব শেরপার ঠিক মেজাজে মেলে না। কিছুদিন আগে পর্যন্তও, শেরপাদের যতদিন পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা ছিল, ততদিন ওদের কেউ কেউ কেবল ব্রিটিশদের সঙ্গেই পাহাড়ে যেত, কেউ কেবল ফ্রেন্চ, জারমান, অস্ট্রিয়ান অথবা কেবল জাপানীদের সঙ্গে। অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শের-পাদের এই স্বাধীনতা ঘুচে গেল। এখন কোন শেরপা কোন অভিযানে যাবে তা অ্যাসোসিয়েশনের মর্জি। তোষামোদ করলে সমৃদ্ধিশালী অভিযানে চাকরী মিলবে, নয়তো কোন দীন-দরিদ্র অভিযানের সঙ্গে কপাল খাপড়াও। শেরপাদের সহজ সরল চরিত্র এতে করে কিছুটা শহুরে হবার সুযোগ পেল। কিন্তু এতে করে সব চাইতে বেশি ক্ষতি হলো এদেশের পর্বতারোহীদের।

আমাদের পর্বতারোহীরা প্রথম যখন পর্বতারোহণে যায় তখন তাদের সঙ্গে কেবল বিদেশী কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই যে থাকে না তা আমরা জানি। বিপদে-আপদে ভরসা বলতে কেবল সঙ্গের শেরপারা যদি মেজাজে মেলে। মেজাজে মিললে তখন এই শেরপাদের কাছ থেকেই আস্তে আস্তে অনেক কিছু আয়ত্ত করে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়। আসলে পর্বতারোহণ জিনিসটাই ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের মতো গুরু-শিষ্যানুক্রমে সম্পূর্ণতার দিকে যেতে থাকে। পাহাড়ের সঙ্গে কখন কেমন ব্যবহার করতে হয়, বিপদের সম্মুখীন হলে কেমন করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়, সহযাত্রীদের ক্লেশ কেমন করে ভাগ করে নিতে হয়, সাফল্যে অথবা ব্যর্থতায় কেমন করে নির্বিকার থাকতে হয় এসব জিনিস শেখবার একমাত্র উপায় হলো মেজাজে মেলে এমন শেরপার সঙ্গে বারবার পাহাড়ে যাওয়া। একবার মেলে হবে

না, বারবার যেতে হবে। প্রথম অভিযানটা হয়তো মেজাজে মেলাতে মেলাতেই শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অভিযানে হয়তো সৌহার্দ্যের সূচনা হবে। তারপরের অভিযানগুলিতে সেই সৌহার্দ্য ব্যাপকতর ও গভীরতর হতে থাকবে।

কিন্তু শেরপা হাইবার্স অ্যাসোসিয়েশনের তৎপরতায় শেরপা ও অভিযাত্রীদের মধ্যে এই লেনদেনের রাস্তাটি গোড়া থেকেই রুদ্ধ হয়ে আছে। কোন অভিযানে কোন কোন শেরপা যাবে তা স্থির করেন এই অ্যাসোসিয়েশন—শেরপা অথবা অভিযাত্রীদের পছন্দ অপছন্দ বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো না। কচিৎ-কখনো এমনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যাতে অবাধ্য কোন শেরপা বা উদ্ধত কোন অভিযাত্রীদলকে, একটু মজা দেখিয়ে দেওয়া যায়। আমাদেরই এক অভিযানে একবার একজন বিখ্যাত শেরপাকে সদস্য করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অ্যাসোসিয়েশন তারপর ওই শেরপা এবং তার জ্ঞাতিবর্গকে দীর্ঘদিন কোন কাজ দেয়নি।

আমাদের পর্বতারোহণের যে আজও কোন ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি তার আজও অনেক কারণ আছে। পাহাড়টা আছে বলেই—বিকজ ইট ইজ দেয়ার—পর্বতারোহীরা পাহাড়ে যেতে অভ্যস্ত ছিল। ব্যবস্থাটিকে আমরা উল্টে দিলাম। তেনজিং-কে রাতারাতি রাজা করে দেওয়া হলো। এমনকি নন্দাঘুন্টির চুনোপুঁটিরাও প্রচুর খ্যাতি পেল, কেউ কেউ চাকরী পেল—যেমন এই শর্মা। এর ফলে পরবর্তী কালে যারা পর্বতারোহণ করতে এল তাদের মনের মধ্যেও একটু খ্যাতি অথবা একটা চাকরীর আশা থাকতেই পারে। এসব স্থূলতা নিয়ে আর যাই হোক প্রকৃত পর্বতারোহণ হয় না।

কিন্তু এত-শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, আমাদের ভেতর থেকেই, দু-চার-জন খাঁটি-পর্বতারোহী বেরিয়ে এসেছে। আমি নিজেই অন্তত তিনজনের নাম করতে পারি। পর্বতারোহণের রহস্য আর রোমাঞ্চটাও এইখানেই।

পর্বতারোহণের নাট্যভূমি

আজ আর একথা মনেই হয় না যে মাত্র বছর কুড়ি আগেও পর্বতারোহণ সম্পর্কে এদেশে কোনরকম উদ্যোগ তো দূরস্থান, সামান্যতম কৌতূহলও ছিল না। ওসব ব্যয়বহুল দুঃসাহসিকতা সাহেবদেরই মানায়, সেনাবাহিনীর বাহাদুররাও মাঝে মধ্যে তা চেষ্টা করে দেখতে পারে—কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাও যে কোনদিন পর্বতারোহণ নিয়ে পাগল হয়ে উঠবে তা তখন কল্পনায়ও আসত না।

১৯৬০ সনে প্রথম নন্দাঘুন্টি অভিযানের সময় অনেকেই সেটিকে হাস্যকর ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্বয়ং জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন যে, এটি একটা বিপজ্জনক পাগলামি। কিন্তু সেই পাগলামিটাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৬০ সনে এই কলকাতায় পর্বতারোহণ সংস্থা ছিল মাত্র একটি—ছোটবড় মিলিয়ে এখন তার সংখ্যা প্রায় পৌনে একশ। এখন এই কলকাতা থেকেই কোনও বছর এক ডজনেরও বেশী বড় মাপের পর্বত অভিযান সংগঠিত হয়। এদেশে এর আগে অন্য কোন ক্রীড়া-উদ্যোগ এত তাড়াতাড়ি এতটা জনপ্রিয় হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

অপরদিকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের পর্বতারোহীরা যেসব সাফল্য অর্জন করেছে তাও গর্ব করে বলবার মতো। এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা, চো-ইউ প্রভৃতির কথা এ-লেখায় উহ্য থাকবে। সম্পূর্ণরূপে সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও সংগঠনায় যেসব পর্বত অভিযান হয়, সেগুলো পুরোপুরি পর্বতারোহণ অভিযান কিনা তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা এতদিন শুরু হওয়া উচিত ছিল—সেকাজ সমাধা হবার আগে পর্যন্ত সেসব অভিযান নিয়ে কিছু না বলাই ভাল। কেবল পাহাড়টা আছে বলেই—বিকজ ইট ইজ দেয়ার—যারা পাহাড়ে যায় এখানে কেবল তাদের কথাই বিবেচনা করা হবে।

গত দুই দশকে এদেশের বেসামরিক পর্বতারোহীরা যেসব অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তার তালিকা একদিকে যেমন দীর্ঘ, অন্যদিকে তেমনি বিস্ময়কর। সীমিত সম্বল ও ছেঁড়া-কাটা সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এরা যেসব পর্বতশীর্ষ জয় করেছে—তা যথাযথ শোনাতে পারলে বিদেশীদেরও চোখ ট্যারা হয়ে যেত। পরিতাপের কথা এই যে সেসব অভিযানের কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রক্ষা করা হয়নি। ভারতীয় হিমালয়ের

সবচাইতে উঁচু যে তিনটি পর্বতশীর্ষে বেসামরিক পর্বতারোহীরা আজ পর্যন্ত আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছে সেই তিনটি হোলো নান্দা, ত্রিশূল ও কামেট। কজনা জানেন বা মনে রেখেছেন যে, এই তিনটি শৃঙ্গই জয় করেছে এই পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা? এই কলকাতারই একটি অভিযাত্রীদল একবার এমন একটি রেসকু্য অপারেশন সফলতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছে যার তুলনা সমগ্র হিমালয় অভিযানের ইতিহাসেও খুব বেশী নেই। ফুটবল ছাড়া অন্য কোন ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙালীরা এর থেকে বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

এইসব সাফল্য অবশ্যই কেবলমাত্র পর্বত-অভিযাত্রীদের নিজেদের সামর্থ্যে সম্ভব হয়নি। একটা হিমালয় অভিযান করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। নানারকম দুষ্প্রাপ্য সাজ-সরঞ্জাম ও দুর্মূল্য রসদ ছাড়া কোনও হিমালয় অভিযান সম্ভবই হতে পারে না। এদেশে অভিযান করতে হলে প্রথমেই দরখাস্ত পাঠাতে হবে নয়াদিল্লীতে ইনডিয়ান মাউনটেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের কাছে—যার তত্ত্বাবধায়ক আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তর। কোন্ পাহাড়ে অভিযান হবে, তার জন্য কী-কী এবং কতগুলো সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া যাবে, এই সবকিছুই স্থির করবার অধিকার একমাত্র ওই ফাউণ্ডেশনের। আমলাতান্ত্রিক জীবনধারায় প্রাণটা যখন ওষ্ঠাগত হয় মানুষ তখনই পর্বতারোহণ করতে যায়, কিন্তু এদেশে পর্বতারোহণ ব্যাপারটাই পুরোপুরি আমলাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হয়েছে। অভিযানের রাহা খরচ বাবদও ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে কিছু টাকা দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু মোট খরচের তুলনায় তা সামান্যই।

এই সাফল্যের আরও অনেক অংশীদার আছেন যাঁদের উদার সহায়তা ব্যতিরেকে এদেশের পর্বতারোহণ হয়তো আজও সামরিক ছাউনির ভিতরেই আবদ্ধ থেকে যেত। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী ছাড়া অন্যকোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোনও পর্বত অভিযানের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সম্ভবত বহন করেননি।

সবদিক তলিয়ে দেখলে মনে প্রশ্ন জাগবেই, এদেশে হিমালয় অভিযান আদৌ সম্ভব হয় কেমন করে? অভিযানের আইডিয়াটি যখন মাথায় এল তখন তার জন্য সবকিছুই মহাশূন্যে। দিল্লি থেকে অনুমতি আসবে, দারজিলিং থেকে সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া যাবে, প্রয়োজনীয় অর্থ ও রসদ সংগ্রহ হবে—এবং সেখানেই শেষ নয়—তারপরে আবার অফিস থেকে যথাসময়ে ছুটি মঞ্জুর হবে, তবেই সবশেষে দৈহিক প্রাণটুকু হাতে করে পর্বতে আরোহণ করতে যাওয়া। সবথেকে বিস্ময়ের

কথা এতসবের পরেও এদেশে পর্বত অভিযান হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো সফলও হয়। এই সাফল্যের প্রথম এবং প্রধান মূলধন—অভিযাত্রীদের উৎসাহ।

কিন্তু এই উৎসাহ ইদানিং যেন কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছে। পর্বত অভিযাত্রীদের আজকাল অনেক সময়ই কেমন যেন ক্লান্ত মনে হয়। অভিযান এখনও হয়—আরও বেশী সংখ্যায়ই হয়—কিন্তু আজ আর তা তেমনভাবে সাড়া জাগায় না। অভিযান থেকে ফিরে এসে অভিযাত্রীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, দল ছাড়াছাড়ি ইদানিং প্রায় অবধারিত হয়ে পড়েছে। অপর দলের কৃতিত্বে ঈর্ষান্বিত হওয়া, এমন কী সংশয় প্রকাশ করা এখন আর লজ্জাকর নয়। এখন আমরা যত হিমালয়ে যাচ্ছি, হিমালয় যেন ততই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। উদারতা, সহনশীলতা, সততা, সৌহার্দ্য—হিমালয় গিয়েও হিমালয়ের এইসব আশীর্বাদ আমরা আর আহরণ করতে পারছি না। এর ফলে নানারকম গোঁজামিল দিতেই হয় এবং তার দুর্ভোগও পোহাতে হয়। অভিযানের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক, যাঁরা রসদ সরবরাহ করেন, তাঁদের মধ্যেও এই ক্লান্তি সংক্রামিত হয়েছে এবং সেজন্য অভিযান সংগঠন করাও উত্তরোত্তর অধিকতর কঠিন হয়ে পড়ছে। এমনটা কেন হল? কেমন করে হল?

মতান্তরের নিশ্চয়ই কোন অবকাশ আছে। কিন্তু এর প্রধান কারণ বোধহয় এই যে—গত কুড়ি বছরেও এদেশে আমরা পর্বতারোহণের একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের সব কৃতিত্বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হারিয়ে গেছে। একটা ঐতিহ্য থাকলে তার গায়ে এইসব কৃতিত্ব অলঙ্কারের মতো শোভা পেত, তাতে এদেশের পর্বতারোহণেরই গৌরব বাড়ত। আমরা চাষ করেছি, ফসলও ফলেছে, কিন্তু সে-ফসল গোলায় ভরা হয়নি। পর্বতারোহী হিসেবে আজও তাই আমরা এমন দীন-হীন। আমাদের পর্বতারোহণ তাই আজও অস্বীকৃত। কিন্তু কুড়ি বছরেও আমরা একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলাম কেন?

তার অনেক কারণ আছে, এবং গলদ একেবারে গোড়া থেকে। পর্বতারোহণ জিনিসটা আমরা সাহেবদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি—এতে লজ্জা বা সংকোচের কোনও কারণ নেই। পর্বতের সঙ্গে যখন থেকে আমাদের সভ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সাহেবরা তখনো পুরোপুরি বর্বর ছিল। মাত্র শ'দেড়েক বছর আগেও সাহেবদের ধারণা ছিল যে, পাহাড় নামে পৃথিবীর কদাকার কুঁজগুলো আসলে শয়তানের ডেরা। আর হিমালয়কে আমরা শ্রদ্ধা করছি, পুজো করছি মহাভারতের যুগেরও অনেক আগে থেকে পাঁচহাজার বছরেরও ঊর্ধ্বকাল ধরে। হাঁসফাঁস করতে করতে পাহাড়ের চূড়োয় উঠে কোনক্রমে একটা পতাকা পুঁতে দেবার কথা আমাদের মাথায় আসেনি

সে কথা ঠিক। কিন্তু সচেতন ভারতীয় মাত্রই হাজার হাজার বছর ধরে হিমালয়ের আকর্ষণ অনুভব করেছেন। আজ তা যতই অনাদৃত হোক, হিমালয়কে নিয়ে ভারতবর্ষে যে একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল বিশ্ব-সভ্যতায় তার কোনও দ্বিতীয় নজির নেই। পুরাকালে মানে মোটর সভ্যতার বিস্তারের আগে পর্যন্ত, ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা যে সামান্য সম্বল নিয়ে যাবতীয় পার্বত্য দুর্গমতা অতিক্রম করেছেন, তা একটু তলিয়ে দেখতে আজকের দুঃসাহসীদেরও চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতীয়রা কখনো জয়ের মনোভাব নিয়ে হিমালয়ে যাননি, তাঁরা যেতেন হিমালয়কে জানতে। হিমালয়কে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

অপরদিকে সাহেবরা যখন পাহাড়কে ভালোবাসতে শিখলো তখনই তারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল পাহাড়কে জয় করতে। পাশ্চাত্যের রীতিটাই ওইরকম—হাতে হাতে পুরস্কার চাই। এই যুগধর্ম থেকে আমাদেরও রেহাই মেলেনি, মেলবার কথাও নয়। তাছাড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে দেখলে পাহাড়ের নতুন একটা রূপ চোখে পড়ে। হিমালয়কে যতদিক থেকে দেখা যায়, ততদিক থেকেই তার সঙ্গে সখ্যতা হয়। সাহেবদের কাছ থেকে পর্বতারোহণ জিনিসটা গ্রহণ করার কোনও দোষ ঘটেনি। দোষ ঘটেছে আমরা যেভাবে তাকে গ্রহণ করেছি সেখানে।

পাহাড়কে জয় করেই সাহেবরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়। এই পরিপূর্ণতাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ওদের সাহিত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে এবং পর্বতারোহীদের জীবনধারায়। পাহাড় আমরাও জয় করি, কিন্তু সেই তৃপ্তি আমাদের বাইরেই থেকে গেছে—আমাদের জাতীয় চরিত্রই তার অন্তরায় হয়েছে। এজন্যই এদেশের সাহিত্যে, এবং পর্বতারোহীদের জীবনধারায় পর্বতারোহণের কোনও স্থায়ী ছাপ পড়েনি। এজন্যই আমরা ক্লান্ত বোধ করি। নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ করে মরি। আমাদের চিরায়ত হিমালয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানকালের হিমালয় অভিযান পর্বটিকে জুড়ে দিতে পারলে এই বিপত্তি ঘটত না।

সেটা কেন হয়নি, কার দোষে হয়নি, সে তর্ক তুললে তা কখনোই শেষ হবে না। দোষ আমাদের সকলেরই। এদেশে পর্বতারোহণের যে অত্যাধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, ভূত আছে সেই সর্ষের মধ্যেই। সেখানে পাহাড়ে চড়বার খুঁটিনাটি উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু পাহাড় জিনিসটা যে কী, হিমালয়ের সঙ্গে ভারতের যে কী সম্পর্ক, সে-বিষয়ে কিছু শেখাবার ব্যবস্থা সেখানে

নেই। আমরা তাই হিমালয় অভিযানে যাই, সফলও হই, কিন্তু তার সুফল পাই না।

মোটর রাস্তা খুলে যাবার পর হিমালয়ের দুর্গম তীর্থগুলি আজ সুগম হয়ে গেছে। যে তীর্থপথে একসময়ে আমাদের হিমালয়-ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, পরিপুষ্ট হয়েছে, সেই পথে এখন পেট্রোলের গন্ধ, মোটরগাড়ীর ধূলা। এই ধূলোর আর গন্ধে আমাদের পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যটাই চাপা পড়বার উপক্রম হয়েছে।

সেই ঐতিহ্য রক্ষা করবার দায়িত্বটা এখন বর্তেছে পর্বতারোহীদের উপর। একসময়ে কেদার-বদ্রী গেলেই হিমালয়ের সাক্ষাৎ মিলত। এখন হিমালয় দূরে সরে গেছে। চলে গেছে নির্জনতর ও দুর্গমতর স্থানে। সেখানে গিয়ে হিমালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ আছে কেবল পর্বতারোহীদেরই। এদেশের তীর্থযাত্রীরা একসময়ে হিমালয়-তীর্থ থেকে ফিরে এসে চণ্ডীমণ্ডপে বসে তীর্থকাহিনী শোনাতেন, পরবর্তীকালে তাঁরা গ্রন্থও রচনা করেছেন। হিমালয়ে গেলে যে জন্মান্তর ঘটত এসব ছিল তারই বহির্লক্ষণ। পর্বতারোহীরা যদি সেই ঐতিহ্যের ধারাটি অব্যাহত রাখতে পারে, তার ছিটে ফোঁটা সমতলে বহন করে আনতে পারে, কেবল তবেই এদেশের পর্বতারোহণ সুসম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হবে। এজন্য সাধনার প্রয়োজন। সাধনা আমরা করছিও। কিন্তু লক্ষ্য স্থির নেই বলে আমাদের সবকিছুই নিষ্প্রাণ নাট্যভঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭৯। এবছর দার্জিলিং হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থার রজত জয়ন্তী। জহরলাল নেহরু ও বিধানচন্দ্র রায় এই দুই নেতার আশীর্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৪ সনে। গত পঁচিশ বছরে এই সংস্থার ছাত্ররা এবং ছাত্রীরাও হিমালয়ের অনেক অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করেছে, অনেক অনেক দুর্লভ গিরি-শীর্ষে আরোহণ করেছে। যথেষ্ট ঘটা করে রজত জয়ন্তী উৎসব করবার অধিকার এই সংস্থা অর্জন করেছে। ভারতে পর্বতারোহণ প্রয়াসের আজ যে ব্যাপক জন-প্রিয়তা তারও মূলে আছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

আমাদের অনেকেরই সব সময়ে সঠিক খেয়াল থাকে না এবং পর্বতারোহী ভায়াদেরও কেউ কেউ শুনে হয়তো বিস্মিত হবে যে, পঁচিশ বছর আগেও পর্বতারোহণ ব্যাপারটি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। সত্য বটে যে, প্রায় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, মহাভারতের আমলেরও অনেক আগে থাকতে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে বছরের পর বছর কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, কৈলাস-মানস সরোবর প্রভৃতি দর্শন করে এসেছে। সেই প্রথম যুগের অভিযাত্রীদের কথা এবং তাদের আদিম সাজ-সরঞ্জাম বিষয়ে ভাবলে আজকের সবচাইতে দুঃসাহসী পর্বতাভিযাত্রীরও মাথাঘুরে যেতে বাধ্য। কিন্তু তবুও তাদের অভিযান আজকের সংজ্ঞানুযায়ী—ঠিক পর্বতারোহণ ছিল না। লোক-লস্কর নিয়ে, দল বেঁধে হৈ-হৈ করতে করতে গিয়ে পাহাড়ের চূড়োয় একটা পতাকা পুঁতে দিয়ে এসে বাহাদুরী নেওয়া—জাস্ট বিকজ ইট ইজ দেয়ার! —না, এর জন্য কোনদিন আমাদের কণামাত্রও আগ্রহ ছিল না, কৌতূহল ছিল না। হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ আমাদেরও ছিল, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের, ভিন্ন চেহারার। পর্বতারোহণের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। পর্বতারোহণটা পুরোপুরি ইউরোপের জিনিস। দেশের কেউ কেউ সংবাদপত্র মারফৎ ইউরোপীয় সভ্যতার এই মহৎ প্রয়াসটি সম্পর্কে কিছু কিছু খোঁজ-খবর রাখতেন—ওই পর্যন্ত। ভারতীয়রা পর্বতারোহণে আগ্রহী হন বলে বা কোন কঠোর সাধনার সার্থক রূপায়ণে দার্জিলিঙের হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থার আবির্ভাব ঘটেনি।

ব্যাপারটি ঘটেছিল অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়বার মতো। অর্থাৎ, সংস্থাটি আগে হোক, কিন্তু পর্বতারোহী তৈরী করা যাক, তারপরে পর্বতারোহণ ঠিক এসে যাবে। অর্থাৎ, এই সংস্থাটিই প্রথম একটি মহৎ ইচ্ছার জন্ম দেবে এবং তারপর সেই ইচ্ছা পূরণ করবার প্রেরণা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। ঘটনা পরম্পরায় এমন না হয়ে উপায় ছিল না!

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৫৩ সনে—ভারতের টেনজিং নোরগে ও নিউজিল্যাণ্ডের এডমাণ্ড হিলারি যেদিন এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করলেন সেদিন। দুজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির এই অসম—সাহসিক কীর্তিতে সেদিন সমগ্র বিশ্ব গৌরববোধ করেছিল। পরবর্তীকালে মানুষ চন্দ্রে পদার্পণ করবার পরেও অমন আনন্দোচ্ছাস দেখা যায়নি। সেই ঘটনায় ভারত একটু বেশি মাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, কেন না, টেনজিং নোরগে ভারতের নাগরিক। টেনজিঙের গৌরবে ভারতেরই গৌরব।

কিন্তু শিরোপাটি পাবার পর এক ঝামেলা দেখা দিল—সেটি পরবার মত শির এদেশে তখনো জন্মায়নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পর্বতারোহী একজন ভারতীয় নাগরিক, অথচ ভারতবর্ষে পর্বতারোহণের নাম গন্ধও নেই। আমাদের সাধনার জোরে নয়, দার্জিলিঙের হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থাটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঘটনা পরম্পরায়। সরকারী উদ্যোগে।

সংস্থাটির জন্ম বৃত্তান্তে যতই ফাঁক-ফোকর থেকে থাকুক, সংস্থাটির কৃতিত্বে তা অচিরেই সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। সংস্থাটিকে সজীব করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল বাহবা তাদেরই প্রাপ্য। এঁরা হলেন মেজর এন ডি জয়াল ও মণীন্দ্রনাথ সেন।

নন্দু জয়াল একজন জাত পর্বতারোহী। সামাজিক গণ্ডির বাইরের লোক। উৎসাহ বলতে এক হিমালয়। এর আগে সখের ব্রিটিশ পর্বতারোহীদের সঙ্গে পাহাড় পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন, গঙ্গোত্রী এলাকায় বন্দরপুঞ্চ শীর্ষে আরোহণ করা হয়ে গেছে। পাহাড়ের কথা কানে গেলে পাচুলকোয়, দিবসের, নিশীথের সব স্বপ্ন পাহাড় নিয়ে। ওদিকে আবার সামরিকবাহিনীর মেজর—ছুঁয়ে ছুঁয়ে চাঁদের অঙ্কটাও জানা আছে। ভারতের প্রথম পর্বতারোহী সংস্থাটি গড়ে তোলবার জন্য প্রথমেই নির্দ্বিধায় এগিয়ে এলেন গাড়োয়াল তনয়।

যোগ্যের সঙ্গে যোগ্য যুক্ত হল। ভারতে পর্বতারোহণ প্রবর্তনার মহৎ কাজে নন্দু জয়ালের সঙ্গে যিনি এসে মিলিত হলেন তিনি মণি সেন। এর বয়স তখনও শতবত ষাটের দশকের শেষার্ধে। পর্বতারোহী নন, হবার বাসনাও ছিল না

কোনদিন। হিমালয়ে চড়েন না, কিন্তু হিমালয়ের সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে সেই সৌন্দর্যের যতটা সম্ভব তার চাইতে সামান্য একটু বেশি ছবির পটে ফুটিয়ে তোলেন। হিমালয়ের নিভৃত নিবিড় ছবি আঁকবার জন্য জীবনভোর কঠিন কঠিন অজস্র দুর্গমতা অতিক্রম করেছেন। কলকাতার কুলীন শিল্প-রসিকেরা কোনকালে এঁর নাম শুনেছেন কি না জানি না—তবে বিশ্বের সৌন্দর্য রসিকদের সঙ্গে এঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। ফ্রাঙ্ক স্মাইথের সঙ্গে এঁর গভীর সখ্যতা ছিল। (দার্জিলিঙে উধাও হয়ে যাবার ঠিক পূর্ব প্রহরে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ মিঃ সেনকে দুটো জিনিস উপহার দিয়েছিলেন, দু-শত টাকার একটি চেক আর একটা পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া তুষার গাঁইতি। চেকটি আশিসদের ফিরিয়ে দিয়ে মিঃ সেন গাঁইতিটা শ্রদ্ধার সঙ্গে রেখে দিয়েছেন!) পর্বতারোহণের স্বর্ণ যুগে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে, খ্যাতকীর্তি প্রত্যেক পর্বতারোহীর সঙ্গেই এঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিমালয় থেকে অবসর গ্রহণের আগে এরা প্রায় সকলেই এম সেন নামাঙ্কিত কিছু কিছু ছবি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন—বৃদ্ধ বয়সে চেয়ারে দেহ এলিয়ে, মনে মনে আরোহণ করবার জন্য!

মণি সেনের স্বপ্ন ও নন্দু জয়ালের উত্তম—এই দুই নিয়ে দার্জিলিঙের হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থার যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৪ সনে। এই ব্রতের জন্যই যেন এই দুই ব্রাত্য এতদিন পৃথক পৃথকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এরা কাজে হাত দেবার অল্পদিনের মধ্যেই আবার প্রমাণ হয়ে গেল যে, উদ্দেশ্য মহৎ হলে, উত্তম একনিষ্ঠ হলে অসম্ভব আজও সম্ভব হয়। স্বাধীন ভারতে অনেক অনেক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে নানা ধরনের নানা স্বপ্ন রূপায়িত করবার জন্য। সে সবের প্রায় সব কয়টি আঁতুর ঘর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যতম গৌরবময় ব্যতিক্রম দার্জিলিঙের এই হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থা। এই কৃতিত্বের অংশীদার কেবল দুজন—মণি সেন ও নন্দু জয়াল।

এরা একই সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলেন—দুজন দুই প্রান্ত থেকে। একদিকে শ্রীসেনের স্বপ্ন, ড্রইং বোর্ড হতে বার্চ হিলের উত্তর সীমায়, একটা শিল্পকর্মের মতো একটি সতেজ চারা-গাছের মতো, পত্র-পল্লব ছড়াতে শুরু করল। অপরদিকে পাগলা নন্দু দার্জিলিঙের কয়েকটি প্রাইভেট বাড়ি ম্যানেজ করে পর্বতারোহণের কোর্স চালু করে দিলেন। বাস্তবে তখনো পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের কোন অস্তিত্ব নেই—কিন্তু তার ডিরেক্টর আর প্রিন্সিপাল মরবার ফুরসৎ পান না। একেবারেই ভিন্ন ধরনের সম্পূর্ণ নতুন একটা প্রতিষ্ঠান—অল্প কিছু অর্থ ও প্রচুর উৎসাহ—দিল্লি-কলকাতার বড় কর্তারা ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। এতে শাপে বর হয়েছে।

নন্দু জয়াল ও শ্রীসেন স্বাধীনভাবে, মনের মেজাজ মতো কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই পর্বতারোহণ সংস্থাটি দার্জিলিঙের একটা অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে দাঁড়াল। বার্চ হিলের সুদূর প্রান্তে—অপেক্ষাকৃত বেপরোয়া প্রেমিক-প্রেমিকারাই কেবল যেখানে হারিয়ে যেতে সাহস পেত—সেখানকার নির্জন সৌন্দর্য কণামাত্র ক্ষুণ্ণ না করে—শ্রীসেনের স্বপ্ন খুব দ্রুত রূপ-পরিগ্রহ করতে লাগল।

অপরদিকে নন্দু জয়াল এমনভাবে শিক্ষাক্রম স্থির করলেন যার কোন যার নেই। কাজটা খুব সহজ ছিল না—সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করে তৎসহ তা চরিতার্থ করবার পথ বাতলে দেওয়া। কেবল উৎসাহিত করা নয়, উৎসাহটিকে জীইয়ে রেখে, পরিপুষ্ট করে, সার্থক করে তোলা। এই কঠিন কাজ সুষ্ঠুরূপে সমাধা করবার হিম্মত ছিল ক্ষ্যাপা নন্দুর।

১৯৫৪ সনে পাঠশালা খুলে, ১৯৫৫ সনেই পড়ুয়াদের নিয়ে সংগঠন করলেন কামেট অভিযান। কামেট ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম পাহাড়, নন্দাদেবীর পরেই। এর আগে তিরিশের যুগের গোড়ায়, ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ একবার এই কামেটে উঠেছিলেন—তারপরে এই ভয়ঙ্কর সুন্দর পাহাড়ে আর কেউ নাক গলাতে আসেনি। বিশ্বের নামী-দামী পর্বতারোহীরা দুঃসাহসিকতার চাইতে বিচক্ষণতাকে অধিকতর মূল্যবান জেনে যে পাহাড়কে পরিহার করেছেন, সেই পাহাড়েই নবোদগতদের নিয়ে হাজির হলেন নন্দু জয়াল। এবং জয় করে ফেললেন প্রথম উদ্যমেই। তারপরে এই পড়ুয়াদের নিয়েই তিনি হিমালয়ের অপর দুই দৈত্য—ইবি-গামিন ও সাসের কাংড়ি জয় করেছেন। ভারতীয় পর্বতারোহণের সেই আদিম যুগে—দু-তিন হাত ফেরতা সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসব অভিযানের কথা ভাবা যায় না।

পরবর্তীকালে প্রধানত দার্জিলিঙের এই পর্বতারোহণ সংস্থারই উদ্যোগে বিশ্বের উচ্চতম ও দুর্গমতম পর্বতশীর্ষ এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করা হয়েছে। এইসব দুর্লভ কীর্তি, এই রজত জয়ন্তী বর্ষে বড় গলায় বারবার ঘোষণা করবার মতো কীর্তি। কিন্তু এসব ব্যাপারে প্রকৃত পর্বতারোহীদের মাপকাঠিটা একটু উদ্ভট ধরনের—তারা বলবেন, ওই প্রথম যুগের অভিযানগুলোই মাপে অনেক বড় ছিল। কেননা, সেসব অভিযানের আসল পাথেয় ছিল হিমালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহ। আর তার যোগানদার ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেন ও মেজর নন্দু জয়াল।

তার বহুরোজগার ক্রম সময়ে যদি সেন ও নন্দু জয়াল সংস্থাটিকে এমন করে গড়ে

তুললেন যে, বিশ্বের পর্বতারোহী মহল আনন্দে হতবাক। দিল্লি এবং কলকাতার আমলাদেরও টনক নড়ল। দুঃসময় ঘনিয়ে এলে ভগবানও দুষ্কৃতকারীদের সহায় হন। ১৯৫৮ সালে চো-ইউ পর্বত অভিযানে গিয়ে জয়াল মারা গেলেন। মৃত্যুর কারণ নিউমোনিয়া। জয়ালের যারা অন্তরঙ্গ ছিলেন, তারা বলেন, এটা আত্মহত্যার নামান্তর। মৃত্যুর বছর খানেক আগে থাকতেই আমলাতন্ত্রের খোঁচায় জয়ালের জীবন যে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল তার অনেক সাক্ষী-প্রমাণ আছে। জয়াল চিরদিনই একটু বেহিসেবী—সব বিষয়েই। বৈষয়িক ব্যাপারে যারা উদাসীন—নইলে আর মরতে পাহাড়ে চড়তে যাবে কেন? তাদের বেকায়দায় ফেলা বড় সহজ কাজ। এদের আত্মসম্মান বোধটাও মারাত্মক রকম তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে।

জয়াল ও মণি সেন-এর সাধনা যতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে চলছিল ততদিন এ-ব্যাপারে মাথা গলাবার চিন্তা আমলাদের মাথায় আসেনি। তাছাড়া পর্বতারোহণের মতো একটা উদ্ভট উদ্যম নিয়ে মেতে ওটা কেবল পাগলদেরই সাজে। কিন্তু উদ্যমটা যে মুহূর্তে দেশবিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেই মুহূর্তে দেশের এই মূল্যবান সংস্থাটিকে 'রক্ষা' করবার জন্য বিচক্ষণ আমলারা এগিয়ে এলেন। এমন মহৎ একটি প্রতিষ্ঠান কি পাগলদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়! কিছু কুৎসা চাউর করে দেবার পর ঈশ্বর ভালয় ভালয় নন্দু পাগলাকে সরিয়ে নিলেন। দুর্যোগের মেঘ আরও একটু ঘনীভূত হলে মণীন্দ্রনাথ সেন সংস্থার যাদুঘরের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। সংস্থার দায়িত্বভার—আগাপাশতলা—সেই থেকে সরকারী আমলাদের হাতে।

কাজটা খুব সহজেই সাধিত হল। গোড়া থেকেই সংস্থাটির পরিচালনা পদ্ধতি খুব হিসেব করে ছকে নেওয়া হয়েছিল। সংস্থার যাবতীয় ব্যয়ভার আধাআধি বহন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার: কিন্তু এর পরিচালনার ভার প্রায় সম্পূর্ণরূপে দিল্লির প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে। পরবর্তীকালে প্রতিরক্ষা দপ্তরেরই সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশন গঠিত হলে এই নিয়ন্ত্রণাধিকার অধিকতর ব্যাপক, গভীর এবং স্থায়ী হয়। তারও পরে চীন-ভারত সীমান্তে সংঘর্ষ ঘটে যাবার পর সংস্থাটি কার্যত প্রতিরক্ষা দপ্তরেরই একটা শাখা হয়ে দাঁড়ায়।

পর্বতারোহণ ব্যাপারটা প্রতিরক্ষা প্রয়াসের থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন মার্গের জিনিস। তথাপি, সেই ১৯৫৪ সনেই, নবজাত পর্বতারোহণ সংস্থাটিকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রতিরক্ষা দফতরের উপর অর্পিত হয়েছিল কেন? কার দূরদৃষ্টিতে? প্রকৃত

পর্বতারোহীদের এ নিয়ে গবেষণা করবার সুযোগ আছে।

আমলাতন্ত্রের কঠিন নিগড়ে থেকেও প্রয়াসটির যে মৃত্যু ঘটেনি—বরং প্রসার ঘটেছে—তা ওই প্রয়াসটিরই চরিত্রের জোরে। সংস্থাটির চমকপ্রদ সমৃদ্ধির পিছনে অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে। গত পঁচিশ বছরে এই সংস্থার উদ্যোগে এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও আরও অনেক অনেক দুর্গম, দুর্লভ পর্বতশীর্ষ জয় করা হয়েছে। কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী পর্বতারোহণ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছে। শিক্ষালাভের পর সামরিক বিভাগের যারা তাদের সকলেরই পদোন্নতি ঘটেছে; অন্যান্যদের মধ্যে কেউ কেউ বেসামরিক অভিযান সংগঠন করেছেন। এই সংস্থার অনুকরণে হিমালয়ের অন্যান্য জায়গায় আরও কয়েকটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং সেসব সংস্থা থেকেও অনেক পর্বতশীর্ষ জয় করা হয়েছে ও অনেক ছাত্রছাত্রীকে পর্বতারোহণ বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এক কথায় ভারতীয় পর্বতারোহণ বলতে আজ যে বিরাট-বিশাল ব্যাপারটি বোঝায় তার মূল উৎস এই দার্জিলিঙের হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থা। এই রজত জয়ন্তী বর্ষে সেইসব কীর্তিকথা নিশ্চয়ই রেডিও, টি ভি, সংবাদপত্র মারফৎ সবিস্তারে বারম্বার ঘোষণা করা হবে। পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখলে এই সংস্থার সাফল্যের সত্যাই কোন তুলনা নেই।

কিন্তু কেবল বাইরে থেকে দেখে কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সঠিক স্বাস্থ্য সব সময় বোঝা যায় না। বাইরে থেকে ট্রফি গুণে মাপলে দার্জিলিঙের এই পর্বতারোহণ সংস্থার সাফল্যের সত্যাই কোন সীমাপরিসীমা নেই। কিন্তু কেবল ট্রফি অর্জনের জন্যই তো এই সংস্থা স্থাপিত হয়নি। এই সংস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল—ভারতবর্ষে পর্বতারোহণ প্রয়াসে উৎসাহিত করা। কেবল চূড়োয় আরোহণের কেরামতি শেখানো নয়, মণি সেন ও জয়ালের সাধনা ছিল ভারতীয়দের মধ্যে প্রকৃত পর্বতা-রোহণের প্রেরণা উদ্বোধিত করা। গত পঁচিশ বছরে সে কাজ কতটা সাধিত হয়েছে ?

নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই এ প্রশ্নের আলোচনা শুরু করা যায়। সে অভিজ্ঞতা নিতান্তই বিস্ময়কর। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, ১৯৬০ সনে আমরা নন্দাঘুন্টি অভিযানের আয়োজন করি। নন্দাঘুন্টি ছিল ভারতের সর্বপ্রথম বেসামরিক পর্বত অভিযান। ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল তখন ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং আর শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট টেনজিং নোরগে। উভয়েই নন্দাঘুন্টি অভিযান বন্ধ করবার জন্য একেবারে হমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। এমনকি দিল্লিতে দরবার করে পণ্ডিত নেহরুকে দিয়ে চিঠিও লেখান হয়েছিল অভিযানের

পৃষ্ঠপোষক অশোককুমার সরকারের কাছে—যাতে এই হঠকারিতাকে আর প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। নেহরু এবং সংস্থার সামগ্রিক বিরোধিতা সত্ত্বেও, সবাই জানেন, নন্দাঘুন্টি অভিযান সফল হয়েছিল। অশোককুমার সরকারের বলিষ্ঠ অনমনীয়তা ব্যতিরেকে নন্দাঘুন্টি অভিযান সম্ভব হত না, যতীন্দ্রনাথ সেনের সোৎসাহ সহযোগিতা ব্যতিরেকে নন্দাঘুন্টি অভিযান সফল হত না।

এখানেই স্বীকার করা প্রয়োজন যে, আমাদের পরবর্তী অভিযানগুলোর আমরা ইনস্টিটিউটের নিম-সহযোগিতা পেয়েছি। সেজন্য যদি ইনস্টিটিউটের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা উপচে উঠে না থাকে তবে তার জন্য কেবল আমরাই দোষী এমন কথা মেনে নিতে পারব না। ইনস্টিটিউটের মাত্রাতিরিক্ত খবরদারী এবং অভিযানের ছোট-বড় প্রতিটি ব্যাপারে—পর্বতাভিযাত্রীদের স্বাধীনতায়—অহেতুক হস্তক্ষেপ করা সমীচীন কিনা, নন্দাঘুন্টি অভিযানের পরেই তা খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। তা হয়নি, আমলাতন্ত্রের অভিধানে আত্মসমীক্ষা শব্দটি নেই। ১৯৬২ সনের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর ইনস্টিটিউটের উপর আমলাতন্ত্রের প্রভাব আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

একেবারে গোড়া থেকেই—একের পর এক—সংস্থাটির অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন সামরিক বিভাগের অফিসারেরা। প্রতিটি অভিযানের, প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য, এঁর অনুমোদন অত্যাবশ্যক। শুনেছি, সামরিক অফিসারেরা এই পদটিকে একটি প্রাইজ-পদ বলে মনে করেন। তাছাড়া একেবারে প্রথম থেকেই এই সংস্থায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শুনেছি শিক্ষা গ্রহণের পর এদের অনবিতর পদোন্নতি ঘটে থাকে। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরির উন্নতি বিধায়ে তকমা বিতরণ করা হয় সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ অধিক দিন অক্ষত থাকতে পারে না। সেদিক থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কদাচ কোন আদর্শই ছিল না, এবং পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীও আদর্শচ্যুত হয়েছে। দার্জিলিঙের পর্বতারোহণ সংস্থারও ভাগ্যান্বেষীদের ভিড় যত বেড়েছে—পাহাড়-পাগলরাও ততই সংস্থা থেকে বাদ পড়েছে। এমনটা অনিবার্য। তবে ভরসা এই যে, নিয়মের রাজত্ব থেকে ব্যতিক্রম কখনোই পুরোপুরি বাদ পড়তে পারে না।

ইনস্টিটিউটে শিক্ষাদানের ব্যাপারটিও কাট-ছাঁট করে—সব রকমের 'বাহুল্য' বর্জন করে—অফিসিয়াল ফর্মায় নিয়ে আসা হল। হঠাৎ ট্রাফলার হয়ে এসে কোন 'নবাবজাদা' যাতে 'মুক্তকচ্ছ' হয়ে না পড়ে। প্রবেশিকা ও স্নাতক দুটি কোর্সই চালু রইল। কিন্তু স্নাতক পর্যায়ে কামেট-ইবি গামিন প্রভৃতির মতো দুর্গম পাহাড়ে

যাওয়া বন্ধ হল। পরিবর্তে, এতদিন যে পর্বতাঞ্চলে প্রবেশিকা পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হত, সেই অধুনা-সহজলভ্য জোংরি'রই আশেপাশে স্নাতক পর্যায়ের কাজ চালিয়ে নেওয়া শুরু হল। দূর-দুর্গম পাহাড়ে প্রকৃত একটা অভিযান নিয়ে যাবার অনেক ঝুট-ঝামেলা সেজন্য অনেক পরিশ্রম এবং ততোধিক কল্পনা প্রয়োজন। অফিস ফাইলের গণ্ডিতে তার হিসেব-নিকেশ করা খুব কঠিন—তার চাইতে জোংরির চারধারেই কতো কতো পাহাড় রয়েছে, সামনেই পূর্বী র‍্যাটং হিমবাহ, পর্বতারোহণের যাবতীয় যত কিছু সেখানেই ডেমনস্ট্রেশন মারফৎ দেখিয়ে দিলে পর্বতারোহণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটা সামগ্রিক ধারণা দৃঢ়মূল হবে।

সেই সঙ্গে, হয়তো সকলের অজ্ঞাতে, আরেকটি জিনিসও বাদ পড়েছিল। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জয়াল একেবারে সহযাত্রী হয়ে যেতেন। একই সঙ্গে চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, খিস্তি-খেউড়। গুরু-শিষ্য নয়, বরং যেন দু-ক্লাস উপরের আর দু-ক্লাস নীচের ছাত্র—সকলেই শিক্ষার্থী। পরবর্তীকালের অধ্যক্ষরা যে কেউ কখনো কোর্সের সঙ্গে জোংরি পর্যন্ত যান না তা নয়, কিন্তু অফিসের এত কাজ! জয়াল কিন্তু অফিসের কাজের চাইতে পাহাড়ের পথ করতে অনেক বেশি ভালোবাসতেন, অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে করতেন। জয়ালের ছাত্ররা সাক্ষ্য দেবে: ওর কথা শুনলে পাহাড় সম্পর্কে কৌতূহল বাড়ত, আগ্রহ বাড়ত। জয়াল যাবার পর শিক্ষাদানের ব্যাপারটা ক্লাসরুম ও ল্যাবরেটরির মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। এতে অনেক সুবিধে। শেরপা ইনস্ট্রাক্টরগণও এখন সম্ভ্রান্ত সরকারী কর্মচারীর মতো ঘড়ি ধরে কাজ করেন। পুরো ব্যাপারটাই ছকের মধ্যে এসে যাওয়ায় এখন আর সমাবর্তন উৎসবের আগে ছাত্রদের গ্রেড ঠিক করতে কোন অসুবিধে নেই।

পর্বতারোহণের তকমা নিয়ে আসবার পর আমাদের পর্বতারোহীরা কী করেন, এবারে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। আগেই বলেছি, এদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ কিছু অসম-সাহসিক কাজ করেছেন—এখন আমরা তাদের কথা বিবেচনা করছি না। বাকী যারা বিপর্যয় পরিমাণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, পর্বতারোহণ ব্যাপারটিকে যারা এতদিন সরগরম করে রেখেছেন, এখন আমরা তাদের প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করব। প্রসঙ্গটা অপ্রিয় বলেই এতকাল এ-বিষয়ে অকপটভাবে কোন আলোচনা হয়নি। ওজর তোলা হয়েছে যে, ঘরের কথা যদি পাড়ায় রটে যায় তবে তাতে পর্বতারোহণ প্রয়াসেরই ক্ষতি হবে। কিন্তু দেহে রোগ থাকলে একদিন তা ফুটে বেরোবেই। রোগের কথা গোপন রাখলেও রোগের বিক্রিয়া চলতেই থাকে।

রোগ দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়।

এইসব তিপ্রোমাপ্রাপ্ত পর্বতারোহীদের কীর্তি-কাহিনী সময় মনে রাখবে না, কিন্তু সেসব কথা আমাদের স্মরণ করা ও স্মরণ রাখা দরকার। এদের সক্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন এক কলকাতাতেই পর্বতারোহী সভ্য সমিতির সংখ্যা এখন গোটা চল্লিশ অথবা তদূর্ধ্বে। এরা সবাই এক বা একাধিক পর্বতাভিযান করেছে বলে দাবী করে থাকে এবং দাবীর সপক্ষে কাগজ-পত্র দাখিল করতে সক্ষম। এদের মধ্যে কোন কোনটি দুর্গাপূজা, কালিপূজা, প্রজাতন্ত্র দিবস ইত্যাদি করতে করতে কালক্রমে পর্বতারোহণ ব্যাপারটিকেও সেই সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছে। বাকি অধিকাংশ দলই গড়ে উঠেছে দলছুটদের নিয়ে। পাহাড়ে গেল একটা পার্টি, ফিরে এল তিনটে পার্টি হয়ে—এরকম আখচার হয়েছে।

দলের সংখ্যা বেশি হলেই দলাদলিটা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও ষোলকলায় হয়েছে। রাজনীতি থেকে শুরু করে সব খেলায়, সব পেশায় আজকাল দলাদলিটাই বড় কথা। কিন্তু পাহাড়ের শুভ্রপটে ব্যাপারটা একটু বেশি অশ্লীল বলে প্রতীত হয়। এরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। অকারণে অপরের নামে কুৎসা রটায়। পারলে বাগড়া দেয়, না পারলে ফুঃ বলে নস্যাৎ করে দেয়। এদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোন রাস্তা নেই। একটা ব্রিটিশ অভিযানকে সাহায্য করবার জন্য সুইস জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান এক ডজন অভিযাত্রী দল এগিয়ে আসে। পর্বতারোহণের সেইটে স্বাভাবিক, পর্বতারোহণের সেইটে শিক্ষা। কলকাতায় বিধি-ব্যবস্থা ঠিক তার বিপরীত।

এই রেষারেষির অজস্র কারণ। মানুষমাত্রই নেতা হতে চায়, আমরা ভারতীয়রা নেতা ছাড়া আর কিছুই হতে চাই না। নেতা হলে একটু বিষয়-বৈভবও হয়ই। কিন্তু এমনকি চাকরির উন্নতি যদি নাও হয় তবুও পাড়ায় বা পরিচিত মহলে একটু খাতির হয়ই, নিদেন একটু আত্মশ্লাঘা,—যদু যদি নেতা হতে পারে আমি মধুই বা কম কিসে। পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা এই যে, এক্ষেত্রে ক্রিকেট ফুটবলের মতো দর্শকদের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করবার সুযোগও নেই, প্রয়োজনও নেই। পাহাড়ে গিয়ে তুমি যাই কর আর নাই কর ফিরে এসে একটা রোমহর্ষক রিপোর্ট দাখিল করলেই হল। অবলীলাক্রমে মিথ্যা বলতে পারলে আর কোন ক্ষমতার দরকার নেই।

রেষারেষির দ্বিতীয় কারণ, এদেশের অর্থ ও রসদের অপ্রতুলতা। এই গরীব দেশে বিত্তবান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সর্বত্র ছড়িয়ে নেই, তাদের মধ্যেও আবার

স্বভাব-ক্ষ্যাপা লাথে একজনও মেলে না। সেই তিনি যদি শ্যামের দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন তবে শ্যামের দল বৈতরণী পেরোবে কার ল্যাজ ধরে! শ্যামের দলকে অগত্যা ল্যাং মারবার রাস্তা করতেই হয়।

রেষারেষির আরও কিছু স্থূলতর কারণ আছে যার কতকগুলি আবার এই রেষারেষি থেকেই উদ্ভূত। ওই দলের সঙ্গে গিয়ে গতবার আমি শীর্ষে উঠবার সুযোগ পাইনি; গাধার মতো মাল বইয়েছে; নিজেরা উইলস্ ফিল্টার, আর আমাদের বেলা 'বাছুড়'; তাছাড়া, বিবেচনা করে দেখুন, নেতার হাত দিয়ে কত টাকা খরচ হল—আর তিনিও তো সত্যযুগের সেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নন! অতএব পাহাড় থেকে—ফিরে এসেই—অগত্যা—একটি দল তিনটি, তিনটি দল, নয়টি।

যেখানে সর্বস্তরেই এমন রেষারেষি সেখানে মাঝে মাঝে একটু গোলযোগ দেখা দেবেই। এদের কীর্তিকথা অমৃত সমান। এরা একে অপরের বিরুদ্ধে দিল্লি এবং দার্জিলিঙে দরবার করেছে। এরা গরীব মালবাহকদের ভাঁওতা দিয়েছে, পাওনা টাকা দেয়নি। এরা দুর্ঘটনার পর আহত অথবা মৃত সহযাত্রীদের পাহাড়ে ফেলে পালিয়ে এসেছে। অভিযান সংগঠনের পর এদেরই একজন নিজেদের অভিযানটিকেই বানচাল করবার জন্য বিবিধ রকম কসরৎ করেছে। অন্য দলের এক টিন সরষের তেল—অপর দল ধোঁকা দিয়ে—সংগ্রহ করে এনেছে। সবকিছুই পর্বতারোহণের উন্নতি বিধান, মহিমা বৃদ্ধির জন্য!

আর এইসব যাবতীয় জটিলতার কারণ একটাই। বৃহৎ কিছু সামনে না থাকলে তখন ক্ষুদ্র নিয়ে জড়িয়ে পড়তেই হয়। দার্জিলিঙের পর্বতারোহণ-স্কুলে পাহাড়ে চড়বার কায়দা-কানুন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পাহাড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজন নেই বলেই ব্যবস্থা নেই। পর্বতারোহণের কোর্স শেষ করলে চাকরির কথঞ্চিৎ উন্নতি হবে—সেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে এই চিন্তাটারই প্রাধান্য, সেখানে ডিগ্রীটাই গুরুত্বপূর্ণ, পাহাড়টা তুচ্ছ।

পাহাড়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো একটু কঠিন ব্যাপার। সেজন্য উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়, তারাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, বিপদে পড়ে ইষ্টনাম জপতে হয়, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে হয়, আরও কত কি! সেসব জিনিস কোন কোর্সে ঢোকান যায় না। হিমালয়ের সঙ্গে সত্যকার পরিচয়ের কোন সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীদের মনে হিমালয় সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা হয়। সেটাই স্বাভাবিক। জন্মের সময় আপনি আচরি একটা জিনিস

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বভাবে গেঁথে দেওয়া হত : পাহাড় অপরিচ্ছন্ন করা চলবে না। শিবির গোটাবার পর শিবিরের জায়গাটি খুব তন্নতন্ন করে সাফ করতে হয় প্রতিদিন, প্রতিবার। এই সাধারণ পাঠটুকু হয়তো আজও কোর্সে আছে। কিন্তু পাহাড়কে শ্রদ্ধা করতে না শিখলে, দেবস্থান বলে না জানলে, পাহাড়কে পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখবার কথা কিছুতেই মনে থাকতে পারে না। পাহাড়ের প্রতি শ্রদ্ধা নেই বলেই পাহাড়ে গিয়ে ইতরামি করবার এমন অবাধ স্বাধীনতা।

এর আরও একটা কারণ আছে। দিল্লির অনুমতি এবং অর্থসাহায্য আর দার্জিলিঙের মদত না হলে আজ আর এতদঞ্চলে কোন পর্বতাভিযান কোনক্রমেই সম্ভব নয়। দিল্লির এবং দার্জিলিঙের প্রবীণ আমলারা পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হলে তবেই অভিযান—নয়তো মানচিত্র সামনে রেখে স্বপ্ন দেখ! এখন এই আমলাদের সন্তুষ্ট করবার একটা কায়দা আছে। কায়দাটি খুব কঠিন নয় : আত্ম-সম্মানের মুখে ছাই দিয়ে অম্লান বদনে তোষামোদ করা। এদেশের শিবতুল্য আমলারা ওই এক তর্পণেই তুষ্ট হন। সেই সঙ্গে যদি সরকারী দপ্তরে ফাইলের ভ্রমণপথটা আর চটিগুলোর নাম জানা থাকে তবে আর অভিযান কে আটকায়! এই দুই বিষয়ে যারা ওয়াকিবহাল তাদের আর এখন অভিযান করতে কোন অসুবিধে নেই। এই দুই বিষয়ে যারা পারদর্শী তারা প্রকৃত পর্বতারোহী হতেই পারে না—তাদের ডিগ্রী এবং সার্টিফিকেট যতই অকাট্য হোক না কেন। সেজন্যেই পাহাড়ে এত গণ্ডগোল।

তবে করিৎকর্মা ব্যক্তিরা যেমন গণ্ডগোল বাধাতে জানে তেমনি গণ্ডগোল চাপা দিতেও জানে। সত্য যে গোপন করতে পারে, চোখের পলক না ফেলে—মিথ্যাকেও সে সত্য বলে চালাতে পারে। পাহাড়ের ধারে কাছেও গেলাম না, ফিরে এসে রোমহর্ষক কল্পনায় ফুলিয়ে একখানা চোস্ত রিপোর্ট দাখিল করলাম, পাহাড়ে চড়ে এসেছি। বিদেশে কচিৎ-কদাচিৎ প্রয়োজন হয়, তবুও সেখানে অনেক অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান আছে যারা মতানৈক্য নিরসনের জন্য অভিযানের সত্যাসত্য যাচাই করে দেখে। এদেশে অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। করা হয়নি, তাই নেই। থাকলেও সকলেরই প্রচণ্ড অসুবিধে হত।

এবারে আবার প্রথম সূত্রে ফিরে আসা যাক। দার্জিলিঙের হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থা এদেশে পর্বতারোহণের সূচনা করে। এই সংস্থারই উদ্যমে এবং উদ্যোগে ভারতীয় পর্বতারোহণের আজ এমন জগৎ-জোড়া স্বীকৃতি। এই সংস্থার সহায়তাতেই ভারতে পর্বতারোহণের আজ এমন জনপ্রিয়তা। এই সংস্থার গৌরবময় সব কীর্তি-কাহিনী এই রজত-জয়ন্তী বর্ষে সবার বহু ভাষায় ঘোষিত হবে। এবং

এসবের মধ্যে এককণাও অতিরঞ্জন নেই।

কিন্তু তাহলেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই প্রবন্ধে কেন পর্বতারোহণের খারাপ এবং নেতিবাচক দিকগুলো এমন উৎকটভাবে বর্ণনা করা হল? শ্রদ্ধা মাপবার তো কোন থার্মোমিটার নেই, তবে কেমন করে স্থির-সিদ্ধান্ত হল যে, আমাদের পর্বতারোহীরা পর্বতকে শ্রদ্ধা করে না, ভালোবাসে না? পাহাড়ের সঙ্গেই যদি পরিচয় নেই, তবে এরা এত কঠিন কঠিন পাহাড়ে চড়ে কেমন করে?

প্রশ্নগুলো খুবই জোরালো তবে প্রত্যেকটার জবাব আছে। আজকাল সবকিছুই টাকা এবং যন্ত্রের বশ—হিমালয়ও। শরীর এবং বয়সটা যদি ঠিক থাকে, তবে আজ যেকোন ব্যুরোক্রাটও এভারেস্ট শীর্ষ থেকে ঘুরে আসতে পারে—কেবল প্রিসিডেন্স দেখে এগোতে জানলেই হল। পর্বতারোহণের ক্ষেত্রেও আজ বসনটা রাঙাবার রেস্ত থাকলেই হল, মন রাঙাবার কোন প্রয়োজন নেই।

আর পর্বতের প্রতি যে এদের তেমন শ্রদ্ধা-ভালবাসা নেই তার প্রমাণ—কুকুরটা ডাকছে না। পঁচিশ বছর ধরে এত সব কঠিন কঠিন নতুন নতুন পাহাড় জয় করা হল, কত দুর্ঘটনা, ক্যাম্প-ফায়ার, কত দুঃখ, কত আনন্দ, কত বিস্ময়, কত উল্লাস—অথচ সেসব নিয়ে আজও পর্যন্ত একটিও মর্মস্পর্শী গ্রন্থ রচিত হল না। একটা ছবি আঁকা হল না, একটা কবিতা লেখা হল না। যাকে দেখলে মূকের বাচাল হবার কথা, সেই হিমালয় বারম্বার চষে আসবার পরেও নট কিচ্ছু! কারণটা ওই: যাকে শ্রদ্ধা করি না সে আমাকে অনুপ্রাণিত করে না, যাকে ভালোবাসি না তাকে নিয়ে কবিতা লিখি না। ধর্ষণ কখনো মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হতে পারে না।

দার্জিলিঙের হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থার এইটে রজত-জয়ন্তী বর্ষ। আমাদের প্রার্থনা ছাড়াই এই সংস্থার আয়ু অক্ষয় থাকতে বাধ্য। প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের ব্যয় যত বাড়বে এই সংস্থারও ততই প্রসার ঘটবে। আরও অনেক অভিযান হবে, আরও অনেক পাহাড়ে আমাদের পতাকা উড়বে।

কিন্তু সেসবকে আমরা যেন প্রকৃত পর্বতারোহণ বলে ভ্রম না করি।

পর্বতারোহণের ইতিহাসে সবচাইতে গৌরবময় দিনটি হল—২৯ মে, ১৯৫৩। ভারতবর্ষের টেনজিং নোরগে ও নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড হিলারি ওইদিন এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেন। ঘড়িতে তখন সময় বেলা এগারোটা বেজে ত্রিশ মিনিট।

এভারেস্ট-শীর্ষকে একসময়ে সমীহ করে বিশ্বের তৃতীয় মেরু বলে অভিহিত করা হত। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে তার অনেক আগেই মানুষের বিজয় পতাকা পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই তৃতীয় মেরুতে পৌঁছবার জন্ত মানুষকে দীর্ঘতরকাল জুড়ে কঠিনতর সাধনা করতে হয়েছে। সেই সাধনা যেদিন সার্থকতা লাভ করল—সেই ২৯ মে, ১৯৫৩—সেদিন চতুর্দিকে সেকি আনন্দ আর বিস্ময়! পর্বতারোহণের সঙ্গে যাদের কোনও সম্পর্ক নেই সেসব মানুষরাও সেদিন সেই আনন্দ আর বিস্ময়ের সমান অংশীদার হয়েছিল। পরবর্তীকালে চাঁদে পদার্পণ করার পরেও মানুষ আর কখনো মানুষ হিসেবে অতটা গর্ব বোধ করেনি।

সব বড় কাজই শুরু হয় খুব নিরীহভাবে। ১৮৫২ সালে দেরাদুনের জিও-লজিক্যাল সার্ভে অফিসের একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কেরানি—জনৈক হেনেসি—নিত্যদিনের রুটিন কাজ করতে করতে দেখলেন, মানচিত্রে পীক-১৫ নম্বর দেওয়া যে পর্বতশৃঙ্গটি রয়েছে যোগ বিয়োগ করে সেটির উচ্চতা দাঁড়ায় উনত্রিশ হাজার দুই ফুট। তার আগে পর্যন্ত ২৮,১৪৬ ফুট উঁচু কাঞ্চনজঙ্ঘাকেই পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ বলে মনে করা হত। এরপর পীক-১৫-র জন্ত একটা যথোপযুক্ত নামের প্রয়োজন পড়ল। পর্বতটিকে যে অনেকদিন আগে থেকেই তিব্বতীরা চোমোলুংমা বা জগন্মাতা নামে পূজো করে আসছে সেকথা তখনো জানা ছিল না। নামকরণ নিয়ে অবশ্য কোন সমস্যায় পড়তে হল না। অর অল্পদিন আগেই স্তার জর্জ এভারেস্ট ভারতবর্ষের সার্ভের জেনারেলের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তার নামেই পৃথিবীর উচ্চতম গিরি শৃঙ্গটির নাম রাখা হল—এভারেস্ট।

আবিষ্কৃত এবং নামাঙ্কিত হবার পরে আরও অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এই বিশ্বের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গটি লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেল। ইউরোপে পর্বতারোহণের সেটা একেবারে শৈশবকাল। ইংল্যাণ্ডের অ্যালপাইন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সনে। নামেই প্রকাশ, তখনো কেউ কল্পনাই করতে পারেনি যে, আল্পস

পর্বতমালার বাইরেও এই ক্লাবকে কোনদিন কোন অভিযান সংগঠন করতে হতে পারে।

আল্পস পর্বতমালার চোখ ধাঁধানো দুর্গমতা এবং রহস্যগুলো ভেদ করবার পর সাহেবদের নজর পড়ল হিমালয়ের উপর। ১৯০৭ সালে অ্যালপাইন ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সময় গোর্খা ব্রিগেডের জেনারেল চার্লস ব্রুস প্রশ্নের আকারে প্রস্তাব করলেন, এভারেস্ট পর্বতে আরোহণ করা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

এভারেস্ট তখনও পর্যন্ত কেবল মানচিত্রেই চিহ্নিত রয়েছে। তার চতুর্দিকে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে, কোন্ দিক দিয়ে গেলে তার পাদমূলে পৌঁছানো যায়—সেসব সম্পর্কে তখনও কারো কোন ধারণাই নেই। সর্বোপরি তিব্বত এবং নেপাল দুটোই তখন 'নিষিদ্ধ দেশ'। তবুও যে প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছিল তার কারণ, এর মাত্র দু'বছর আগেই স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে কিছুটা রক্তপাতের পর তিব্বতের রাজধানী লাসা অবরোধ করে দালাই লামার সঙ্গে ব্রিটিশদের একটা সৌহার্দ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু পর্বতারোহণের মত একটা উদ্ভট ব্যাপার নিয়ে ব্রিটিশ-রাজ তখনই দালাই লামাকে উত্যক্ত করে তুলতে রাজি হলেন না। প্রথম উচ্চারিত হবার পর এভারেস্ট আরোহণের প্রশ্নটি সুদীর্ঘ বারো বছর ধামা চাপা পড়ে রইল।

অবশেষে বরফ গলতে শুরু করল ১৯১৯ সালে। ততদিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাধা হবার পর ব্রিটিশদের আবার এভারেস্টের কথা মনে পড়ল। সেই বছরই স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং প্রধানত স্যার ফ্রান্সিসের উদ্যমেই এভারেস্টের স্বপ্নটা ধীরে ধীরে আকার গ্রহণ করতে লাগল। এখনকার দিনে এই একটা জিনিস ঘটতে দেখা যায় যে, সত্যকারের বড় কোন একটা কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে হাত লাগালে তখন চতুর্দিক থেকেই অনুকূল হাওয়া বইতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ স্যার চার্লস বেল তখন ব্রিটেনের রাজনৈতিক দূত হিসেবে সিকিমে অবস্থান করছিলেন—রাজনৈতিক কারণেই মাঝে মাঝে তাকে লাসা যেতে হত। প্রধানত স্যার চার্লসের চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত দালাই লামা ব্রিটিশদের এভারেস্ট আরোহণ করবার অনুমতি দিলেন। সেদিন তারিখ ছিল ৯ ডিসেম্বর, ১৯২০। সে খবর লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছল ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ব্রিটেন উন্মুখ হয়েই ছিল। এভারেস্ট অভিযানের মত বিরাট বিশাল কিছু করতে হলে সেজন্য অনেক হিসেব-নিকেশ, অনেক উদ্যোগ-আয়োজন,

এক কথায় অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তখনো পর্যন্ত এভারেস্ট অভিযানের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কারো কোন ধারণাই ছিল না। আল্পস ও হিমালয়ের মধ্যে যে উচ্চতা ছাড়াও চরিত্রগত অনেক পার্থক্য আছে সে কথাটাই তখনো জানা ছিল না। আজকের হিসেবে ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত হঠকারিতা বলে মনে হবে, কিন্তু ব্রিটিশরা মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তৈরি হয়ে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে খোদ দার্জিলিংয়ে এসে হাজির হল।

এই প্রথম এভারেস্ট অভিযানের নেতা ছিলেন কর্নেল হাওয়ার্ড ব্যুরি। অভিযানটির সংগঠনায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ চরিত্রানুগ। এর সামগ্রিক দায়িত্ব ছিল সামরিক বাহিনীর অফিসারদের উপর। দলের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন বিজ্ঞানী। আর অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্য দু'জন প্রবীণ ও দু'জন নবীন পর্বতারোহীকে দলে নেওয়া হয়েছিল। প্রবীণদের একজন—ডাঃ কেলাস—মূল শিবিরে পৌঁছবার আগেই পথিমধ্যে মারা যান। নবীনদের একজন ছিলেন জর্জ ম্যালোরি। এঁর কথায় পরে আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে।

দার্জিলিং থেকে এভারেস্টের উত্তরের দরজায় পৌঁছতে তখন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হত। কালিম্পং হয়ে, জেলেপ-লা অতিক্রম করে, চুম্বি উপত্যকা পেরিয়ে তিব্বতের শুষ্ক শীতল জনহীন প্রান্তরের উপর দিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলবার পর পূর্বী রোংবুক হিমবাহ। উত্তরদিক থেকে এভারেস্টের উত্তর গিরিশিরায় পৌঁছবার একটিই পথ—সেটি এই পূর্বী রোংবুক হিমবাহ অনুসরণ করে। এর মোহনায় অভিযানের মূল শিবির স্থাপন করা হয়।

এই প্রথম এভারেস্ট অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল শীর্ষে আরোহণের একটি পথ খুঁজে বের করা। তারপরে সম্ভব হলে এভারেস্ট। এভারেস্ট পর্বতগোষ্ঠীর চতুর্দিকে ছোট, বড় অজস্র হিমবাহ। তার মধ্যে কোন্‌টি ধরে অগ্রসর হলে শীর্ষে পৌঁছন সম্ভব হতে পারে সেটি স্থির করা বড় সহজ কাজ নয়। প্রকৃত পর্বতারোহী বলতে দলে ছিলেন মাত্র দু'জন ম্যালোরি ও বুলক—দু'জনেরই হিমালয়ে এই প্রথমবার আসা। ষোল হাজার থেকে সতেরো হাজার ফুটের উচ্চতা দিয়ে মাসাধিককালে পথাতিক্রমণের পর সেই প্রথম অভিযানই যে তারা কেমন করে সঠিক হিমবাহটিকে খুঁজে বের করেছিলেন তা ভাবলে থই পাওয়া যায় না। মানুষের শক্তির কি কোন সীমা নেই?

১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশরা তিব্বতের দিক থেকে মোট আটটি এভারেস্ট অভিযান সংগঠন করে (এর মধ্যে ১৯২৫ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত

আট বছর অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে কোন অভিযান হয়নি)। দার্জিলিং থেকে পথ খুঁজতে খুঁজতে এসে প্রথম অভিযানেই এভারেস্টের নর্থ কল পর্যন্ত আরোহণ করা হয়েছিল। দুটো শীর্ষের মাঝখানে যেখান থেকে গিরিশৃঙ্গটি দু'দিকে দুটো শীর্ষের দিকে উঠে গেছে পর্বতারোহণের আন্তর্জাতিক পরিভাষায় সেই জায়গাটির নাম কল (সি ও এল)। পরবর্তী প্রত্যেকটা অভিযানেই এক বা একাধিক সদস্য, একবার বা একাধিকবার, নর্থ কল অতিক্রম করে উত্তরের গিরিশিরা ধরে আটাশ হাজার ফুট বা তার কাছাকাছি উচ্চতায় আরোহণ করেছে। কিন্তু পই পর্যন্ত, প্রতিটি অভিযানই লক্ষ্যের একেবারে দরজা থেকে ব্যর্থ প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে। প্রতিটি ব্যর্থতারই তাৎক্ষণিক কিছু না কিছু যুক্তি ছিল, প্রতিবারই কোন কোন একটা ব্যাঘাত ঘটেছে, এসব ক্ষেত্রে যেমন ঘটতেই পারে। প্রত্যেকবারের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা উত্তমরূপে পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রত্যেকটি পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয়েছে কিন্তু সেই আটাশ হাজার ফুট পর্যন্ত, তালগাছের শেষ আড়াই হাত আর অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।

প্রচলিত বিচারে ব্যর্থ হলেও প্রত্যেকটি অভিযানই কিন্তু পরিপূর্ণরূপে সার্থক হয়েছিল। এই ব্যর্থ অভিযানগুলোর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের হিমালয় অভিজানের যাবতীয় আচারবিধি একটা ঐতিহ্যের মত হয়ে গড়ে উঠেছে। এখন মনে হয়, তাৎক্ষণিক কারণ যাই হোক না কেন, এইসব ব্যর্থতার পিছনে হয়তো কোন একটা মহৎ বা দৈব পরিকল্পনা ছিল।

আজও পর্যন্ত যে উপায় ও পদ্ধতিতে হিমালয় অভিযান সংগঠিত ও সঞ্চালিত হয় তার মৌলিক কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল এইসব অভিযানের মধ্য দিয়ে এভারেস্টের উত্তরের পর্বতগাত্রে। অনেকের অনেকরকম সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া যে হিমালয় অভিযান সম্ভব নয়—এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হলে সেই সহযোগিতার হাতগুলো আপনা থেকেই যে প্রসারিত হয়—এরা তা সুনিশ্চিত করেছিলেন। পর্বতের সুদূর উচ্চতায় কোন বড় মাপের দুর্ঘটনা কেমন করে তার মোকাবিলা করতে হবে, কতদূর পর্যন্ত উদ্ধতভাবে উঠে যাওয়া চলবে এবং কোথা থেকে নম্রচিত্তে নেমে আসতে হবে, সঙ্গের লোকজন সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কোন অবস্থায় কেমনধারা আচরণ করতে হবে, বারংবার পরাজিত হয়েও কেন হতাশ হওয়া চলবে না, এই সবকিছুই, এবং আরও অনেক কিছু, প্রথম যুগের এই এভারেস্ট অভিযাত্রীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে।

কিন্তু এদের সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে মূল্যবান আবিষ্কার শেরপা নামে

একটা মহৎ উপজাতি। নিজেদের অজান্তে এবং জগৎ-সংসারের অজান্তে এই শেরপারা এভারেস্টের দক্ষিণ গিরিগাত্রের কাছাকাছি প্রায় তিন চার শত বছর ধরে একটা ব্রতের আয়োজন করছিল। এভারেস্ট অভিযাত্রীরা যখে এসে দাঁড়াবার পর শেরপাদের সেই ব্রত সার্থক হয়ে উঠবার পথ খুঁজে পায়। ঘটনাটিকে একটু ক্ষুদ্রাকারে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

এককথায় বলতে গেলে প্রথম যুগের এইসব অভিযাত্রীরা মানুষের অধিকারকে বেশ কিছুটা প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। এইসব অভিযানগুলোকে নিয়ে লেখা বইগুলো এই সার্থকতার স্পর্শে ইংরেজি সাহিত্যে আজও ক্লাসিক বলে গণ্য হয়।

এই দুঃসাহসিক সাধনা সম্পূর্ণ হবার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল। পর্বতারোহণ শিকেয় তুলে বিশ্বজুড়ে মানুষে মানুষে কাটাকাটি মারামারি শুরু হয়ে গেল। সুদীর্ঘ বারো বছর পরে আবার যখন হিমাচলের উপর থেকে যবনিকা সরল, তখন দেখা গেল হিমালয়ের উত্তরের দরজায় শক্ত আগল পড়েছে, কিন্তু দক্ষিণের দরজা একটু আলতোভাবে খোলা।

এতকাল ব্রিটিশদের একটা সুবিধে ছিল এই যে, অন্য কোন দেশের অভি-যাত্রীদের তিব্বতে প্রবেশের হুকুম ছিল না। নিজেদের দুঃসাহসিক সাধনাটা ওরা সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু নেপালের সঙ্গে ব্রিটেনের কোন সখ্যতা চুক্তি ছিল না। নেপালের আগল একটু আলগা হতেই বিশ্বশুদ্ধ সবাই তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সকলেরই নজর এভারেস্টের দিকে।

১৯৫০-৫১ সালেই একটি আমেরিকান ও একটি ব্রিটিশদল এভারেস্টের দক্ষিণ-গাত্রটি কাছে থেকে দেখবার জন্য নেপালে এসে হাজির হল। এর আগে এভা-রেস্টের উত্তর গিরিশিরা থেকে ঝুঁকে পড়ে ম্যালোরি, স্মাইথ, টিলম্যান, শিপটন প্রমুখরা এদিকটায় চোখ বুলিয়ে দেখেছিলেন—কেউ এতটুকু ভরসা পাননি। প্রথমে সুদীর্ঘ ও উত্তাল খুমবু হিমবাহ, তারপরে মাইল দুয়েক জুড়ে খুমবু হিমপ্রপাতের বিরাট বিশৃঙ্খলা, তারও পরে ওয়েস্ট বেসিন মানে ডেকচির মত একটি তুষারক্ষেত্র সেটির পরে লোটসে পর্বতগাত্রের সুমসৃণ বীভৎসতা এবং তারও পরে আরও কী যে আছে বা থাকতে পারে তা কল্পনা করলেও গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু আমেরিকানরা আর ব্রিটিশরা নিকটে এসে দেখলেন যে ব্যাপারটি সত্যিই ততটা বীভৎস নয়।

১৯৫২ সালে এভারেস্ট অভিযান করবার বরাত পেয়েছিল সুইজারল্যাণ্ড এবং ১৯৫৩ সালে বৃটেন। মরিয়া হয়ে সুইসরা একই বছর বর্ষার আগে ও পরে দু-দুটো অভিযান করেছিল। প্রথম অভিযানে দলের একজন সদস্য ও একজন

শেরপা—যেমন্ও ল্যামবেয়ার ও টেনজিং নোরগে—২৮,২৫০ ফুট পর্যন্ত উঠে তারপর আর এগোতে পারেননি। প্রবল হাওয়া আর প্রচণ্ড তুষারপাতে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। অক্সিজেন সেটগুলিও ঠিকমত কাজ করেনি।

১৯৫৩ সালে ব্রিটিশদের অবস্থা হল—এবারে, আর নয়তো কখনোই নয়। এই কথা মনে রেখেই টিলম্যান ও শিপটনকে বাদ দিয়ে অভিযানের নেতা করা হল একজন দুঁদে সামরিক অফিসারকে—কর্নেল জন হান্ট। অভিযানটিকে সংগঠিত ও সঞ্চালিত করা হল হুবহু একটা যুদ্ধ অভিযানের মত। সবরকম বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে পাহাড়টিকে প্রায় অবরোধ করে ফেলা হল। অভিযানের বৎসরাধিককাল আগে লণ্ডনে বসে যে সময় নির্ঘণ্ট তৈরি করা হয়েছিল তার থেকে এতটুকুও বিচ্যুত না হয়ে যথাসময়ে সাউথ কল-এ অষ্টম শিবির স্থাপন করা হল। অভিযানের প্রবীণ বয়স্ক নেতা জন হান্ট এবং ততোধিক প্রবীণ বয়স্ক শেরপা ডা নামগিয়াল ২৭,৩৫০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় মাল পৌঁছে দিয়ে এলেন নবম শিবিরের জন্য—যে শিবির থেকে শীর্ষ-অভিযান করা হবে। শীর্ষ অভিযানের জন্য তিনটি অথবা ততোধিক জুড়ি আগে আগে থেকে ঠিক করা ছিল। প্রথম জুড়িতে ছিলেন ব্রিটেনের চার্লস ইভান্স ও টম বুর্দিলোঁ। এরা এভারেস্টের সাউথ পিক-এ আরোহণ করেন, কিন্তু তারপরে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ফিরে আসবার সময় পিঠের বোঝা কমাবার জন্য এরা দুটো অক্সিজেন সিলিণ্ডার পথে ছেড়ে আসেন।

দ্বিতীয় জুড়িতে ছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড হিলারি ও ভারতের টেনজিং নোরগে। আটাশ হাজার ফুটের কাছাকাছি নবম শিবিরে আটাশে মে রাতটা ওরা একরকম জেগেই কাটিয়ে দিলেন। টেনজিংয়ের অবশ্য এইখানে এটাই প্রথমবার নয়। ঠিক এক বছর আগে সুইসদের সঙ্গে এসে ওকে এখানে আরও একটি রাত কাটাতে হয়েছিল। সেবারে আবার সঙ্গে কোন স্লিপিং ব্যাগ বা এয়ার ম্যাট্রেস ছিল না—ঠাণ্ডায় যাতে দেহের রক্ত জমে না যায় সেজন্য সারা রাত লাম্বেয়ারের সঙ্গে ঘুষোঘুষি করতে হয়েছিল। সেদিক থেকে এবারের রাতটি মোটামুটি শান্তিতেই কাটল—ভয় বলতে কেবল তাঁবুটা যেকোন সময় হাওয়ার ঝাপটে উড়ে যেতে পারত।

রাত থাকতে উঠে টেনজিং গরম পানীয় তৈরি করলেন। তারপর ওই স্টোভের আগুনে জমে যাওয়া জুতো সেঁকে নিলেন—এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শীর্ষ অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। ইভান্সরা গতকাল যে রাস্তা বানিয়েছিল আজ আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু প্রথম জুড়ির ক্ষীণ পথরেখা অনুসরণ করেই দ্বিতীয়

জুড়ি বেলা নয়টার মধ্যে সাউথ পিক-এ পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে সামান্য একটু নেমে যাবার পরই সামনে এভারেস্ট শীর্ষের শেষ চড়াই—সাহেবরা যাকে বলে লাস্ট অবস্ট্যাকল।

এই পর্যন্ত এসে হিলারি একবার টেনজিংয়ের দিকে তাকালেন—সম্ভব হবে? এখানে কথা বলা মানে শক্তির অপচয় করা, আকারে ইঙ্গিতেই কাজ চালাতে হয়। জবাবে টেনজিং একবার অক্সিজেন মাস্কের মধ্যেই দাঁত বের করে হাসল, যার মানে সাহেব যদি সাহস করেন তাহলে এই অধমও সঙ্গে আছে।

হিলারির অনুমান, এভারেস্ট শীর্ষের এই শেষ চড়াইটারও খাড়াই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মত। প্রতি পদক্ষেপে হাঁফ ধরে যায়। তবে হাওয়ার দাপট থাকলেও আবহাওয়া আজ মোটামুটি ভালই। পথ কেটে কেটে, একজন একজন করে, অগ্রসর হতে হয়। কখনো আগে টেনজিং, কখনো হিলারি। থেকে থেকেই আইস-অ্যাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ে ফোঁস ফোঁস করে অনেকক্ষণ দম নিতে হয়। মাঝে মাঝে তুষারাচ্ছন্ন গগলসের ভিতর থেকে দৃষ্টি বিনিময় করে একে অপরকে আশ্বাস দেন—আরো একটু শক্তি এখনো অবশিষ্ট আছে। আরোহণের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যেন এ পথের আর শেষ নেই। আরোহণ করতে করতে অবশেষে হঠাৎ একসময় চড়াইটা শেষ হয়ে যায়, পাহাড়টাই শেষ হয়ে যায়—তখন চারিদিকে কেবল আকাশ আর আকাশ।

অনেকে আজও প্রশ্ন করেন, এভারেস্ট শীর্ষে প্রথমে কে উঠেছিলেন, হিলারি না টেনজিং? প্রশ্নটা কেবল তুচ্ছ নয়, হাস্যকরও। রিলে করতে করতে উঠে একদম শেষের ধাপে কে আগে ছিলেন তাতে কি-ই বা এসে যায়। তবু যারা খুঁতখুঁত করেন তাদের অবগতির জন্য বলা দরকার যে, এভারেস্ট শীর্ষে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন এডমণ্ড হিলারি। স্বয়ং টেনজিং তার আত্মচরিতে একথা জানিয়েছেন।

টেনজিং আর হিলারির এই জয়টাই তো প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে প্রসারিত একটা সুদীর্ঘ রিলে রেসের একেবারে শেষ ধাপ।

গোড়ার কথা

পর্বতারোহণ মানে তা নিয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা ভালোবাসা নয়। আমাদের পর্বতারোহণ যেন ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাওয়া। আর এর জন্য যে কত নিষ্ঠা, সাধনা ও জীবন বিসর্জন দিতে হয়—সে ধারণাও এদেশে গড়ে ওঠেনি। কেন? কারা দায়ী? আমাদের জ্ঞানের অভাব? না, প্রতিরক্ষা বিভাগের আমলাতন্ত্রীরা এর প্রশাসক বলেই?

বড়ই পরিতাপের কথা যে ভারতীয় পর্বতারোহণের আজও একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠল না। অথচ এ বছর প্রয়াসটি পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। প্রয়াসটি শিশু, প্রয়াসটি নাবালক এইসব ছেঁদো কথায় আজও চিঁড়ে ভেজাবার চেষ্টা করা বৃথা। কীর্তির পরে কীর্তি জড়ো করতে করতে অবশেষে অবশ্যই একটা ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে যাবে বলে যারা আশা করছেন তাদের হিসেবেও বিস্তর প্রমাদ আছে। ঐতিহ্য গড়ে তোলবার রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।

যে কোন বড় মাপের কাজের জন্যই সকলের আগে দরকার একটি সুদৃঢ় এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য। ঐতিহ্য কথাটা একটু খটমট ঠেকতে পারে, কিন্তু সাদা বাংলায় এর মানে হল—সুদীর্ঘকালের কোন সাধনার সুফল। অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা, অনেক ব্যর্থতা, অনেক হতাশা, অনেক উৎসাহ, অনেক উচ্ছ্বাস, অনেক শূন্যতা এবং আরও অনেক অনেক কিছু সুদীর্ঘকাল ধরে জাড়িত হতে হতে অবশেষে ঐতিহ্য তৈরি হয়। পোক্ত ভিত না হলে যেমন উঁচু ইমারত হয় না; তেমনি ঐতিহ্যাশ্রিত না হলে অনেক কালের, অনেক পুরুষের ঐতিহ্যটিকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাবার দুর্দান্ত তাড়া না থাকলে—কোন মহৎ কাজ করা বা বড় মাপের কাজ করা সম্ভব হয় না।

ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ইতালি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এমনকি জাপান প্রভৃতি প্রত্যেকটি দেশের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি করে পর্বতারোহণ ঐতিহ্য আছে। এর প্রমাণ বহুরূপে সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। পাহাড় থেকে ফিরে এসে এরা পরস্পরের সঙ্গে খেয়ো-খেয়ি করে না, নির্জনে বসে নিজনিজ অভিজ্ঞতা নিয়ে, সততার সঙ্গে একটি করে বই লিখে ফেলে। এদের চলা-ফেরা দেখলেই বোঝা যায় যে, এদের পায়ের তলায় সুদৃঢ় ঐতিহ্য আছে। অপরদিকে, অনেক ভারতীয় পর্বতারোহীর কাছেই পর্বতারোহণে যাওয়াটা

অনেকটা ট্যুরে যাবার মতো—ছুটিতে অথবা সরকারী কাজে। পাহাড় থেকে নেমে এসে এরা অন্য সব বিষয়েই কথা বলে, এক পাহাড় ছাড়া। চর্বিত-চর্বন জুটো একটা বই বেরোয়, সেগুলোতে চোয়া ঢেকুরের গন্ধ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে একটি ব্রত উদ্‌যাপনের যে আনন্দ তার কোন লক্ষণই ভারতীয় পর্বতারোহীদের মধ্যে দেখা যায় না। কারণ, এদের কোন ঐতিহ্য নেই। ঐতিহ্যের সুতোটি নেই বলেই পর্বতারোহণে এদের বড় বড় সব কীর্তিগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে—একটি বরমাল্য গ্রথিত হয়নি। অন্য সব দেশে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ছোট বড় সব অভিযান মিলিয়ে আসলে একটাই অভিযান। এদেশে এরা সবাই পৃথগন্ন—দলাদলির দাপটে অনেক অভিযানেই আবার একাধিক হাঁড়ি। এমনভাবে প্রতিপদে অপদস্থ হবার কারণ একটাই—ভারতীয় পর্বতারোহীদের কোন ঐতিহ্য নেই।

ইউরোপের দেশগুলির এ ব্যাপারে একটা কমন ব্যাকগ্রাউণ্ড মানে সাধারণ পশ্চাৎপট আছে। শতাধিক বছর আগে যেসব ইউরোপীয় পথিকৃত একাজ শুরু করেন, তারা ইংলিশম্যান, জার্মান বা ফ্রেঞ্চম্যান ছিলেন না—তারা ছিলেন সত্যকারের ইউরোপীয়ান। তখনকার দিনে অনেক অভিযানেই একাধিক দেশের লোক থাকত; আজকের দিনে এমন ঘটনা আন্তর্জাতিক অভিযান নামে অভিহিত হত। আল্পসের রৌদ্র ও তুষার ঝটিকায় এইসব প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের যে সাধনা —তার পুণ্যফল ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী বণ্টিত হয়েছে।

এরপর যখন ইউরোপীয় পর্বতারোহীদের সাধন-ক্ষেত্র আল্পস অতিক্রম করে হিমালয়ের দিকে প্রসারিত হল তখন এই ঐতিহ্য তাদের রক্ষাকবচ হয়ে রইল। রক্ষা-কবচও বটে আবার নব নব দিগন্ত উন্মোচনের সুদর্শন চক্রও বটে। ইউরোপ থেকে সাত সমুদ্র পেরিয়ে হিমালয় অভিযান মানে একটা এলাহি কারবার—রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতির জটপাকানো অজস্র সমস্যার জট না খুলে সে-কাজ সম্ভব নয়, এজন্য প্রতিপদে রাষ্ট্রনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু পর্বতারোহণের মতো আপাত অর্থহীন খেয়ালের জন্য টাকা অথবা শক্তি অপচয় করবার ব্যবস্থা কোন রাষ্ট্রনীতিতেই নেই, থাকতে পারেও না। নিষ্কামের অন্তত একটু ছোঁয়া না থাকলে পর্বতারোহণ হয় না, আর রাষ্ট্রনীতিতে কামগন্ধটাই আসল এবং অদ্বিতীয়। হাতে হাতে কিছু লাভের আশা থাকলে রাষ্ট্রনীতি তখন কেবল পর্বত অভিযান কেন, মহাকাশ অভিযানেরও খরচ জোগাতে প্রস্তুত। এমন অবস্থায় এক আপোস-রফা করতেই হয়। বিদেশী পর্বতারোহীরা সেই থেকে নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ধ্বজা সঙ্গে নিতে শুরু করল।

এই সুন্দর পথে বেশকিছু ঘোলা জল পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে ঢুকে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বৃটেনের পর্বতারোহীরা শক্ত হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতাকা উচ্চে তুলে ধরে আছে। এভারেস্ট বিজয়ের ঐতিহাসিক সংবাদটি মহারানীর অভিষেক উপলক্ষ্যে ঘোষণা করা হবে বলে চেপে রাখা হয়েছিল—ওইটুকু প্রতিদান না পেলে রাষ্ট্র তো আর জনগণের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে না।

পরবর্তীকালে জার্মানরা যখন মঞ্চে প্রবেশ করল তখন তাদের হাতে অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডা। তাদের ঔদ্ধত্য, তারা ভাবল-মারচ করে সকলের আগে হিমালয়ে আরোহণ করবে। এই ঔদ্ধত্যের জন্য জার্মান অভিযাত্রীদের প্রচুর খেসারত গুনতে হয়েছে তাজা তাজা প্রাণের বিনিময়ে। এর পরে 'হাম কিসিসে কম নেহি' বলে এল জাপানী অভিযাত্রীরা। মার্কিনরা এল থলে ভর্তি ডলার নিয়ে—পর্বতারোহণের গৌরবটুকু কড়কড়ে ডলারের বিনিময়ে কিনে নেবে।

এতসব ঝুটো জিনিসের ভিড়ে আসল জিনিসটি বার বার নাজেহাল হল, হারিয়ে গেল। চিরতরেই হারিয়ে যেত যদিনা ঐতিহ্যের রক্ষা কবচটি থাকত। এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। এইসব মানুষ যেসব মতাদর্শের ঝাণ্ডা নিয়ে হিমালয় অভিযানে এসেছে সেসব মতাদর্শ সেইসব দেশেরই জাতীয় চেতনা থেকে উদ্ভূত। এদের পর্বতারোহণের ঐতিহ্যটি একটা ব্যাপকতর জাতীয় ঐতিহ্যের চাপে একদিকে যেমন কিছুটা তুবড়ে গেছে, অপরদিকে তেমনি যথেষ্ট পুষ্টিলাভও করেছে। ঐতিহ্যের ওই রকম স্বভাব—নির্ভেজাল হলে এরা একে অপরকে শক্তি জোগায়। এজন্যই ইউরোপীয় পর্বতারোহণ যখন প্রায় সর্বাংশে রাষ্ট্রনীতির রাহুগ্রস্ত ছিল—সেই দুঃসময়েও—সেখানে খাঁটি পূর্ণাবয়ব পর্বতারোহীর কখনোই অভাব হয়নি। এদের ক্ষেত্রে পাহাড়ে আরোহণ করাটা ছিল দেশ সেবারই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতএব সততারও অভাব ঘটেনি, দুঃসাহসিকতারও অভাব ঘটেনি। এই প্রচার প্রকম্পিত দশকগুলিতে প্রকৃত পর্বতারোহণের মতিগতি কিছুটা অবশ্যই বিকৃত হয়ে থাকবে, —রাষ্ট্রনীতির কলুষ ছোঁয়ায় সকলেরই এবং সবকিছুরই অল্প-বিস্তর স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে, —কিন্তু সেই সঙ্গে ঐতিহ্যটিও পুষ্টিলাভ করেছে।

* হিমালয়ের উচ্চতর পর্বতশীর্ষগুলির উপর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকা বারবার ওড়ানো হয়ে যাবার পর বহুল ব্যবহারে পাহাড়ের প্রচার-মূল্য যখন কমে এল— যখন আর পড়তায় পোষায় না, পর্বতারোহণ নিয়ে মাতামাতিটাও তখন কমে গেল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ক্ষীণ হল; অভিযানের খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতা থেকে ভিতরের পাতায় নির্বাসিত হল। এখনো প্রায় প্রতি বছরই হিমালয়ের বিভিন্ন

পর্বত শীর্ষায় পর্বতারোহণ মহাকাব্যের নতুন নতুন স্বর্গ সৃষ্টি হচ্ছে, এভারেস্ট জয়ের চাইতেও যেগুলো অনেক বেশি চমকপ্রদ এবং দ্যোতনাপূর্ণ, কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো বিমুখ হবার পর থেকে এদের এইসব কীর্তি সাধারণের অজানা থেকে যাচ্ছে।

তা থাক, পর্বতারোহণ জিনিসটা ফ্লাড লাইটের আলোয় তেমন জমে না। ব্যাপারটা নির্জনেই ভালো হয়। বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে করতে নিজের দেহ মন প্রসারিত করতে থাকা—এ-কাজে বড় জোর দু-দশ জন সমভাবাপন্ন বন্ধু সঙ্গে থাকবে। রাষ্ট্রীয় হুজুগটা চুপসে যাবার পরেও তাই ইউরোপীয় পর্বতারোহীদের হিমালয়ে আসা বন্ধ হল না। ততদিনে হিমালয়ের পথ চেনা হয়ে গেছে। কৃত্রিম কোলাহলটা থেমে যেতে তখন আবার পাহাড়ে পর্বতারোহীদের পায়ের শব্দ শোনা গেল, তুষার গাঁইতির আওয়াজ, ক্যাম্প-ফায়ারের উষ্ণতা, সবকিছু। দীর্ঘকাল রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকবার পর অনেক ধৈর্য, অনেক সাধনায় আবার রাহুমুক্তি। হিমালয় এখন ইউরোপীয় পর্বতারোহণ ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ঐতিহ্যের জোর ছিল, ইউরোপীয় পর্বতারোহণ তাই ইম্পিরিয়ালিজম, কলোনিয়া-লিজম, ফ্যাসিজম, কমুনিজম এমনকি ডেমোক্রাসী আর ডলারিজমেয়ের মতো বিশাল বিরাট সব তুষার-ফাটল, তুষার-দেওয়াল, তুষার-প্রপাত, তুষার-ঝটিকা অতিক্রম করে হিমালয়ের অজ্ঞাত, অখ্যাত গিরিশিরা ধরে আপন লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আজও আরোহণ করেই চলেছে।

ভারতবর্ষে এমন একটা ভান করা হয় যেন ভারতীয় পর্বতারোহণও এই জয়যাত্রার সামিল হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কোন আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভা হলে সেখানে ভারতবর্ষ আমন্ত্রিত হয়। তার মানে, ভারতীয় পর্বতারোহণ স্বীকৃতি না পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। একই অভিযানের নয়জন অভিযাত্রীকে এভারেস্ট শীর্ষ দেখিয়ে আনবার পর এবং সত্যকারের দুর্গম জেমু হিমবাহের পথে কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণ করবার পর সে চেষ্টা হলে সেদিকে নির্দিধায় গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ভারতের প্রতি বিদ্বেষ বলে চালানো যেত। ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। ভারতবর্ষের পর্বতবিশারদেরাও তাই ম্যাজিসিয়ানদের মতো কোটের সামনের দিকের পুরোটাই বিজয় পদক দিয়ে ঝলমলে করে এইসব সভায় যোগদান করে থাকে। সেই অধিকার ভারতের আছে।

কেন না, এইসব আলোচনা সভায় কেবল পর্বতারোহণের নানাবিধ প্রয়োগ-কৌশল নিয়েই বার্তা বিনিময় হয়ে থাকে। প্রয়োগ-কৌশলটাও পর্বতারোহণের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু একটা অঙ্গই। তার বেশীও নয়, তার কমও নয়।

সভা ডেকে সম্পূর্ণ পর্বতারোহণ নিয়ে আলোচনা করা একটা অসম্ভব প্রস্তাব। যদিও এইসব সভার একটা ভনিতা থাকে যেন পুরো পর্বতারোহণ ব্যাপারটিকেই গুলে খাওয়া হচ্ছে।

মান্য-গণ্য পর্বতারোহীদের এইসব সভায় যোগদান এবং এতগুলি সুদুর্লভ বিজয় পদক দেখে আমাদেরও স্থির প্রত্যয় হয়েছে যে, আমরা পূর্ণাবয়ব পর্বতারোহী হয়ে গেছি। বাইরে থেকে দেখে সবসময় ঠিক ধরা যায় না, ধরে ফেললেও শিষ্টাচার বজায় রেখে কেউ তা উল্লেখ করে না, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, আমাদের জাঁকজমকপূর্ণ মন্দিরের ভিতরে কোন জাগ্রত বিগ্রহ নেই। বিগ্রহ যে নেই তার অনেক প্রমাণ ; তার কারণও অনেক।

ভারতীয় পর্বতারোহণের অমৃত সমান কথা শুনতে শুরু করলে তা আর শেষ হবে না। তবে সংক্ষেপে এটিকে একটা আইস বার্গ মানে ভাসমান তুষার-শিলার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এর যেটুকু অংশ জলের উপর ভেসে আছে সেটুকু খুবই উজ্জ্বল, বহু দূর থেকে চোখে পড়ে। কিন্তু এর বৃহদংশটি আছে জলের তলায়—সেখানে একে মেপে দেখতে যাওয়াও নিরাপদ নয়। তবে বিগ্রহের অভাবটা একটু নজর দিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে।

আজও পর্যন্ত ভারতীয় পর্বতারোহীরা এমন একখানা বই লিখলেন না—এমনকি একটা প্রবন্ধ বা কবিতাও নয়—যা পড়ে মনে হয় বাঃ! বইয়ের সংখ্যাই খুব কম, আর তারও সবই চর্বিত-চর্বন—প্রকাশকের উৎসাহে দায়ে পড়ে লেখা। খুঁজলে মুন্সীয়ানা হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু অন্তরঙ্গ উষ্ণতার লেশমাত্রও নেই। ইংরেজিতে বলে, 'তোমার ভিতরে যে বইটি আছে, তুমি কেবল সেই বইটিই লিখিতে পারো।' এই কথাটি যদি অসত্য না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, এইসব বইয়ের যাঁরা লেখক তাঁদের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ চর্বিত-চর্বন, একঘেঁয়েমি ছাড়া আর কিছুই নেই।

তাই বলে এদের অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু ফ্যালনা নয় আদৌ। পাহাড়ে ইউ-রোপীয়রা যেসব দুর্গমতার সঙ্গেই বোঝা-পড়া করতে হয়। ইউরোপীয়রা যে দুর্গমতার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে—কাঞ্চনজঙ্ঘার জেমু হিমবাহ—এরা সেই দুর্গমতাকেও পোষ মানিয়েছে। অথচ ইউরোপীয়রা ফিরে এসে নির্জনে বসে বই লেখে, আর আমাদের এরা অফিসার্স মেসে অথবা পাড়ার চায়ের দোকানে রং দেখায়, কৌদল করে, আর সবকিছু নস্যাৎ করে। এর কারণ—মন্দিরে বিগ্রহ নেই। পূজার আয়োজন অনুষ্ঠানে এরাও কম যায় না কিন্তু বিগ্রহের অভাবে কিছুই আর

যথাস্থানে পৌঁছয় না। প্রাঙ্গণটা কেবল জঞ্জালে ভরে যায়।

আরও প্রমাণ চাই? পঁচিশ বছরের উপর হয়ে গেল আমরা পর্বতারোহণে আছি। লিপ্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা, এভারেস্ট প্রভৃতি অভ্রভেদী শীর্ষগুলো আমরা জয় করেছি—অথচ বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর পর্বতারোহীদের সঙ্গে এক সারিতে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে অদ্যাবধি এমন একজন পর্বতারোহীও কি ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছে? বেরোয়নি। অর্থবল থাকলে এবং কলা-কৌশলটা শিখে নিতে পারলে উঁচু উঁচু পাহাড় আজ আর তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সেই আসল জিনিসটা না থাকলে একজনেরও জয় করা প্রকৃত পর্বতারোহী হওয়া সম্ভব হয় না। সেই আসল জিনিসটা হল—ঐতিহ্য। ভারতীয় পর্বতারোহণের কোন ঐতিহ্য নেই। পাহাড়ে চড়ে আমাদের দেশের কিছু কিছু ছেলের চাকরিতে পদোন্নতি হয়েছে, এটি খুবই সুখের কথা। কিন্তু পাহাড়ের জন্য আমাদের দেশের কেউ সামান্য কেরানিগিরি থেকেও পদত্যাগ করেছে এমন ঘটনা আমার একটাও জানা নেই। অথচ ওদেশ থেকে রাজমিস্ত্রীও রুজি-রোজগার ছেড়ে হিমালয়ে চলে এসেছে। কারণ ওই একই—ওদের ঐতিহ্য আছে, আমাদের কোন ঐতিহ্য এখনো গড়ে ওঠেনি।

বিষয়টা যতো না বেদনাদায়ক, ততোধিক বিস্ময়কর। কেননা, পাহাড় পর্বতের ব্যাপারে ভারতের ঐতিহ্যটাই সবচাইতে প্রাচীন, সবচাইতে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সবচাইতে খাঁটি। অন্তত হাজার চারেক বছর ধরে যে ঐতিহ্য তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, ওপরের ধুলো-বালি একটু ঝেড়ে দিলে যে ঐতিহ্য ভারতের পর্বতারোহণ প্রয়াসটিকে মুহূর্তে দ্যুতিময় ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারে, সেই বিশাল বিরাট বলিষ্ঠ ঐতিহ্যটি হঠাৎ কেন এমন দুর্বল হয়ে এতদূর পিছিয়ে পড়ল, সেইটে আগে একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

একথা অনস্বীকার্য যে পর্বতারোহণ নামের আধুনিক ব্যাপারটি ইউরোপ থেকে 'কলম' কেটে এদেশে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে কাজটা খুব তাড়াতাড়ি সারতে হয়েছিল। কথা নেই, বার্তা নেই ১৯৫৩ সনে হঠাৎ একদিন জনৈক ভারতীয় নাগরিক ভুল করে এভারেস্ট শীর্ষে উঠে পড়ল। মহা অপ্রস্তুত অবস্থা—ভারতে পর্বতারোহণের কোন ব্যবস্থাই নেই অথচ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পর্বতারোহী একজন ভারতীয়! লজ্জা ঢাকতে তখন পড়ি-কি মরি করে একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। আর প্রতিষ্ঠানটি চালু করবার ও চালু রাখবার দায়িত্ব অর্পিত হল প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপর—সামরিক বাহিনীর লোকজন দিয়ে সামরিক কায়দায় বাঁধা প্রতিষ্ঠিত সময়ের মধ্যে নিয়মসংসারের যে

কোন কাজ সুসম্পন্ন করে দিতে পারে তাদের উপর।

স্পোর্টস মানে খেলাধুলো, শাখা-প্রশাখা সমেত, সবসময়ই শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকে। পর্বতারোহণ প্রাণসটিকে কিন্তু শুরু থেকেই ঠেলে দেওয়া হল প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে। পর্বতারোহণকে শিক্ষার বাহন না করে করা হল প্রতিরক্ষায় হাতিয়ার—এমন বিপর্যয়কর একটা ব্যাপার অনবধানবশত ঘটে গেছে বলে বিশ্বাস হয় না! আর তারপরে যেমন মালী তেমনি বাগান। আমলাতন্ত্রের মালীদের বাগান হাতে পরে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীও কেরানী তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে—সেই আমলাতন্ত্রের তত্ত্বাবধানেই ভারতীয় পর্বতারোহণ পত্রে পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠবে এমন আশা করা বাতুলতা। তা হয় না, তা হয়নি। আমলাতন্ত্র আর পর্বতারোহণের মধ্যে সম্পর্কটা হল অহি-নকুলের সম্পর্ক—একে অপরকে আদপেই সইতে পারে না। অথচ এদেশে গোড়া থেকেই পর্বতারোহণকে সঁপে দেওয়া হল আমলাতন্ত্রের হাতে। তখন থেকেই একে যে কাজে লাগানো হল—শীর্ষ জয় করার কাজ—সে কাজে ঐতিহ্য জিনিসটা নেহাতই একটা বাড়তি বিড়ম্বনা। অতএব পর্বতারোহণের পাঠশালাগুলোর জন্য যে পাঠ্যক্রম স্থির হল তার থেকে কয়েকটি বিষয় সযত্নে বাদ দেওয়া হল। পাহাড়ের সঙ্গে নিজেদের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ; পাহাড়ের গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, লোকজন; পাহাড়ের সৌন্দর্য সঙ্গীত, ভাষা ইত্যাদি যেসব উপাদান দিয়ে পর্বতারোহণের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তার সবকিছুই এই পাঠক্রম থেকে নিষ্ঠুরভাবে ছেঁটে দেওয়া হল। ভারতীয় পর্বতারোহণের যে আজও একটা ঐতিহ্য নেই তার অবশ্যই আরও অনেক অনেক কারণ আছে। তবে মূলগত কারণ একটাই: গোড়া থেকেই আমরা একে বর্জন করেছি পর্বতারোহণের ঐতিহ্য তো আর রাস্তার কুকুর নয় যে তাড়িয়ে দিলেও পিছু পিছু আসবে। একদিন যা সযত্নে পরিহার করেছি আজ তা নেই বলে ক্ষোভ করতে বসলে সেটা হাস্যকর হবে।

তবুও ক্ষোভ হয়, ঐতিহ্যটা নেই বলে তো বটেই কিন্তু তার চাইতেও বেশী ক্ষোভ হয়, ঐতিহ্যটা থেকেও নেই বলে। পর্বতারোহণ সম্পর্কেও ভারতের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে এ কথা শুনলে হয়তো বরং ভারতীয় পর্বতারোহীরাও হেসে ফেলবেন। হ্যাঁ, ভারতের এককালে যখন উড়োজাহাজ ছিল, অ্যাটমবোমা ছিল, মহাকাশ যাত্রা ছিল তখন সেই সঙ্গে পর্বতারোহণও থাকতে পারে। দাবী করলেই হল।

মাত্র সিকি শতাব্দী আগে, মহাসমারোহ সহকারে, পশ্চিমদেশ থেকে এদেশে পর্বতারোহণের 'কলম' কেটে এনে লাগান হল। তার আগে পর্বতারোহণ বস্তুটি কি তা-ই আমরা জানতাম না। এমনকি এখনও আমরা সঠিকরূপে জানি না যে, আমরা কেন পর্বতারোহণে যাই। এই অবস্থায় যদি কেউ দাবী করে যে, ভারতের এ-বিষয়ে একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে তবে সেই দাবীটা হাস্যকর মনে হতেই পারে। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, যে বস্তুটির অভাবে আমাদের পর্বতারোহণের এমন দুরবস্থা সেই বস্তুটি হাতের কাছেই রয়েছে এবং চিরকাল ছিল—এমন কথা সত্য বলে মেনে নিতে আমাদের পৌরুষে বাঁধে। এসব কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। তাতে কিন্তু কেবল নিজেকে বঞ্চিত করা হয়, সত্যটা মিথ্যা হয়ে যায় না।

হিমালয়ের সঙ্গে হিন্দু-ভারতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে পৌরাণিক যানে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ ছাড়িয়ে আরও অতীতে বিলীন হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীদের অনেকেরই পার্মানেণ্ট অ্যাড্রেস হিমালয়। হিমালয় পারে কৈলাসে দেবাদিদেব শিবের হেডকোয়ার্টার্স। মানস সরোবরে বিষ্ণুদেব বিহার করে থাকেন। এসব কথা আমাদের জানা—পড়াশুনা করে নয়, হিন্দু-সমাজে লালিত-পালিত হয়ে এসব কথা আমাদের আপনা থেকেই জানা হয়ে গেছে। বহু বহু কাল আগে থাকতেই হিমালয় ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে আছে। বস্তুত হিমালয় বাদ দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা ভাবাই যায় না। হিমালয়ের সঙ্গে—হিমালয়ের অজস্র চেহারার প্রত্যেকটির সঙ্গে—পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় না থাকলে এমন ঘটনা সম্ভব হত না। দার্জিলিঙের বা উত্তর কাশীর কোন ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে পরিচয় সাধন নয়, সত্যকারের সুদুর্লভ পরিচয়। এই প্রসঙ্গে হিমালয়ভক্ত শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কৈলাস ও মানস সরোবর' গ্রন্থ থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত করব: 'সেই পুরাকালে হিমালয়ে দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্গম গিরিপ্রাচীর ও তুষারাবৃত গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে এত মুনিঋষির যাতায়াত কিভাবে সম্ভব হত এখন ভেবে কূল পাওয়া যায় না।'

সত্যিই কূল পাওয়া যায় না। তাছাড়া, তাঁরা তো কেবল যাতায়াতই করেননি—আজকালকার অধিকাংশ পর্বতারোহী যা করে থাকেন,—তাঁরা হিমালয়ের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখেছেন, খুঁটিয়ে বুঝেছেন। সেই পুরাকালে শ্বাপদ-সংকুল ফুট-হিলস থেকে চিরতুষারাবৃত গ্রেট হিমালয় ছাড়িয়ে গোটা হিমালয়টা এমনভাবে জরীপ করে ফেলা বড় সহজ কাজ ছিল না—মাত্রই বছর কুড়ি আগে, ১৯৫৭ সনে-লিপুলেখ অতিক্রম করে কৈলাস-মানস সরোবর যাবার সময় এ-বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধ-

কারোর হাড়-কাঁপানো অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে; গায়ে যদিও বিলিতি গ্যাবার্ডিনের ওভার কোট ছিল।

এখন প্রশ্ন উঠবেই যে, এইসব মুনি-ঋষিদের প্রকৃত পর্বতারোহী বলা চলে কি না? চলে না। কারণ এঁরা কখনোই পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেননি; শীর্ষে আরোহণ করে উড়িয়ে দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় পতাকা বহন করেননি; ফিরে এসে এঁরা যেসব কাব্যগাথা লিখেছেন সেগুলোকেও কোনক্রমেই অভিযানের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ বলা চলে না।

তবে প্রকৃত পর্বতারোহণ না করে থাকলেও এইসব মুনি-ঋষিরা যে প্রকৃত পর্বতারোহী ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। চরিত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য না থাকলে কেউ পর্বতারোহী হতে পারে না—হাজারটা পর্বতশীর্ষ জয় করলেও নয়—সেইসব বৈশিষ্ট্য এঁদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। হিমালয়কে এঁরা পবিত্র দেবভূমি বলে জানতেন। হিমালয়ের গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদী-নির্ঝর, লোকজন ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কেই এঁদের অসীম কৌতূহল ছিল। হিমালয়ের সঙ্গে এঁদের আত্মীয়তা এতোই নিবিড় ও গভীর ছিল যে টালমাটাল মুসলীম ও ব্রিটিশ যুগ পেরিয়ে এসেও তা অটুট আছে। এই আত্মীয়তা পারস্পরিক লেন-দেনের মাধ্যমে পুষ্টিলাভ করেছিল। কোনরকম দান-খয়রাত করে নয়, শ্রেফ চরিত্রের জোরে এঁরা হিমালয়বাসীদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করেছিলেন। গত পঁচিশ বৎসরে ভারতীয় পর্বতারোহীদের উৎপাতে এই শ্রদ্ধা-ভক্তি কিছুটা কলঙ্কিত হয়েছে কিন্তু সবটা মুছে যায়নি। বিনিময়ে হিমালয় এঁদের শুদ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। এই অনুপ্রেরণা যার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে তিনিই হলেন প্রকৃত পর্বতারোহী।

ব্যাপারটা তাহলে সংক্ষেপে এই দাঁড়াল যে, এদেশে যখন পর্বতারোহণ ছিল না তখন অনেক পর্বতারোহী ছিল, আর অবশেষে যখন এদেশে পর্বতারোহণ শুরু হল তখন আর এদেশে কোন পর্বতারোহী হয় না। প্রস্তাবটি যদি কারো কারো কাছে উদ্ভট মনে হয় তবে আমরা নাচার। ষাটের দশকে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের আগে পর্যন্ত হিমালয়ের দুর্গমতম তীর্থগুলি পরিক্রমা করে এসে যাত্রীরা অনেকেই আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলতেন। সত্যকারের বড়ো কিছুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে মানুষের যখন হয়, তার তখন যা করবার নয় সে তখন তাই করে বসে, আর কিছু না পারলে মনের আনন্দে একখানা বই লিখে ফেলে। অথচ পর্বত থেকে ফিরে আসবার পর আমাদের পর্বতারোহীদের মধ্যে লেশমাত্র কোন আনন্দ-উন্মাদনা দেখা যায় না। চিরাচরিত তীর্থপথ

পরিক্রমার চাইতে পর্বতারোহীদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই অনেক বেশি রোমাঞ্চকর —অথচ নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা দশজনকে ডেকে শোনাবার জন্ম এদের মধ্যে এতটুকু উৎসাহ থাকে না। বাংলা ভাষায় এ-বিষয়ে যে দু-একখানা বই বেরিয়েছে সেগুলো পড়লে মন উদ্দীপ্ত হয় না, প্রান্তি বোধ করে।

এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও এই দুইটি ধারা, এই গোড়াদেশে, মিলিত হতে পারেনি কেননা আমাদের আমলাতন্ত্র তা চায়নি। প্রতিরক্ষাদপ্তরের আমলাদের পরিবর্তে যদি শিক্ষাদপ্তরের আমলাদের উপর এর প্রতিপালনের ভার পড়ত তবেও হয়তো কিছু ভরসা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। পর্বতারোহণের বাইরের চাকচিক্য দেখেই আমরা এমন প্রবলভাবে প্রলোভিত হলাম যে তা ভিতরের সারবস্তুটুকুর কথা আর আমাদের মনেই রইল না। তা হয়তো এই দুটি ধারার মিলন সাধনে প্রকৃতিগত কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল বলে মনে হয় না।

এদেশে প্রথম যখন পর্বতারোহণ চালু হল,—দার্জিলিঙে, মানালীতে, উত্তরকাশীতে যখন একটার পর একটা পর্বতারোহণ শিক্ষণকেন্দ্র খোলা হল,— তখনো পর্যন্ত এদেশের খ্যাতনামা হিমালয়াত্মাদের অনেকেই পুরোদমে কর্মক্ষম ছিলেন। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রনাথ সেন, নির্মলচন্দ্র মৈত্র প্রমুখকে এ ব্যাপারে গোড়া থেকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনকি কনভোকেশন অনুষ্ঠানেও এদের কখনো ডাকা হয়নি।

আমাদের পর্বতারোহণের সঙ্গে যদি এইসব প্রবীণহিমালয়প্রেমীদের সামিল করে নেওয়া হত তাহলে প্রয়াসটির আজ এমন দীনদশা হত না। পর্বতারোহণ শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটিরই বিশদ পাঠ্যক্রম আছে—সেই পাঠ্যক্রমে অন্য সবকিছুই আছে, নেই কেবল হিমালয়। এইসব জায়গায় পর্বতারোহণের সবরকম কলা-কৌশল শেখবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু হিমালয়ের সঙ্গে অনাদিকাল থেকে যে আমাদের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে সেই কথাটুকু শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা এসব জায়গায় করা হয়নি। খুব সহজেই এই ব্যবস্থাটুকু করা যেত। এখনও করা যায়।

এমন একটা ব্যবস্থা যদি করা যেত যে, হিমালয়ের কোন দুর্গম তীর্থ বা পথ পরিক্রমা করা না থাকলে এসব সংস্থায় শিক্ষার্থীদের সুযোগ মিলবে না—তাহলে বেশ হত। কিন্তু এতে অনেকেরই অনেক রকমের অসুবিধে হতে পারে। তার বদলে এমন ব্যবস্থা করা চলে যে, হিমালয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বই ভাল করে পড়া না থাকলে চলবে না—এবং ভর্তির আগে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

করা হবে। সেই সঙ্গে হিমালয় যে কত বিরাট, বিশাল, হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের যে কত অন্তর রকমের আত্মীয়তা সেসব নিয়ে একটা সংকলন গ্রন্থের ব্যবস্থা করা হোক। গ্রন্থটি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গ্রন্থটি সবসময় হাতের কাছে রাখতে হবে। হিমালয় স্বতঃপ্রকাশ—কেবল সূত্রটা একবার ধরিয়ে দিতে পারলেই তারপর আপনা থেকেই কাজ হবে।

গত কয়েক বছর ধরে দার্জিলিঙের শেরপারা নিজেদের গৌরবমণ্ডিত শেরপাবৃত্তি ত্যাগ করে অন্য দশটা পেশায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। একজন দুজন করে নয়, পাইকারি হারে. অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, টুংসুং বস্তি চষে ফেললেও এখন আর পর্বতারোহণের জন্য মনের মতো শেরপাও দুর্লভ হবে।

ঘটনাটি যতটা বিস্ময়কর তার চাইতেও বেশী বেদনাদায়ক—ভারতের দিক থেকে লজ্জাকরও বটে। ছোট্ট একটা উপজাতি গোষ্ঠী, দার্জিলিং শহরের উপকণ্ঠে, ছোট সুনির্দিষ্ট একটু এলাকার মধ্যে ডেরা বেঁধে, একটা সুমহৎ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। এই শেরপাদের অবস্থা কখনোই স্বচ্ছল ছিল না, এমনকি বিশ্ববিশ্রুত শেরপারাও সময়-অসময়ে ঘোড়া নিয়ে খদ্দেরের আশায় ম্যালে অপেক্ষা করত। কিন্তু অভাব-অনটন যতই হোক—এমন হাসিখুসির জাত আর হয় না। আর আত্মসম্মান বোধ। কারো কাছ থেকে কোনরকম অনুগ্রহ প্রার্থনা করা বা গ্রহণ করা যে কি-জিনিস শেরপারা তা জানতই না। মেয়েরা ঘর-সংসার বাচ্চা-কাচ্চা সামলাতে সামলাতে নিরলস উলের পুলোভার বা কার্পেট বুনত, আর ছেলেরা সেই কার্পেট ও পুলোভার বাজারে নিয়ে যেত, গৃহ-সংলগ্ন পাহাড়ের ঢালে কোদাল-খুরপি চালাত, শুয়োর পুষত, ম্যালে ঘোড়া নিয়ে ঘুরত, মদিরা খেত, জুয়ো খেলত —আর আমন্ত্রণ পেলেই হিমালয় অভিযানের সঙ্গে গিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে আসত। লোসার বা তিব্বতী নববর্ষ উৎসবের দিন এরা টুংসুং বস্তি উজাড় করে চলে যেত অবজারভেটরি হিলের উপরে মহাকালের মন্দিরে—এই জগতের সবকিছু মেনে নিয়েও ওরা যেন ঠিক এই জগতের অধিবাসী ছিল না।

ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যটা দার্জিলিঙে যেমন উৎকট তেমন বোধহয় কলকাতায়ও শৈল-নিবাসটিতে যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির অভাব নেই তাও ভ্রমণবিলাসীদের হাড়ে হাড়ে জানা আছে। আধুনিক যুগের এইসব সংক্রামক জটিলতাগুলো শেরপারা যে এড়িয়ে চলত ঠিক তা নয়—এসব ওদের স্পর্শই করত না ষাটের দশকের প্রথম দিকেও টুংসুং বস্তিতে ঢুকলে মনে হত যেন অন্য কোন দেশে পৌছে গেছি, অন্য কোন যুগে।

শেরপারা নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থা, নিজেদের ধর্মবোধ, নিজেদের ঐতিহ্য

নিয়ে এই সুবৃহৎ বস্তি গড়ে তুলেছিল। এদের অভাব-অনটন সবেই ছিল কিন্তু তাই নিয়ে এরা কখনো বিক্ষোভ করেনি বা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের উপর হামলা [illegible]

জন্যই দার্জিলিঙের সুখ্যাতি এক সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে দার্জিলিঙের খ্যাতি যখন কেবল কতিপয় ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও রাজা-মহারাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ, শেরপাদের নিবাস হিসেবে দার্জিলিঙের কথা তখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, হিমালয় অভিযান নিয়ে লেখা সব বইয়ে সগৌরবে উল্লেখিত হয়েছে। এই শেরপাদের জন্ম দার্জিলিং যা-কিছু দিয়েছে বা করেছে তার তুলনায় পেয়েছে অনেক অনেকগুণ বেশি তবুও শেরপারা দার্জিলিঙে শেরপা হিসেবে টিকতে পারল না। এই কিছুদিন আগেও এমন একটা সময় ছিল যখন কোন হিমালয় অভিযান করতে হলে শেরপা নির্বাচন করবার জন্ম অভিযানের নেতাকে আগেভাগেই দার্জিলিঙ আসতে হত—কেননা দার্জিলিঙের শেরপা ছাড়া যে হিমালয় অভিযান হতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারত না। কিন্তু তারপরই হঠাৎ সবকিছু পাল্টে গেল। বিদেশ থেকে এখন যারা হিমালয় অভিযান করতে আসে তারা আর দার্জিলিঙে আসে না। দার্জিলিঙে এখন আর মনের মতো শেরপা পাওয়া যায় না।

ঘটনাটি আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। আর তা ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন আমরা জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্ম ঘটা করে সভা-সমিতি করছি এবং যখন এদেশে পর্বতারোহণ-প্রয়াস চমকপ্রদ সব কীর্তি স্থাপন করছে। পর্বতারোহণ বিষয়ে এদেশে বর্তমান বেশ কতগুলি বর্ণাঢ্য সাময়িক পত্র ছাপা হয়, পর্বতারোহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে সেসব কাগজে নানাধরনের লেখাও ছাপা হয়—কিন্তু শেরপাদের নিয়ে, শেরপারা কেন শেরপাবৃত্তি ত্যাগ করছে তা নিয়ে কোন লেখা এদেশের কোন কাগজে আজও ছাপা হয়েছে বলে জানি না। এই শেষপ্রহরে শেরপাদের জন্ম বিলাপ করতে বসলে তাতে শেরপারাই বিরক্ত বোধ করবে। তবে এরপরে যেদিন আবার জাতীয় সংহতি দিবস পালন করা হবে সেদিন যেন আমরা স্মরণ রাখি যে শেরপা নামে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর এবং নির্ঝঞ্ঝাট একটি উপজাতি গোষ্ঠী আমাদের চোখের সামনেই নিজেদের ঐতিহ্যপূর্ণ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্ত একটা পেশার হুকুমদার হয়ে গেছে।

ঘটনাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু আমাদের জাতীয়-সংহতি প্রয়াসের সামগ্রিক ব্যর্থতা এই ঘটনায় পূর্ণিমায় ধরা পড়েছে। শেরপারা আমাদাদের কোন মহৎ গৌরবের

অধিবাসী ছিলেন না, দার্জিলিং শহরে, শহরের চৌহদ্দির মধ্যেই এরা থাকত—যে দার্জিলিঙে দেশের গণ্যমান্যরা প্রতি বছর মরশুমে গিয়ে থাকেন। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট একটু জায়গায় এরা সন্নিবদ্ধভাবে বাস করত। এদের জনসংখ্যা নিয়েও কোন সমস্যা ছিল না। নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে এরা কখনো সরকারকে বিব্রত বা অন্যকোন সম্প্রদায়কে বিড়ম্বিত করেনি। নিরীহ এবং নির্ঝঞ্ঝাট একটি উপজাতি গোষ্ঠী নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজেদের মহৎ পেশায় নিয়োজিত ছিল—অর্ধশতাব্দী ধরে একটা মহৎ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। তার মধ্যেই হঠাৎ সব ভোঁ-ভোঁ হয়ে গেল।

এইটি যদি কেবল আধুনিকতার আক্রমণে তথা প্রলোভনে ঘটতো তবে তা নিয়ে কিছু বলার ছিল না—পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে—বিশ্বের অনেক জাতি-উপজাতিই আধুনিকতার আগুনে পুড়েছে ও পুড়ছে। কিন্তু শেরপারাও সেই একই ফাঁদে ফেঁসে গেছে এইটে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না এজন্য যে, শেরপারা অর্ধ-শতাব্দী ধরেই সাফল্যের সঙ্গে এই আক্রমণ ও প্রলোভন প্রতিহত করেছে। দারিদ্র্যের জন্যই সাধারণত মানুষ চরিত্র ভ্রষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ততার সময় পার্বতীয় হিমালয় অভিযান বছরের পর বছর বন্ধছিল তখন শেরপাদের আর্থিক দুর্গতি যে কোথায় পৌঁছেছিল তা বর্ণনা করার চাইতে কল্পনা করা সহজ। দেশে তখন চাকরির অভাব ছিল না এবং সাহেবরাও শেরপাদের প্রতি বিশেষ রকম সহানুভূতিশীল ছিল—ইচ্ছে করলেই ওরা রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে পারত। কিন্তু ওরা তা করেনি। চূড়ান্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও সুদিনের অপেক্ষা করেছে—শেরপাবৃত্তি ত্যাগ করেনি।

চল্লিশের দশকে বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় যারা অবিচলিত থেকেছে, ষাটের দশক থেকে তারা কেন ঝাঁকে ঝাঁকে কুলত্যাগ করতে শুরু করল? এই সময়ে নতুন কোন আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়নি। বরং এই সময়ে দেশের পর্বতারোহণ প্রয়াস খুবই দ্রুতগতিতে বিস্তারলাভ করেছে। তাতে করে শেরপাদের চাহিদা বেড়েছে, রুজি-রোজগারও বেড়েছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে শেরপাদের সুসংগঠিত করবার জন্য শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছে। দেশের মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওদের মজুরির হারও বারবার সংশোধন করা হয়েছে—১৯৬০ সনে যেখানে মাথা পিছু দৈনিক মজুরি ছিল পাঁচ টাকা এখন সেখানে হয়েছে পঁচিশ টাকা। ওদের নিজস্ব সাজ-সরঞ্জামের ভাড়ার হারও পাঁচগুণ বেড়ে গেছে। আগে হিমালয় অভিযান হতে বড়জোর গণ্ডায় হিসেবে

এখন হয় শখের হিসেবে। সবকিছু খতিয়ে দেখলে আজকের শেরপাগিরি কোনক্রমেই কেরানিগিরি বা সেপাইগিরির চাইতে খারাপ চাকরি নয়। তাহলে ওরা হঠাৎ এমন ঝাড়ে-বংশে বৃত্তি ত্যাগ করল কেন?

এখানে বলে রাখা দরকার যে আজ আর শেরপাদের জন্ত কান্নাকাটি করে কোন লাভ নেই। ইতিমধ্যেই ওরা ইতিহাসের বস্তু হয়ে গেছে—যা একসময়ে ছিল, এখন আর নেই। কোন ভোজবাজির সাহায্যেই ওদের আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। পুরনো দিনের শেরপারা ষাটের দশক থেকেই কুলবৃত্তি ত্যাগ করেছে এবং তার আগে মন্ত্রগুপ্তিটা বংশধরদের দিয়ে যায়নি—শেরপাদের কোন কাজেই এতটুকু ফাঁক থাকে না, বৃত্তিত্যাগ করবার সময়ও ওরা কোন ফাঁক রাখেনি। তাছাড়া যে পরিবেশে শেরপাবৃত্তি গড়ে উঠেছিল তাও আজ অতীতের বস্তু হয়ে গেছে। আগে টুংসুং বস্তিতে ঢুকলে মনে হত যেন একটা ছোটোখাটো তিব্বত। এখন সেখানে অনেক দুতলা তিনতলা বাড়ি উঠেছে—ঘরে ঘরে বিজলি বাতি জ্বলে, লোড-শেডিং হয়।

তবে শেরপারা না থাকলেও শেরপাদের কীর্তি-কথা পর্বতারোহণের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। অমন বলিষ্ঠ নম্রতা, সহাস্য উদারতা এবং নির্বিকার ত্যাগের কথা বর্ণনাও করা যায় না, কল্পনাও করা যায় না। বৃত্তিটাকে ওরা ব্রত করে তুলেছিল। গ্যেলে বা পাসাং কিকুলির আত্মত্যাগের তুলনায় ক্যাসাব্লাংকা নিতান্তই ছেলেমানুষ। ওরা দু'জন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল—প্রথমজন নাঙ্গা পর্বতে ও দ্বিতীয়জন কে-টু পর্বতে—না, কোন দেশপ্রেমের নিদর্শন রাখবে বলে নয়, কর্তব্য-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলেও নয়, এমনকি মুমূর্ষুকে সেবা করবার মধ্যে যেটুকু কৃতার্থতা আছে তার জন্তও নয়। যে কারণে ওরা কিছুতেই পাহাড় থেকে নেমে আসতে রাজি হয়নি ত' হল অহেতুক উদারতা, সাদাবাংলায় যাকে বলে বিশুদ্ধ পাগলামি। যে-দু'জন সাহেবের জন্ত ওদের আত্মত্যাগ সে-দু'জনের তখন আর একটুকু সেবা গ্রহণ করবারও ক্ষমতা ছিল না, নিজেদের মৃত্যু অনিবার্য জেনে সাহেবরা ওদের নেমে যাবার আদেশও দিয়েছিল—কিন্তু সেই-ই প্রথম ওরা সাহেবদের আদেশ অমান্য করে, পরিণাম জেনেই অমান্য করে। পর্বতারোহণের নিয়ম অনুযায়ীই ওদের তখন একমাত্র কর্তব্য ছিল নেমে আসা। ওরা তবু নেমে আসেনি, সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেছে। শেরপাদের নীতিবোধ এতই সূক্ষ্ম যে জগতের কোন নীতিশাস্ত্র তার নাগাল পায় না। এই গ্যেলে ও কিকুলি অথবা আং শেরিং ও আং থারকে কিংবা আজিবা এবং টেনজিং এরা শেরপা সমাজের শীর্ষস্থানীয়

ঘটে কিন্তু তাই বলে অন্যান্য শেরপারাও কিছু কম যায় না। ওরা সকলেই সম্পূর্ণ বিনাপ্রয়োজনে গ্যেলে অথবা কিছুনির মতো সহজ ও উদার হয়ে উঠতে পারে, আর শেরিজের মতো মৃত বলে ঘোষিত হবার তিন দিন পরে পাহাড় থেকে জ্যান্ত নেমে আসতে পারে অথবা টেনজিঙের মতো এভারেস্টের চূড়োয় উঠে বুদ্ধের জন্য পুজো চড়িয়ে আসতে পারে। ঈশ্বরের এমন আজব সৃষ্টি আগে কখনো আর হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না।

একটু অনাসক্ত চোখে দেখলে শেরপাদের পুরো ব্যাপারটিকে অনেকটা যেন বন্ধুর ও সুউচ্চ হিমালয়ের একটি পর্বতশ্রেণী বলে মনে হয়। তার কয়েকটি শৃঙ্গ আকাশ ছুঁড়ে অসীমের সঙ্গে মিশে গেছে, অন্যসব শৃঙ্গ গগনস্পর্শী। তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর কোথাও হিমপ্রপাত কোথাও হিমবাহ, কোথাও চড়াই কোথাও উৎরাই, কোথাও তুষার-ফাটল কোথাও তুষার-দেওয়াল—সব মিলিয়ে রহস্যময়। হিমালয়ের কোন পর্বতশ্রেণীরই মতো ওরা একই সঙ্গে নিকটের এবং দূরের, পার্থিব এবং অপার্থিব। শেরপাদের আবির্ভাব, বিকাশ ও অন্তর্ধান, একটুও বাড়িয়ে বলছি না, অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো—তেমনি সহজ, তেমনি অনিবার্য, তেমনি মহৎ, তেমনি বিষাদময়। অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একথা বলবার আমাদের কোন অধিকার নেই, তবুও মনে হয় শেরপাদের অন্তর্ধানপর্বটাও সম্ভবত অনিবার্য ছিল। অমন উপস্থিতি কখনোই স্থায়ী হয় না। মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি, ওইরকমভাবেই ঘটে থাকে।

মহাকাব্যের শুরুও হয় খুব নম্রভাবে, আর তা কোন পথে কোন পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে গোড়ার দিকে তা বোঝা যায় না! শেরপাদের আদি নিবাস ছিল তিব্বতে। তিব্বতের ঠিক কোন অংশ থেকে কেন ওরা দেশত্যাগী হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে এখন থেকে প্রায় চারশ বছর আগে ওরা উত্তর-পূর্ব নেপালের সোলাখুম্বু এলাকায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশীর্ষ এভারেস্টের পাদদেশে এই সোলাখুম্বু—উচ্চতা যোল থেকে প্রায় উনিশ হাজার ফুট। খুব আকর্ষণীয় জায়গা নয়। হিমালয় এখানে সবচাইতে উচ্ছৃঙ্খল, তার উপরে বছরের একটা বড় অংশ বরফে চাপা পড়ে থাকে। হৃৎপিণ্ডের জোর না থাকলে এখানে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। এখানে পাহাড় কেটে জমি তৈরি করতে হয়, বাঁধ তুলে জমি রক্ষা করতে হয়। নিতান্ত বাধ্য না হলে এমন জায়গায় কেউ ঘর বাঁধতে আসে না। ভিতরে এতটুকু দুর্বলতা থাকলে ওরা নানা উপত্যকা-পথ ধরে আরও খানিকটা দক্ষিণে নেমে আসতে পারত। আর তা

হলেই নেপালীদের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে এতদিনে শেরপা নামটির আর কোন অস্তিত্বই থাকত না।

শেরপাদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে কোন কিছুতেই ওরা চট করে ভয় পায় না। অবস্থায় পড়লে ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে ওরা অবস্থাকে আয়ত্তে নিয়ে আসে, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। এমন বৈশিষ্ট্য একদিনে গড়ে ওঠে না। মনে হয় সোলাখুম্বুতেই এর গোড়া-পত্তন হয়েছিল। সার ফ্রানসিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড, হিমালয় তথা শেরপাদের কথা বলতে গেলেই যিনি ভাবাবেগে খেই হারিয়ে ফেলতেন, তিনি তো স্পষ্টই বলেছেন যে এভারেস্ট অভিযানের আট নম্বর শিবিরে মাল পৌঁছে দেবে বলে প্রকৃতিদেবী অনেকদিন ধরে শেরপাদের প্রস্তুত করে তুলছিলেন।

শিক্ষাদানের নানারকম সুবন্দোবস্ত ছিল। যতই পরিশ্রম করা হোক না কেন, সোলাখুম্বুর মতো ভূখণ্ডে শুধু চাষ করে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে পশুপালন এবং মালবহন করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। দুর্গম পাহাড়ে ভেড়া-বকরি চরাতে গিয়ে কখনো ঘন তুষারপাতের মধ্যে দিনের পর দিন আটকে পড়তে হয়, কখনো তুষারঝটিকার সঙ্গে লড়াই করতে হয় ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সঙ্গে। ধস সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয় এবং আবহাওয়ার প্রতিও নজর রাখতে হয়—সর্বক্ষণ। অপরদিকে ক্ষেতে যখন কাজ থাকে না ভেড়া-বকরির চারণক্ষেত্রও যখন মাসের পর মাস তুষারাবৃত থাকে—শেরপা ও শেরপানীরা তখন মালবহনের জন্য নামচেবাজার বাজারও দক্ষিণে নেমে আসে। শেরপাদের একটা গুণ এই যে ওরা কাজের জাত বিচার করে না। জন্মান্তরের পাপের জন্যই কাজ না করে উপায় নেই, সেই কাজের আবার ভালো-মন্দ কি! এই উপ-মহাদেশে যারা মালবহন করে তাদের কুলিবলা হয়, তারা আপনা থেকেই কুলি হয়ে যায়—যেন ভুল করে মানুষ হয়ে গেছে এবং সেজন্য খুবই অনুতপ্ত—এদেশের কুলিরা হাসে না। হাসি মুখে ঠাট্টা-মস্করা করতে করতেও যে মালবহন করা যায় শেরপারাই বোধহয় তার একমাত্র নজির। এর মধ্যে যে লজ্জা বা অপমান থাকতে পারে তা ওরা ভাবতেই পারে, না। আত্মসম্মান বজায় রেখে ওরা মালবহনের কাজও করতে পারে।

হিমালয়ের মেজাজের সঙ্গে মেজাজ মিলিয়ে শেরপারা যখন একাগ্রভাবে গড়ে উঠছিল, তখনও পর্যন্ত বহির্বিশ্বে কোথাও যে দার্জিলিং নামে কোন জায়গা আছে —একদিন যেখানে উপস্থিত হয়ে বিশ্বের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে—সেই দার্জিলিংয়ের নামটাও বোধহয় তখন ওরা জানত না। পর্বতারোহণ নামে যে কোন

ব্যাপার আছে য হতে পারে তা জানবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির মতলব ছিল না বলেই ওদের শিক্ষা অমন সম্পূর্ণ হতে পেরেছিল।

সে যাই হোক ওই বালবয়সের দৃঢ় করেই বাইরের জগতের সঙ্গে ওদের প্রথম যোগাযোগ ঘটল। এই শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর অফিসারেরা তখন নেপালের লোকালয়গুলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বলদর্পী সাম্রাজ্যবাদের সেই শেষের বেলায় খণ্ড-ছিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে তখন প্রচুর লোকের দরকার—যত পাওয়া যায় তত। এ ব্যাপারে ব্রিটিশদের বড় ভরসা ছিল দারিদ্র্যক্লিষ্ট নেপাল। তাছাড়া, কারণ জিজ্ঞাসা না করে হুকুমমতো মারতে ও মরতে রাজি থাকবে—নেপালে এমন লোকেরাই সংখ্যাধিক। নেপালের স্বাধীন হিন্দু রাজারও এতে সায় আছে কারণ ব্রিটিশরা এতে খুশী থাকে, আবার উপরি পাওনা হিসেবে বেশ মোটা অঙ্কের বিদেশীমুদ্রাও ঘরে আসে।

এই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য লোক খুঁজে বেড়াবার কাজে যেসব সামরিক অফিসারেরা তখন নেপালে ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গোর্খা রাইফেল্‌স-এর কর্নেল সি. জি. ব্রুস। উদ্ধত গোঁফ সমেত এর জবরদস্ত চেহারাটির দিকে তাকালে মনে হয় সাদচে হয়ে আসা আলোকচিত্রটিই বুঝি যেকোন মুহূর্তে হুংকার দিয়ে উঠবে—কোই হ্যায়! তবে সামরিক বিভাগে ব্রুস সাহেবের সার্ভিস-রেকর্ড যতই জাজ্বল্যমান হোক না কেন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তিনি মানুষ চিনতে পারতেন এবং হিমালয়কে অগাধ ভালবাসতেন। এর কারণও ছিল। যৌবনে ঘটনাপরম্পরায় তিনি মামেরীর নাঙ্গাপর্বত অভিযানের অনুসরণকারী হয়ে পড়েছিলেন। অভিযানের মাল বইবার জন্য সেনাবাহিনীর কয়েকজন পালোয়ান গোর্খাকে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। পালোয়ানদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু সেই অভিযান সফল হয়নি—সেবারই দু'জন গোর্খাকে সঙ্গে নিয়ে মামেরী নাঙ্গাপর্বতে উধাও হয়ে যান। সেই অভিজ্ঞতার পর ব্রুস সাহেবও বুঝতে পারেন যে কেবল হিমালয়ের অধিবাসী হলেই বা গা-গতর আর সাহস থাকলেই উচ্চতর হিমালয়ের সঙ্গে পাঞ্জা কষা যায় না।

ওই নেপালে ঘুরতে ঘুরতেই ব্রুস সাহেব শেরপাদের সংস্পর্শেও আসেন। তাদের আচার-আচরণ, দেহের ও মনের মেজাজ, সবকিছু বিচার করে তিনি ওদের বাতিল করে দেন। অস্ত্র সব ক্ষণ যোগ আনার উপর আগ্রহ খানা থাকলেও ওরা চোখ বুজে হুকুম মেনে চলবার পাত্র নয়, যদিও অনুরোধ করলে জোরের নিজেদের ঝুঁকি নিতে জানে। তাছাড়া ওরা কথায় কথায় হো-হো করে হেসে ওঠে।

স্পষ্টতই ওরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্ত জন্মায়নি। এমন সুঠাম একটি উপজাতিকে দলে টানতে না পেরে কর্নেল ব্রুস মনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন, তবে—তাঁরই ভাষায়—ঈশ্বর নিজেই সেই ভুল সংশোধন করে দেন। সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে অযোগ্য বিবেচিত হলেও, সাম্রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির কাজে শেরপাদের ডাক পড়ল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোমর-ভাঙা জয়ের পর ব্রিটিশরা স্থির করল এভারেস্ট অভিযান করবে—বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশীর্ষে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াবে। এই প্রস্তাবের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্যার ফ্রানসিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড। সাম্রাজ্য ও হিমালয়—এই দুটোই তিনি প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসতেন। একদিকে হিমালয়ের দুর্গমতম এলাকায় ঘুরে ঘুরে তিনি ব্রিটিশাধীন ভারত-সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েছেন এবং নানা-অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন আবার অপরদিকে হিমালয়ের সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছেন, হিমালয়ের লোকদের সৌহার্দ্যে মুগ্ধ হয়েছেন, হিন্দু তীর্থযাত্রীদের দেখে শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন—এমনকি হিন্দুধর্মের যশোগানও করেছেন। এই স্যার ফ্রানসিসের চেষ্টায়ই ১৯২১ সনে প্রথম ব্রিটিশ এভারেস্ট অভিযান সংগঠিত হয়। সেনাবাহিনী থেকে ছুটি মেলেনি বলে কর্নেল ব্রুস এই অভিযানে অংশ নিতে পারেননি। তবে সেনাবাহিনীতে তখনও হিমালয়োৎসাহীর কোন অভাব ছিল না। ব্রিটিশরা স্পষ্টতই ব্যাপারটিকে একটা প্রায় যুদ্ধ-অভিযানের সমতুল্য বলে মনে করতেন। এই অভিযানের নেতা নির্বাচিত হন কর্নেল হাওয়ার্ড ব্যুরি।

নেপাল তখনো রুদ্ধ দেশ। বিনাপ্রয়োজনে খুঁচিয়ে ঘা করবার অযোকানদারী মনোবৃত্তি ব্রিটিশদের নয়। তাছাড়া তিব্বত তখন হাতের পুতুল। তিব্বত দিয়েই প্রথম এভারেস্ট অভিযান হয়। দার্জিলিং থেকে, সিকিম ঘুরে, তিব্বতের সুদীর্ঘ ভূখণ্ড অতিক্রম করে অভিযানের যাত্রাপথ। এই অভিযান সফল হয়নি, সেটা প্রত্যাশিতও ছিল না। উচ্চতর হিমালয়ে অভিযান করা সম্ভব কি অসম্ভব, তার কি সুবিধা-অসুবিধা সেইসব পরখ করে দেখাই ছিল এই প্রথম এভারেস্ট অভিযানের লক্ষ্য। সেদিক থেকে এই অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক।

এই অভিযানের একটা বড় সমস্যা দেখা দেয় মালপত্রবহন নিয়ে। প্রধানত নেপালী ও তিব্বতী মালবাহকদের সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। মূলশিবিরের পরে উচ্চতর হিমালয়ে এরা মালবহনের কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অভিযানের সহায়ক হবার পরিবর্তে, অসহ্য হয়ে এরা বরং প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে হলে অন্তত-সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত মালবহন করে সেখানে একটি

শিবির স্থাপন করতেই হবে। বিনা অক্সিজেনে চব্বিশ হাজার ফুটের উপরে মানুষ টিকতে পারে কিনা তাই তখনো স্থির হয়নি—সেখানে পিঠে বোঝা নিয়ে উঠতে হবে সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত তুষারাবৃত পর্বতপ্রান্ত বেয়ে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার জন্যই ডাক পড়ল শেরপাদের।

আগের বছরই সম্ভবত ছুটির বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন, ১৯২২ সনের দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযানের নেতা নির্বাচিত হন কর্নেল সি জি ব্রুস। ট্রায়াল দিয়ে দেখবার জন্য তিনি কয়েকজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযানও সফল হয়নি। কিন্তু শেরপারা সফল হয়েছিল। এই অভিযানে ওরা প্রায় ছাব্বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত মাল বহন করে নিয়ে যায়। আবহাওয়া যদি প্রতিকূল হয়ে না উঠত, বা সাহেবরা যদি সাহস করে ওদের উপর আরেকটু ভরসা রাখতে পারত, তাহলে ওরা সচ্ছন্দে সাতাশ হাজার ফুটেরও ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারত। সে যাই হোক, এর পর থেকেই শেরপারা হিমালয় অভিযানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়ল। অবশ্য শীঘ্রই এমন হয়ে দাঁড়াবে যে শেরপা সঙ্গে না নিয়ে হিমালয় অভিযানের কথা কেউ ভাবতেই পারবে না। যত সুনিপুণভাবেই মালবহন করে থাকুক না কেন, কেবল মালবহনের জন্য কখনো এতবড় সম্মান প্রাপ্য হতে পারে না।

যেসব শেরপা এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল আমরা তাদের একজনেরও নাম জানি না। ঠিক কয়জন শেরপা এই অভিযানের সঙ্গে ছিল তা-ও আমরা জানি না। এসব তথ্য যে কোনদিন কেউ জানতে চাইবে সেদিন সেকথা মনে করবারও কোন কারণ ছিল না। মজুরী দিলেই যাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচে যায় সেই মালবাহকদের আবার বংশপরিচয় কি। এজন্য সাহেবদের পরে অনুশোচনা করতে হয়েছে।

পর্বত আরোহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রথম যে চারজন শেরপার নাম জানা যায় তারা হলো—লাকপা ছেডি, নরবু ইয়েশে, সেমচুম্বি এবং লোবসাং টাশি। ১৯২৪ সনের তৃতীয় এভারেস্ট অভিযানের সময় এরা এভারেস্টের ছাব্বিশ হাজার আটশ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত মালবহন করে নিয়ে যায় এবং তাঁবুর জন্য জমি তৈরি করে সাহেবদের জন্য শিবির স্থাপন করে দিয়ে আসে। পিঠে বোঝা না নিয়ে ওরা আরও হাজার দুই ফুট উঠতে পারত কি? —এই অত্যন্ত সহজ ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি সাহেবদের মনেই আসেনি। অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই আসেনি।

এই তৃতীয় এভারেস্ট অভিযানও সফল হয়নি। উত্তরের পথ দিয়ে তিব্বত

হয়ে ব্রিটিশরা মোট সাতটা এভারেস্ট অভিযান করে—তার কোনটাই সফল হয়নি। কিন্তু প্রত্যেকটিই সার্থক হয়েছে। কেননা, এই ব্যর্থ অভিযানগুলোর অভিজ্ঞতার উপরই গড়ে উঠেছে পরবর্তীকালের হিমালয় অভিযানের অভ্রভেদী কীর্তিসৌধ। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কথা, এই অভিযানগুলো না হলে শেরপাদের ঐতিহ্যটাই অন্যরকম হয়ে যেত—এমন সুসমঞ্জস হত না। কিন্তু সেসব তখনো অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের কথা।

গোড়ার দিকে কিছুদিন পর্যন্ত শেরপারা অভিযানের বায়না নিয়ে দার্জিলিঙে আসত, আবার অভিযান শেষ হলেই সোলাখুম্বু ফিরে যেত। পায়ে হেঁটে যাওয়াআসাতে প্রায় একমাসের পথ। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হিমালয় অভিযানের আকর্ষণ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। অভিযানের সংখ্যা বাড়ল, শেরপাদের চাহিদা বাড়ল। হিমালয় অভিযান নিয়ে শেরপারাও এমন মেতে উঠল যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে।

কোন কোন শেরপা ঠিক কোন্ বছরে প্রথম এসে দার্জিলিঙে বসবাস করতে শুরু করল সেকথা কেউ স্মরণ রাখেনি। সাহেব-সুবো এবং রাজা মহারাজাদের সঙ্গে তো কতোরকমের লোকই আসে যায়—তার খবর কে রাখে! তবে এটা সুনিশ্চিত যে বিশের দশকের প্রথমার্ধের মধ্যেই জলাপাহাড়ের পূর্বদিকের গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ঢালটা ওরা মোটামুটি মনুষ্যবাসযোগ্য করে নিয়ে সেখানে ঘর-সংসার পেতে বসে গেছে। তারপর হিমালয় অভিযানে জনপ্রিয়তা যতো বাড়তে থাকে, দার্জিলিঙে শেরপার সংখ্যাও সেই হারে বাড়তে থাকে। শেরপারা এখন আর বছরের শেষে তো নয়ই, এমনকি দু-তিন বছরের মধ্যেও একবার দেশে যাবার ফুরসত পায় না। ক্রমে সোলাখুম্বুর সঙ্গে এদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে। এদিকে পর্বতারোহণ কেন্দ্র করে দার্জিলিঙের প্রবাসী শেরপারা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়ে তোলে। টুংসুং বস্তীতে নতুন বৌদ্ধগোম্ফা স্থাপিত হয়।

এইখানেই বলে রাখা দরকার যে একমাত্র পর্বতারোহণের কাজ ছাড়া অন্য কোন উপজীবিকার সন্ধানে শেরপারা কখনো সোলাখুম্বু ত্যাগ করে দার্জিলিঙে এসে ভিড় জমায়নি। বিশের দশক বা ত্রিশের দশকে নেপাল থেকে আসা পাহাড়ী উপজাতিদের জন্য ব্রিটিশ ভারতে নানারকম কাজের সুযোগ ছিল। কিন্তু ওরা তাতে প্রলোভিত হয়নি, সোলাখুম্বু ত্যাগ করেনি। পর্বতারোহণ ব্যাপারটিকে শেরপারা গোড়া থেকেই একটু বেশি সম্মান দিত, একটু বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

দার্জিলিঙে শেরপারা নতুন যে ঐতিহ্য গড়ে তুলল তার প্রধান স্থপতি হিসেবে যদি কোন একজনের নাম করতেই হয় তবে সে হল—আং থারকে। এই আং থারকে ও তার অনুগামী শেরপাদের ক্রিয়া-কলাপ এখন কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে আছে। সেই সময়কার হিমালয় অভিযানগুলোর উপর যেসব বই লেখা হয়েছে, সেসবই এখন ক্ল্যাসিক, তার সবকটিতেই আং থারকের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মাথায় পরিপাটি করে সাজানো তিব্বতী বেণী, মুখে সুপ্রসন্ন হাসি, এককথায় হিমালয়ের আদলে গড়া ব্যক্তিত্ব। কিন্তু কারো একা হাতে পুরোপুরি একটা ঐতিহ্য গড়ে ওঠে না। হিমালয় অভিযানের সেই স্বর্ণযুগে পশ্চিমে কারাকোরাম থেকে পূর্বে ব্রহ্ম-সীমান্ত যেখানেই কোন অভিযান হয় সেখানেই শেরপাদের ডাক পড়ে—সেখানেই শেরপা ঐতিহ্যের নতুন কোন একটা দিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এজন্য শেরপারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার কোন তুলনা নেই—অথচ সেকথা ওরা মনে রাখেনি। এক নাঙ্গা-পর্বতেই ১৯৩৪ সনে তুষার-ঝটিকার কবলে পড়ে এগারোজন শেরপার দেহান্ত হয়—অন্য কেউ হলে অতঃপর একটু সতর্ক হত—কিন্তু ১৯৩৭ সনে সেই নাঙ্গা-পর্বতেই আবার এক তুষারধসে নয় জন শেরপা জীবন্ত সমাধিস্থ হয়। কিন্তু পর্বতারোহণে তো এমন দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। —শেরপারা কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি। পাহাড়ে কারো জীবনান্ত ঘটলে শেরপারা তা খুব সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করে, বলে—মূর্তি বন্ গিয়া।

পাহাড়ে শেরপাদের কীর্তি-কাহিনীর কথা শত বললেও কিছুই বলা হবে না। সাহেবরাও সাহস করে এ কাজে হাত দেননি। একবার কেবল একজন স্বীকার করেছিলেন যে, "আমরা অভিযান করতে যাই শেরপাদের পিঠে চেপে, অভিযান থেকে ফিরে আসি শেরপাদের পিঠে চেপে—এবং তারপর ধীরে-সুস্থে একখানা রোমহর্ষক অভিযান-কাহিনী লিখে ফেলি।" এই স্বীকারোক্তিতে সামান্য আতিশয্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু শেরপারা যে জগতজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল তার এক রত্তিও অনর্জিত ছিল না।

কিন্তু খ্যাতির আজকাল যেমন বাজার-দর হয়েছে তখন তেমন ছিল না। একজন জগদ্বিখ্যাত শেরপা—বিলাতী কেতাবে যার কথা লেখা হয়েছে, ছবি ছাপা হয়েছে—তাকেও ঘোড়া নিয়ে খদ্দেরের আশায় ম্যালে ঘুরতে দেখা যেত। যতই সহানুভূতিশীল হোক না কেন, সাহেবরা কিন্তু শেরপাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নিয়ে কখনো তেমন মাথা ঘামায়নি। শেরপাদের দারিদ্র্যের বর্ণনা

করেছেন, কিন্তু সে-বেন শেরপাদের দুর্নাম হিসেবে।

তবে হিমালয়ান ক্লাবের তরফ থেকে শেরপাদের নামের একটা তালিকা করা হয়েছিল, কর্মক্ষমতা অনুযায়ী শেরপাদের মজুরীর হারও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া আরও একটা কাজ করেছিল হিমালয়ান ক্লাব—শেরপাদের মধ্যে যারা চব্বিশ হাজার ফুট বা তদূর্ধে মালবহন করে নিয়ে যেত তাদেরকে একটা করে ব্রোঞ্জের তৈরী 'টাইগার মেডাল' দেবার ব্যবস্থা করেছিল। এই মেডালটি শেরপাদের কাছে খুব গর্বের ও গৌরবের ব্যাপার ছিল, টাইগার বলে সম্বোধন করলে ওরা খুব সম্মানিত বোধ করত—এবং তা একটুও গোপন করত না। পশ্চিমী কেতায় সাহেবদেরও মনে হয়ে থাকবে যে শেরপাদের জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ওদের দারিদ্র্য ঘোচেনি।

এরই মধ্যে এসে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৮ সনের পর থেকে হিমালয়ে অভিযান আসা বন্ধ হয়ে গেল। আবার কবে অভিযান আসবে বা আদৌ আর আসবে কিনা সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা রইল না। পুরো চল্লিশের দশকটা শেরপাবৃত্তি শিকেয় তোলা রইল। শেরপারা ক্ষেত-খামার করে, জুয়ো খেলে, রকসি খায় আর রণক্লান্ত সাহেব-সৈন্যদের পিছন পিছন ঘোড়া নিয়ে ম্যালে ঘুরে বেড়ায়। শেরপারা এরপর শেরপার কাজ কতটুকু করতে পারবে তা নিয়ে সংশয় ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিমালয়ে প্রথম বড় মাপের অভিযান আসে ১৯৫০ সনে। বিশ্ব-রাজনীতির ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ততদিনে তিব্বতের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং নেপালের পথ খুলে গেছে। নেপালের অধিকাংশ এলাকাতেই তখনো পর্যন্ত কোন জরিপের কাজ হয়নি। মানচিত্রের উপর বিশাল বিশাল কালির ছোপ। ওই অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু ডজন দুই পর্বতশীর্ষ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেইসব পর্বতের নামগুলো ছাড়া আর কিছুই তখনো জানা নেই। কোন বড়ো পাহাড়ে অভিযান করতে হলে সেই পাহাড়ের ভৌগোলিক বৃত্তান্তগুলি প্রথমেই সংগ্রহ করে নিতে হয়। এভারেস্ট পর্বতটিকে চেনবার এবং জানবার জন্যই ব্রিটিশদের প্রথম এভারেস্ট অভিযান সংগঠন করা হয়েছিল—শীর্ষে আরোহণের কোন পরিকল্পনা সেই অভিযানের ছিল না। নেপালের দরজা খুলে যাবার পরেও ব্রিটিশরা কোনরকম তাড়াহুড়ো করল না—বীরেসুস্থে অগ্রসর হল। ওরা ঠকেনি, হিমালয়ের সবচাইতে মূল্যবান পুরস্কারটি ওরাই অর্জন করেছিল।

ফরাসীদের অতটা ধৈর্য ছিল না। হিমালয় অভিযানে ফরাসীরা গোড়া

থেকেই অনেকটা পিছিয়ে ছিল, এমনকি ইতালীয়দের চাইতে অনেকদূর পিছনে। তার উপরে চূড়ান্ত অবমাননার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে ওদের জাতীয়তাবোধ তখন সম্পূর্ণ বেপরোয়া। নেপালের দরজা খুলতেই ওরা প্রায় সাতাশ হাজার ফুট উঁচু অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ জয় করবে বলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল। এর আগে এত উঁচু পাহাড়ে কোন মানুষ আরোহণ করেনি, তাছাড়া নেপালের ভূগোল, নেপালের আবহাওয়া সবকিছুই অজানা। দার্জিলিঙের শেরপারা সঙ্গে ছিল তাই রক্ষা—নইলে একটা বড়ো মাপের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে ফরাসী-ঔদ্ধত্যের মূল্য পরিশোধ করতে হত।

ঘটনাক্রমে এই অন্নপূর্ণা অভিযানেরও শেরপা সর্দার ছিল জনৈক আং থারকে। সেই এভারেস্টখ্যাত আং থারকে নয়—শেরপাদের মধ্যে তখনো বংশ-পদবীর প্রচলন হয়নি। শেরপাদের সমাজে তখনো শ্রেণীভেদ ঘটেনি, তাই পৃথক বংশ পরিচয়েরও কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন তার প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু সেকথা আরও পরে।

সেবার অন্নপূর্ণা অভিযান করতে এসে ফরাসীদের প্রথম দুমাস সময় কেটে গেল অন্নপূর্ণা পর্বতটিকে খুঁজে বের করতেই। পাহাড়ের মুখোমুখি উপস্থিত হবার আগেই ছোটা-বরসাত শুরু হয়ে গেল। নেপাল হিমালয়ে বর্ষার দুর্যোগ যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে আছড়ে পড়ে সে সম্পর্কে তখনো বিশেষ কিছু জানা ছিল না, তাছাড়া পাহাড়টি খুঁজে পেয়ে ওরা তখন উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে। যা থাকে কপালে বলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। গোঁয়ার্তুমি করে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু শেষপর্যন্ত বিপদে পড়তেই হয়। ফরাসীদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটল না। একটানা মন্দ আবহাওয়ার পর অন্নপূর্ণা শীর্ষ অবশেষে যখন প্রায় সহজ নাগালের মধ্যে তখন হঠাৎ বর্ষা এসে গেল। অন্নপূর্ণা অভিযানের পুরো দলটা তখন চব্বিশ হাজার ফুট থেকে ছাব্বিশ হাজার ফুটের মধ্যে ছত্রখান হয়ে আছে—কেউ তাঁবুর ভিতরে বরফের চাপে হাঁসফাঁস করছে, কেউবা তুষার-ফাটলের মধ্যে নিঃসঙ্গ খুঁকছে—সকলেই তুষারক্ষতে জর্জরিত। কে কাকে রক্ষা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রথম বড়ো মাপের হিমালয় অভিযানটি তখন একটি বড়ো মাপের ট্র্যাজেডিতে পরিণত হতে চলেছে। এ-ব্যাপারে হিমালয়ের বা বর্ষার দোষ ধরবার উপায় নেই—ওরা অপ্রত্যাশিত কিছু করেনি, আর যা করেছে তা আগে থাকতে নোটিশ দিয়েই করেছে।

একটা বড়ো মাপের ট্র্যাজেডি হবার পরিবর্তে অন্নপূর্ণা অভিযান যে

পর্বতারোহণের ইতিহাসে একটা বড়ো খাপের বিজয়কীর্তি হয়ে আছে তার ষোলো আনা কৃতিত্ব দার্জিলিঙের শেরপাদের। এমন বা এর চাইতেও নির্মম বিপর্যয় এর আগেও পাহাড়ে ঘটেছে, কিন্তু এমন দুঃসাহসিক এবং সম্পূর্ণরূপে সফল একটি রেসক্যু-অপারেশান এর আগে বা পরে আর কখনো হয়নি। ছাব্বিশ হাজার ফুটের উচ্চতা থেকে, অতি-দুর্গম পাহাড়ের গা বেয়ে, বর্ষায় প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে—কখনো হাত ধরে, কখনো কাঁধে করে, কখনো সলীপিং ব্যাগ দিয়ে স্লেজ-মতো তৈরি করে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে, কখনো দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে উপর থেকে আস্তে আস্তে ঝুলিয়ে দিয়ে—একজন একজন করে অন্নপূর্ণা অভিযানের আহত অভিযাত্রীদের যে কতোটা ফটিচ্যুডের সঙ্গে নীচের নিরাপত্তায় নামিয়ে আনা হয়েছিল পর্বতারোহণের ইতিবৃত্তে তা একটা মহাবিস্ময় হয়ে আছে।

না, সুদীর্ঘ বারো বছরের ব্যবধানে শেরপাদের কর্মকুশলতা এতটুকুও কমেনি, বরং বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। এখন আর সাহেবদের হুকুমের প্রয়োজন হয় না, শেরপারা এখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলতে পারে।

এরপরেই ১৯৫৩ সনের সেই সাড়া-জাগানো এভারেস্ট বিজয়। অন্নপূর্ণা অভিযানের কথা মনে রাখলে তারপরে পর্যায়ক্রমেই এভারেস্ট-শীর্ষ এসে যেতে বাধ্য। কিন্তু অতো হিসেব করে আর কে কবে বিস্মিত হয়। মানুষ শেষপর্যন্ত এভারেস্টের চূড়ায়ও চড়ে বসল! তারপরে আর মানুষের অপর কোন কীর্তি অমনভাবে সব মানুষকে বিস্ময়-বিহ্বল করেনি—না, চন্দ্রে অবতরণও নয়।

স্কট ও আমুণ্ডসেন এই দুটি নামের সঙ্গে হিলারী ও টেনজিং এই দুটি নামও মানুষ দীর্ঘদিন স্মরণ রাখবে। এখন আর মনে নেই, কিন্তু সেই সময়ে, সেই ১৯৫৩ সনে হিলারীর চাইতেও বেশি, অনেকগুণ বেশি, আনন্দ ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল টেনজিং। হিলারী তো সাহেব, আর সাহেবরা তো অসম্ভবকে সম্ভব করতেই পারে। কিন্তু টেনজিং ভারতীয়, তদুপরি একজন শেরপা। ব্রিটিশদের সংগঠন-শক্তি ও বদান্যতার কথা স্বীকার করে নেবার পরেও সকলেই কবুল করেছিল যে দৈব প্রভাবেই এমনটি না হয়ে উপায় ছিল না। হিমালয় অভিযানের এই যে জয়জয়কার—শেরপাদের দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক সহযোগিতায়ই তা সম্ভব হয়েছে। অখ্যাত-বিখ্যাত অনেক শেরপার সাধনার জোরেই টেনজিং এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেছে। হিলারী যেমন পূর্ববর্তী সব পর্বতারোহীর প্রতিনিধি, টেনজিংও তেমনি পূর্ববর্তী সব শেরপাদের প্রতিনিধি। শেরপা ঐতিহ্যের সেইটে

সবচাইতে গৌরবময় প্রহর। এহেন শুভক্ষণে ভাগ্যদেবী স্বভাবসুলভ চপলতায় একটু মুচকে হেসে থাকেন, এক্ষেত্রেও হেসেছিলেন—তবে তখনই তা কারো নজরে পড়েনি।

এরমধ্যে ভারতবর্ষ একটু মুশকিলে পড়ল। বিশ্বের সেরা পর্বতারোহী একজন ভারতীয় নাগরিক, অথচ ভারতবর্ষে তখনো পর্যন্ত পর্বতারোহণের কোন অস্তিত্বই নেই। অপরদিকে, টেনজিং সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে বিশ্ববাসী জানতে পারল যে টেনজিং-এর বউ আয়ার কাজ করে তবে সংসার চালায়। বিশেষ করে শেরপাদের দারিদ্র্য নিয়ে সেই সময় বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় অশ্রু-বিসর্জনের রেষারেষি লেগে গিয়েছিল।

যত শীঘ্র সম্ভব এই কলঙ্কমোচনের ব্যবস্থা করা দরকার। পর্বতারোহণের মতো একটা দৈব ও প্রকৃতিনির্ভর উদ্যোগ গড়ে তোলা এবং শেরপাদের পুরুষানুক্রমিক দারিদ্র্য দূর করা—সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, গ্যারান্টি দিয়ে, এই দুটি অতি-জটিল কাজ সমাধা করবার এলেম এদেশে কেবল আমলাতন্ত্রেরই আছে। আমলাতন্ত্রের তত্ত্বাবধানে এদেশে পর্বতারোহণের যে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন থাকলেও এখানে তা একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে। অতএব শেরপাদের ও শেরপাবৃত্তির অতঃপর কি দশা হল সেইটেই দেখা যাক।

আক্ষরিক অর্থে অভ্রভেদী গৌরব নিয়ে টেনজিং যেদিন দার্জিলিঙে ফিরে এল পুরো টুংসুং বস্তী সেদিন অজস্র অগণ্য লুংদার মানে প্রেয়ার ফ্ল্যাগ টাঙিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। শেরপারা চিরদিন যেমন করে এসেছে টেনজিংও হয়তো তেমনি এভারেস্ট জয়ের গৌরবটা গোষ্ঠীর অন্য সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়ে আবার কাজে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু এবারে আর টেনজিংকে তার কোন সুযোগই দেওয়া হল না।

কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিকের তরফ থেকে চাঁদা তুলে টেনজিংয়ের জন্য টুংসুং বস্তীর বাইরে, দার্জিলিঙের অভিজাত এলাকায় একটি বাড়ি করে দেওয়া হল। সেই হালফ্যাশনের ছিমছাম বাড়িতে যথোপযুক্ত আড়ম্বরের সঙ্গে সংসার সাজিয়ে বসবার মতো নগদ অর্থেরও অভাব রইল না। পর্বতারোহণ বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য এদেশে প্রথম যে সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হল—মোটা মাইনের বিনিময়ে টেনজিংকে করা হল তার ডিরেক্টর অব ফীল্ড ট্রেনিং। পদাধিকার বলে একটি জিপগাড়িও টেনজিংয়ের দখলে এল। একধাক্কায় টেনজিংকে শেরপা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন

করে এনে একজন 'হিরো' করে দেওয়া হলো। সবশেষে আমলাদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় যখন শেরপাদের ও শেরপাবৃত্তির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ঘটা করে শেরপা ক্লাইম্বারস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করা হলো তখন তারও নায়ক 'নির্বাচিত' হল টেনজিং। এতসবের পরেও কেউ বলুক দেখি যে শেরপাদের জন্য এদেশে কিছুই করা হয় না।

এতদিন পর্যন্ত ছোট বড় সব অভিযানের জন্যই শেরপা নির্বাচন করত হিমালয়ান ক্লাবের সাহেবরা—নিয়োগ-কেন্দ্র ছিল দার্জিলিঙের প্ল্যান্টার্স ক্লাব। অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর হিমালয়ান ক্লাবের আর এ-ব্যাপারে কোন এক্তিয়ার রইল না। টেনজিংকে সামনে রেখে শেরপাদের কাজকর্মের নতুন মুরুব্বি হল প্রতিরক্ষা দপ্তরের আমলারা। শেরপা সমাজের উপর খবরদারি করবার পরোয়ানা পেয়ে যদি টেনজিঙের মাথা কিছুটা ঘুরে গিয়ে থাকে তবে সেজন্য টেনজিঙের দোষ ধরা ঠিক হবে না। বৃহত্তর ক্ষমতালাভের পর বিচক্ষণ ব্যক্তিরও মাথা ঘুরে যাবার ঘটনা এদেশে অনেক ঘটেছে এবং ঘটছে।

শেরপারা কিন্তু এই নয়া ব্যবস্থা একেবারেই মেনে নেয়নি। মেনে নেবার কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি ওদের। বাইরে থেকে গায়ে পড়ে কারো উপকার করতে গেলে যা হয় এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে—শেরপা সমাজ ছারখার হয়ে গেছে। আমরা যখন নন্দাঘুন্টি অভিযান করি—১৯৬০ সালে—শেরপা সমাজ তখন এই সঙ্কটে তোলপাড়। ঘটনাপ্রবাহে আমরাও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সুসন্নিবদ্ধ শেরপা সমাজ প্রথম যখন অসংলগ্ন হয়ে পড়তে শুরু করল, আমরা তখন তা খুব কাছে থেকে—প্রায় অংশীদার হিসেবে—ঘটতে দেখেছি। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবৃত করলে শেরপা সমাজের এই জটিল সঙ্কটটি বুঝতে সুবিধা হবে।

এদেশে পর্বতারোহণের তৎসাময়িক কর্তাব্যক্তিরা আমাদের নন্দাঘুন্টি অভিযানের উপর সদয় ছিলেন না। অভিযানটি বন্ধ করে দেবার সাধ্যমত চেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। ওঁদের হাতে শেষ অস্ত্র ছিল পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম—এদেশে ওঁরাই তার একমাত্র সরবরাহকারী। ওঁরা আমাদের যেসব সাজ-সরঞ্জাম দিতে সম্মত ছিলেন তাতে অভিযান হয় না, অভিযান বানচাল হয়। তার মধ্যেও আবার শর্ত ছিল—শেরপা নিয়োগ করতে হবে শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যস্থতায়। পর্বতারোহণ বিষয়ে নিজেদের অনভিজ্ঞতার কথা আমাদের অজানা ছিল না। যাতে কোন সঙ্কটজনক বিপর্যয়ে না পড়ি, সেজন্য

আমাদের কয়েকজন খুব অভিজ্ঞ শেরপার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি টেনজিং নোরগে আমাদের অভিযানের জন্য যেসব শেরপার নাম প্রস্তাব করে তারা সকলেই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। সেই সঙ্গে টেনজিং আমাদের কাছে কিছু সাজসরঞ্জামও সস্তাদরে বিক্রি করবার চেষ্টা করে—সেই সাজ-সরঞ্জাম কোথা থেকে সংগৃহীত তা বুঝতে কোন অসুবিধে ছিল না। কর্তৃপক্ষ ও টেনজিং স্পষ্টতই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছিল।

নন্দাঘুন্টি অভিযানের যখন এমন উভয়-সঙ্কট অবস্থা তখনই নাঙ্গা-পর্বত খ্যাত আংশেরিঙের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। আংশেরিঙের বয়স তখন ছাপ্পান্ন অতিক্রম করেছে। নন্দাঘুন্টি অভিযান নিয়ে আংশেরিং এমন মেতে উঠল যে আমরাও মাঝে মাঝে অপ্রস্তুত বোধ করতাম। নন্দাঘুন্টির সঙ্গে যাবার জন্য আংশেরিঙ আরও দু'জন প্রবীণ শেরপা-শার্দূল সংগ্রহ করেছিল—অন্নপূর্ণাখ্যাত আজিবা এবং কাঞ্চন-জংঘাখ্যাত পেম্বা নরবু। এই তিন জনের ঐকান্তিক চেষ্টায়ই—একটুও বাড়িয়ে বলছি না—আমাদের নন্দাঘুন্টি অভিযান সফল হয়েছিল। নন্দাঘুন্টির মতো অপেক্ষাকৃত নিরীহ একটি অভিযানের জন্য ওরা যে অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল তার একটাই কারণ—ওরা দেখাতে চেয়েছিল যে কর্তৃপক্ষ ও টেনজিঙের সহযোগিতা ছাড়াই এদেশে পর্বত অভিযান করা সম্ভব। শেরপারা স্মারক-লিপি দাখিল করতে জানে না, ওদের প্রতিবাদের ভাষা ভিন্নরকম।

টেনজিঙের প্রতি এইসব প্রবীণ শেরপার যে মনোভাব আমরা লক্ষ্য করেছি তা ঈর্ষা নয়, আক্রোশও নয়, তা নির্ভেজাল ঘৃণা। সাহেবদের সবাইর কাছ থেকে শেরপারা যে সবসময় ভাল ব্যবহার পেয়েছে তা নয়, নতুন জমানার সাহেবরা যদি একটু বেশি কায়দা দেখায় তবে তাও ওরা উপেক্ষা করতে পারে—কিন্তু টেনজিঙের শেরপা-ঐতিহ্য-বিরোধী কাজ ওরা একেবারেই বরদাস্ত করেনি।

শেরপাদের মধ্যে যারা বয়সে, অভিজ্ঞতায় ও বিচক্ষণতায় প্রবীণ তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যদি শেরপা ক্লাইম্বারস অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলা হত তাহলে আর কোন গোলমাল থাকত না। কিন্তু তা হল না। টেনজিংকে শেরপা-সমাজের বাইরে টেনে এনে ওর উপরই সব দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল। কিন্তু শেরপারা চিরদিনই খুব স্বাধীনচেতা, ওদের আত্মসম্মান বোধ খুবই স্পর্শকাতর। টেনজিঙের মত বয়সে, অভিজ্ঞতায় ও বিচক্ষণতায় দ্বিতীয় সারির একজন শেরপার ছড়ি ঘোরানো ওরা মেনে নিতে পারেনি।

নন্দাঘুন্টি অভিযানের সাফল্যের পর অবস্থা আরও জটিল হল। এই সাফল্যের

পর হিমালয়ান ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ আমাদের উপর দারুণ চটে গিয়েছিলেন—গত বাইশ বছর ধরে তার ঝাঁঝ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের এখনও মাঝে মাঝে শুনতে হয় যে বাঙালীরা কারণে-অকারণে বড়ো চেঁচামেচি করে। প্রতিবাদ করলে সেটিকেও কলহপ্রিয়তার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে আমরা এসবের মোকাবিলা করতে পারি, আমলারা তো আসলে আমাদের সগোত্রেরই লোক।

অপরদিকে টেনজিঙের আহত ক্রোধটা গিয়ে পড়ল প্রবীণ শেরপাদের উপর। পক্ষপাতিত্ব আগেও ছিল এখন তা আরও কঠোর এবং নিষ্ঠুর হল, সাহিবদের সাক্ষী রেখে তোষামোদ না করলে তাও গ্রাহ্য হয় না। নন্দাঘুন্টির সাফল্যের পর প্রবীণ শেরপারাও যেন নতুন করে নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। উভয়ের মধ্যে বিরোধটা অগত্যা বাড়তেই থাকল। আর সেই ব্যবধানটা ভরে উঠল অবিশ্বাস, সন্দেহ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি দিয়ে। দার্জিলিঙের শেরপা সমাজ সেই ১৯৬০ সনের আগে থেকেই ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ সেদিকে নজর দেয়নি, কেউ সতর্ক করতে গেলে তাকে বলা হয়েছে বাগড়াটে।

এদিকে নন্দাঘুন্টি অভিযানের সাফল্যের পর দেশজুড়ে হিমালয় অভিযানের হাওয়া বইতে শুরু করল। ঈশ্বর মারা যাবার পর তীর্থযাত্রার আর কোন অজুহাত ছিল না, পর্বতারোহণের অজুহাতে আবার নতুন করে হিমালয় যাত্রা শুরু হল। শেরপাদের কাজের সুযোগও অনেকগুণ বেড়ে গেল। আগে বিদেশ থেকে বছরে বড়জোড় এক ডজন হিমালয় অভিযান হত। এখন কেবল এদেশ থেকেই বছরে কয়েক ডজন অভিযান হয়। শেরপাদের চাহিদা যত বাড়ল টেনজিঙের প্রতাপও তত বাড়ল—আর সেই সঙ্গে বাড়ল অসহিষ্ণুতা। সামান্যতম অবাধ্যতার জন্য প্রতি-প্রতিসম্পন্ন শেরপাদের বছরের পর বছর কোন কাজ মেলেনি। দু-চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া টেনজিঙের কাছে কেবল তারাই প্রশ্রয় পেত যাদের প্রকৃত শেরপা হবার যোগ্যতা নেই।

এইবার শেরপা সমাজ যে সংকটে পড়ল তার তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের সংকটটি নেহাতই তুচ্ছ। যত অনিশ্চিতই হোক যুদ্ধের শেষ আছে। কিন্তু এই নয়া ব্যবস্থার শেষ কোথায়? হাকিম নড়লেও হুকুম তো নড়বে না—টেনজিং সরে গেলে তখন ছড়ি ঘোরাবার জন্য নতুন লোকের অভাব হবে না। দালালি জিনিসটা আমাদের যেমন আসে, শেরপাদের তেমন আসে না। উপায় নেই তাই পর্বতারোহণের আদর্শ বহুলাংশে খাটো করে, কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রেখে—আমরা এখনো অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। শেরপারাও যদি নিজেদের ঐতিহ্যটিকে কেটেছেঁটে

নতুন অবস্থার সঙ্গে রফা করে নিত তবে তার পরিণাম কি দাঁড়াত তা ভাবতেও গা ঝি-ঝি করে ওঠে।

সেই অপমান থেকে ভগবান শেরপাদের রক্ষা করেছেন। ষাটের দশকের গোড়ার দিকেই চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। দুর্গম ও উচ্চতর হিমালয়ে চৌকি দেবার জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীন স্থায়ী পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হল। এই বাহিনীর জন্য উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করা খুব সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তিনটি কারণে শেরপাদের একাজে খুব কদর হল—উচ্চতা ওদের কাছে কোন সমস্যা নয়, ওরা তিব্বতী ভাষা জানে আর ওদের আনুগত্য সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত। নর্থ হিলে ধর্না না দিয়ে শেরপারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জলাপাহাড়ে ভিড় করতে লাগল।

শেরপাবৃত্তির মৃত্যু ঘটল, কিন্তু অপমৃত্যু এড়ান গেল। বোধহয় এমনটা হবেই ঠিক হয়েছে। মহৎ আদর্শগুলি এমন করেই চিরভাস্বর হয়ে থাকে।

হিমালয়ের নিঃসঙ্গ পথিক

গত এগার জানুয়ারী উষালগ্নে দার্জিলিঙে মণীন্দ্রনাথ সেন হিমলোকে চলে গেলেন। তাঁর একানব্বুই বছর বয়স হয়েছিল। অমন সুদীর্ঘকাল ধরে হিমালয়ের সৌন্দর্যে এবং রহস্যে তন্ময় হয়ে থাকবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। মণীন্দ্রনাথ সেই সৌভাগ্য নিজের সাধনার জোরে অর্জন করেছিলেন।

এ দেশে পর্বতারোহণের শুভাগমনের আশায় দু-চার জন যাঁরা বহুদিন আগে থাকতে জমি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন মণীন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম। এদেশে পর্বতারোহণের প্রথম সংস্থা দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, মণীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও পরামর্শেই গড়ে উঠেছে। এদেশের প্রথম বেসামরিক পর্বত অভিযান—নন্দাঘুন্টি অভিযান—মণীন্দ্রনাথ ক্ষেপিয়ে না তুললে এবং সক্রিয় সহায়তা না করলে সেটিও সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

হিমালয়ের এই প্রবাদ-পুরুষ যেদিন হিমলোকে যাত্রা করলেন সেই এগার জানুয়ারী দার্জিলিঙের ইনস্টিটিউটে ৩৯ তম অ্যাডভেঞ্চার কোর্সের গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনি অনুষ্ঠিত হয়। বেলা নয়টার আগে শোকসংবাদটা ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল এ কে চৌধুরীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল—সমাবর্তন উৎসব তখনো শুরুই হয়নি। এহেন অবস্থায় অনুষ্ঠান শুরুর আগে একটি নিষ্প্রাণ শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে হাঁদার মতো দু-মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান থাকবার একটা রেওয়াজ এদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে মণীন্দ্রনাথের জন্য কোন শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সংবাদটি ঘোষণা করা হয়নি। এমন সময়ে মনীন্দ্রনাথের নামটি বিস্মৃত হওয়া কেবল বিস্ময়কর নয় বিভ্রান্তিকরও। অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা সুযোগ্য পূর্বপুরুষের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হবে সেটা বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই বিদ্বেষটা চাপা দেবার জন্য প্রচলিত প্রশস্তি বাক্যগুলো কেন উচ্চারণ করা হল না? বিভ্রান্তিটা সেইখানে। মণীন্দ্রনাথ বাঙালী ছিলেন এবং সেজন্য কিছুমাত্র লজ্জিত ছিলেন না। ভাগ্যদোষে প্রিন্সিপ্যাল এ. কে. চৌধুরীও একজন বাঙালী। বাঙালী হয়ে অন্য কোন বাঙালীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করাটাকে কোন কোন বাঙালী প্রাদেশিকতা-দোষ বলে বিবেচনা করেন। শুনেছি এই একই কারণে কেউ কেউ এমনকি

সত্যজিৎ রায়ের ছবিও তারিফ করতে ভয় পান। সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে মণীন্দ্রনাথের নামটা বাদ পড়বার কারণও কি সেইটাই? তাহলে সর্বভারতীয় এ. কে. চৌধুরীকে অভিনন্দন জানাই।

ঘটনাটির কথা শুনলে মণীন্দ্রনাথ অবশ্যই ঘর ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠতেন। মর্ত-জগতের অনেক বড়ো বড়ো বঞ্চনা তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। শোকপ্রস্তাবটি হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখলেও তিনি নিশ্চয়ই কৌতুকবোধ করতেন।

মণীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯০ সনে। কলকাতার বোসপাড়া অঞ্চলে। বাল্য ও কৈশোর কেটেছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হয়েছিলেন, মন বসাতে পারেননি, তিন বছর পড়ে ছেড়ে দেন। প্রচলিত পথে চলতে দারুণ বিতৃষ্ণা, অথচ নিজের পথ কোন্‌টা তাও জানা নেই। ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক ছিল. কিন্তু তাতে তো আর পেট চলবে না। তবুও ভর্তি হলেন বউবাজারের আর্ট কলেজে। পাঁচ বছরের কোর্স তিন বছরে সম্পূর্ণ করলেন—গুটিকয়েক পদকও লাভ করলেন। কিন্তু জীবন তখনো দিশাহীন! আর্ট কলেজে পড়তে পড়তেই কোথা থেকে একটা ক্যামেরা হাতে এসেছিল—সেই আমলের অতি সাধারণ একটা ক্যামেরা। ফটোগ্রাফীতেও বেশ কিছু পদক পুরস্কার অর্জন করলেন—কিন্তু মনে তবুও হাহাকার। হিমালয়ের কথা ভূগোলের বইয়ে পড়েছেন, কিন্তু তার সঙ্গে যে অন্য কোনরকম বোঝাপড়ার অবকাশ অথবা আবশ্যকতা আছে তা জানতেন না। হঠাৎ ডাক এল।

কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দার্জিলিঙে এক সাহেব স্টুডিওতে (পার্ক অ্যাণ্ড বার্লিংটন?) একটা চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। ফেরত ডাকেই নিয়োগপত্র এসে গেল। কিন্তু তখনও সেটিকে হিমালয়ের পরোয়ানা বলে বুঝতে পারেননি। আজ থেকে সত্তর বছর আগে আশি টাকা মাইনের চাকরি—ভেবেছিলেন, কিছুদিন করে দেখলে ক্ষতি কি! কিন্তু দার্জিলিঙে পৌঁছেই বুঝতে পারলেন যে ঘটনা আরও অনেক বেশি গুরুতর।

দার্জিলিং তখন সাহেব-সুবো আর রাজা-মহারাজাদের দার্জিলিং। শহর তো নয়, যেন একখানা ক্রীসমাস কার্ড—হঠাৎ সজীব হয়ে উঠেছে। ঝকঝকে তকতকে রাস্তা-ঘাট, বসত বাড়িগুলো ছবির মতো, চতুর্দিকে পাইন, দেওদার রডোডেনড্রন এবং আরও অজস্র রকমের জানা-অজানা গাছ-গাছালি। উত্তর দিগন্ত জুড়ে, দেবলোকের ওধারে, কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতমালার উপর প্রভাতে সূর্যোদয় হয়,

গিয়াছে সূর্যাস্ত। চারদিকে কেবল রঙ আর রঙ।

রঙের প্রতি মণীন্দ্রনাথের সহজাত আসক্তি। অর্থকরী হবে না বলে যেটিকে এতকাল বহু ক্লেশে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল দার্জিলিঙে পৌঁছবার অল্পদিনের মধ্যেই সেটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চাকরি করা দায় হল। কাজটা নিখুঁত করেন, কাজও তাই বাড়তেই থাকে। দিনের বেলাটা স্টুডিওর অন্ধকারেই কেটে যায়। রঙের বন্যায় অবগাহন করবেন, রঙের রহস্য আবিষ্কার করবেন, রং-এর দ্যোতনা ছবিতে ফুটিয়ে তুলবেন—তার সময় কোথায়?

অবশেষে তৎকালীন সন্তোষের রাজার ভরসা পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। জন্ম নিল—সেনস স্টুডিও। সাহেবদের স্টুডিওর কর্মনিপুণতার আড়ালে কার উপস্থিতি সেটা রাজা-মহারাজাদের জানা ছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ভরসা করেই ধার-দেনা করে দোকান খোলা। কিন্তু এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যার কথা বলতে গিয়ে মনীন্দ্রনাথ বুড়ো বয়সেও হেসে কুটি-কুটি—যাঁরা ওঁকে স্টুডিও খুলবার উৎসাহ জুগিয়েছিলেন তাঁরা সবাই অল্পদিনের মধ্যেই আবার সাহেবের স্টুডিওতে ফিরে গেলেন—কাজ ভালো-মন্দ যাই হোক, সাহেবের স্টুডিওতে ঢুকলে-বেরোলেও ইজ্জত বেড়ে যায়।

কিন্তু মণীন্দ্রনাথ ফাঁপরে পড়বার আগেই ঘটনার শেষাংশ উদ্ঘাটিত হয়েছিল—ঘটনার মজাও সেইখানে। সেন্স স্টুডিওর সঙ্কট যখন ঘনীভূত হয়ে আসছে সেই সময়ে একদিন হঠাৎ গভর্নরের সাহেব এ ডি সি এসে হাজির। সাহেব স্টুডিওর কাজে ওঁরা আর সন্তুষ্ট নন। মিঃ সেন কি গভর্নরের ছবি তুলতে পারবেন? মণীন্দ্রনাথের মেজাজ-মর্জি ভালো ছিল না। একে তো দোকান ভালো চলছে না, তার উপরে আগে যেটুকু বা ছবি আঁকার সময় পেতেন এখন সেটুকুও দোকানের চিন্তায় ব্যয় হয়ে যায়। বললেন, একজন ভুটিয়ার ছবি যদি তুলতে পারি, তবে একজন গভর্নরের ছবি কেন তুলতে পারব না? ব্যস সেই থেকে গভর্নরের বাড়ির দরজা খুলে গেল। তারপরে একে একে রাজা-মহারাজারাও আবার মণীন্দ্রনাথের প্রতিভা নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন।

এর পর অল্পদিনের মধ্যেই মণীন্দ্রনাথের পেশা এবং নেশা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠল। গ্রীষ্মে আর শরতে সপরিষদ লাটসাহেব যখন দার্জিলিঙে আগমন করেন—তিনি তখন স্টুডিওর কাজে ব্যস্ত। কিন্তু মরসুম ফুরোলেই তখন আলাদা মানুষ—মৌসুমী ফুলের মতোই কোথায় উধাও হয়ে যান। প্রথমদিকে একা একা যেতেন পিঠে হাভারস্যাক ঝুলিয়ে। সঙ্গে থাকতো রং, তুলি, ক্যানভাস আর

আর কিছু খাত। যখন ফিরে আসতেন তখন প্রত্যেকটি ক্যানভাসে হিমালয়ের রং-ঢালা নতুন এক-একটা ছবি—চেতনা জুড়ে বাঁধাভাঙা রঙের বন্যা। ক্রমে ক্ষুধা থাকল গ্রহণ করবার ক্ষমতা বাড়ল, নিরুদ্দেশের কালও দীর্ঘতর হল। এখন সঙ্গে দু-তিন জন শেরপা থাকে, আর থাকে সুদূর-দুর্গম হিমালয়ে কিছুদিন কাটাবার মতো কিছু বাহুল্যবর্জিত জিনিসপত্র। পরবর্তীকালে যেসব শেরপা জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে তাদের সকলেই, হ্যাঁ স-ক-লে-ই, একসময়ে সেন সাহেবকে মদত দিয়েছে। টেনজিং আজও সুযোগ পেলেই অন্তরঙ্গদের কাছে সেন-সাহেবের সঙ্গে সেসব দিনের কথা বলে বাহবা নেয়।

মণীন্দ্রনাথ প্রচলিত অর্থে পর্বতারোহী ছিলেন না—হবার বাসনাও ছিল না। পাহাড় দেখবার সবচাইতে ভালো জায়গা যে পাহাড়ের শীর্ষদেশটি নয় শিল্পী-হিসাবে তা তিনি জানতেন। কিন্তু হিমালয়ের দুর্গমতর অধিকতর বিপজ্জনক উপত্যকাগুলো তাঁকে যেন নিশির ডাকের মতো টেনে নিত। যে পথে কেউ যায় না, যে পথের বিপদ-আপদ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই, যে পথের শেষ কোথায়—শেষে কী—তাও জানা নেই—মণীন্দ্রনাথের সেই পথেই যাওয়া চাই। সিকিম থেকে, ভুটান থেকে, নেপাল থেকে এক কাঞ্চনজঙ্ঘারই যে নতুন নতুন কত অজস্র রূপ ক্যানভাসে ধরে নিয়ে এসেছেন তা প্রায় হিমালয়েরই মতো বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। মণীন্দ্রনাথ অভিযানে যেতেন না, সমান দুর্গমতা অতিক্রম করে তিনি যেতেন অভিসারে। তিনি পর্বত-অভিযাত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন পর্বত-অভিসারী।

হিমালয়ের রং নিয়ে কিছুদিন নাড়া-চাড়া করবার পরই মণীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে হিমালয় শুধু তার রং নয়, সত্যিকারের হিমালয়কে ছবিতে আনতে হলে সামগ্রিকভাবে হিমালয়কে জানতে হবে। কাজটা আপনা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ছবি আঁকার মতোই নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিমালয়ের গাছপালা পশুপাখি, লোকজন, নদনদী, শিলা প্রস্তর—সবকিছুই ক্রমে ধরা দিতে শুরু করল। রডোডেনড্রনের স্বভাব চরিত্র এতদূর পর্যন্ত অনুধাবন করেছিলেন যে আমেরিকার সুবিখ্যাত রডোডেনড্রন সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। মণীন্দ্রনাথের পরামর্শ উপেক্ষা করে দার্জিলিঙের চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকশত দুর্লভ পাখির জীবননাশ করেছেন। পাহাড়ী লোকদের জন্য তাঁর যে গভীর ভালোবাসা ছিল তা বহুদিন বহু বহু শেরপার হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলবে।

একদিকে যখন মহোৎসাহে হিমালয় আবিষ্কারের কাজ চলছে, ঠিক তখনই অপরদিকে আরও একটা ঘটনা ঘটে গেছে। মণীন্দ্রনাথের তোলা ছবির চাইতে আঁকা ছবির চাহিদা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। উৎসাহ লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃসাহসও বাড়তে থাকল। হিমালয়কে প্রকৃত হিমালয়কে, সমগ্র হিমালয়কে ক্যানভাসে উপস্থাপিত করবার সাধনায় মণীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনের সনাতন বিধি-বিধানগুলো প্রয়োজন হলেই হেলায় লঙ্ঘন করেছেন। এমনকি হিমালয় থেকে সঠিক বর্ণের ও সঠিক আকারের পাথর চয়ন করে ছবির মধ্যে নতুন মাত্রা জুড়ে দিয়েছেন। চিত্রকলার দিক থেকে মণীন্দ্রনাথের এই সব উদ্ধত প্রয়াস কতোটা সার্থক হয়েছে অথবা কতোটা স্থায়ী হবে তা নিরূপণ করবেন শিল্প-সমালোচকেরা। শিল্পরসিকেরা ভারমধ্যে সেই সব ছবি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসে সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন।

ওদিকে বিশের দশকের শুরু থেকে ব্রিটিশরা এভারেস্টকে নিয়ে এক অভিনব মহাকাব্য রচনায় কাজে হাত দিয়েছে। ক্রস, হাওয়ার্ড-ব্যারি, ফিনচ, ওডেল, সমারভেল, ম্যালোরি, আরভিন এবং তারও পরে স্মাইথ, টিলম্যান, শিপটন—হিমালয়কে যারাই জানতে চান, বুঝতে চান, পেতে চান—সবাই এসে মণীন্দ্রনাথের স্টুডিওতে জড়ো হন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই, বিশেষ করে কবি-অভিযাত্রী স্মাইথের সঙ্গে এমন সখ্যতা গড়ে উঠেছিল যা আত্মীয়তাকেও ছাড়িয়ে যায়। উন্মাদ হয়ে যাবার অল্প পরেই স্মাইথ মণীন্দ্রনাথের স্টুডিওতে চলে এসেছিলেন। স্টুডিওর নতুন ভিজিটর্স বুক-এ সই করতে গিয়ে স্মাইথ কিছুতেই নিজের নাম স্মরণ করতে পারছেন না—তিনবার কেটে চতুর্থবার নামের অর্ধেকটা মাত্র মনে করতে পেরেছিলেন—সে এক মর্মান্তিক ঝাঁকি বুঁকি। পরবর্তীকালে মণীন্দ্রনাথ যখনই কাউকে খাতাটি খুলে দেখাতে গেছেন তখনই কেঁদে আকুল হয়েছেন। মণীন্দ্রনাথের হাতে ভিজিটর্স বুকটা অল্প অল্প কাঁপছে আর চোখ থেকে নিঃশব্দে জলের ধারা বইছে—সেই দৃশ্যের কথা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

সে যাই হোক, এভারেস্টারদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপিত হবার পর মণীন্দ্রনাথের হিমালয়ের পরিধি আরেক দিকে অনেক দূর প্রসারিত হলো। নিজে পর্বতারোহী নন—হবার বাসনাও নেই—তবুও এটা যে পুরনো হিমালয়কে নতুন করে পাবার একটি মহৎ দৃষ্টিকোণ সেটা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। হিমালয়-ঘটিত ব্যাপার, পর্বতারোহণের ব্যাকরণটা তিনি আদ্যোপান্ত অধিগত করে রাখলেন—কখন কোন কাজে লাগে। মণীন্দ্রনাথ নিজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে ভালো জিনিস সঞ্চয় করে রাখলে তা একদিন-না-একদিন কারো-না-কারো

কাজে আসবেই।

পর্বতারোহণ সম্পর্কে মণীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার তলব পড়ল ১৯৫৩ সালে—শেরপা টেনজিং টপ করে হঠাৎ এভারেস্ট শীর্ষে উঠে পড়বার পর। ভারতে পর্বতারোহণের কোন ব্যবস্থা নেই, অথচ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পর্বতারোহী একজন ভারতীয়! এই উৎকট স্ববিরোধিতা থেকে নিষ্ক্রমণের চেষ্টায় দার্জিলিঙে একটি হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থা গড়ে তোলবার প্রস্তাব হল। কিন্তু প্রস্তাবটিকে রূপদান করবে এমন লোক কোথায়? ভারতে তখন দুজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ঠিক এমনি একটি সংস্থার স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁদের একজন মণীন্দ্রনাথ, অপরজন মেজর নন্দু জয়াল। জয়াল ছিলেন মণীন্দ্রনাথের ছেলের মতো। মণীন্দ্রনাথের নির্দেশনা ও জয়ালের কর্মতৎপরতায় ১৯৫৪ সনে এই দেশের প্রথম পর্বতারোহণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। প্রকৃতির ছাল-চামড়া না ছাড়িয়েও যে মানুষের উত্তম সার্থক হতে পারে তার একটা অনুপম নজির ওঁরা দুজনে মিলে সৃষ্টি করেছিলেন দার্জিলিঙের বার্চ হিলের উত্তর সীমায়। প্রকৃতির সুরসামঞ্জস্য রক্ষা করে ইনস্টিট্যুটের ঘরবাড়ি তৈরী হয়েছিল—কোথায় জলাশয় হবে কোথায় কি ধরণের অলঙ্করণ হবে—সব মিলিয়ে মণীন্দ্রনাথের সে-এক নতুন শিল্পসৃষ্টি।

কিন্তু সেই শিল্পকর্ম স্থায়ী হল না। ১৯৫৮ সনে চো-ইয়ো পর্বত অভিযানে গিয়ে, নিতান্ত কাঁচা বয়সে নন্দু জয়াল মারা গেলেন। জয়ালকে যাঁরা নিকট থেকে জানতেন তাঁরা বলেন, এটা একটা আত্মহত্যা। পর্বতারোহণ সংস্থাটি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আমলাতন্ত্রের ধান্দাবাজ শৃগালেরা এসে সেটিকে ছেঁকে ধরেছিল। এই লোভকলুষ পরিবেশে মুক্তপ্রাণ জয়ালের সামনে মাত্রই দুটো পথ ছিল—মরে যাওয়া অথবা পচতে শুরু করা। জয়ালের মৃত্যু মণীন্দ্রনাথের মনে পুত্রশোকের মতো বেজেছিল। এরপর অনিবার্যরূপেই পর্বতারোহণ সংস্থাটি নিছক ডিগ্রি সরবরাহের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

অসুরেরা চিরকালই যজ্ঞভূমির পবিত্রতা নষ্ট করে থাকে। ঋত্বিকেরা সাময়িকভাবে প্রতিহত হয়, কিন্তু মেঘ একটু কেটে গেলেই আবার নতুন করে যজ্ঞভূমি রচনার কাজে হাত দেয়। জয়ালের মৃত্যুর পর মণীন্দ্রনাথ নিজেকে আবার নিজের স্টুডিওতে গুটিয়ে আনলেন। ততদিনে দার্জিলিঙের চরিত্রও সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পুরনো দিনের সাহেব-সুবো রাজা-মহারাজারা মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন। আঁকা ছবির চাইতে তোলা ছবির বাজার দর অনেক বেশি তেজী। অস্ত্র মেরামত হলে ক্যামেরার ধুলো ঝেড়ে আবার 'দোকানদারিতে বসে গেছেন—

খ্যাতিটা ছিল, পসার জমতে বিলম্ব হত না। কিন্তু মণীন্দ্রনাথ নির্বিবাদ আবার রঙের জগতে ফিরে এলেন।

নন্দাঘুন্টি অভিযানের এক নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমাদের সঙ্গে যখন মণীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটল তখন ওঁর বয়স পুরো সত্তর। বুড়ো হলে অনেকের চেহারা ই ভেঙে যায়, কারো কারো চেহারা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যৌবনে মণীন্দ্রনাথ দেখতে কেমন ছিলেন জানি না। কিন্তু সেই প্রথম দিনটিতে তাঁর যে চেহারা দেখেছিলাম তা আজও মনের মধ্যে ভাস্বর হয়ে আছে। অন্তত ছয় ফুট দীর্ঘ, কৃশকায়। ফুটফুটে ফর্সা গায়ের রং সময়ের আঁচে একটু লালাভ। দেহে মেদের লেশমাত্র নেই। তীক্ষ্ণ নাসা, তীক্ষ্ণ চিবুক, সুপ্রশস্ত ললাট। চোখ দুটো ঠিক বৃহদায়ত নয়, অবয়বের তুলনায় হয়তো একটু ছোট, কিন্তু সেই চোখের দৃষ্টিতে সুদীর্ঘ জীবনের সব কথা—সব কান্না সব হাসি—তারকার দীপ্তি হয়ে জ্বলজ্বল করছে। এদেশে আমরা আজকাল সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে স্বাভাবিকভাবে বুড়ো হতে ভুলে গেছি—আমাদের যৌবন যেমন বিভ্রান্ত আমাদের বার্ধক্যও তেমনি কদাকার। মণীন্দ্রনাথ এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন—তাঁর জীবনের কোথাও এতটুকু ছেদ ছিল না।

সেই ১৯৬০ সনে মণীন্দ্রনাথ তখনো ইনস্টিট্যুটের কিউরেটর হিসাবে কাজ করছেন। মন ভেঙে গেছে, পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ইনস্টিট্যুটের তখনো তাঁকে প্রয়োজন। আমাদের নন্দাঘুন্টি অভিযানের যে তখন নাভিশ্বাস অবস্থা মণীন্দ্রনাথ তা জানতেন। সেদিন সকালেই যখন ইনস্টিট্যুটের মাঝখানে ছবির মতো সুন্দর বাগানটায় দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপ্যাল জ্ঞান সিং-এর সঙ্গে আমাদের মৃদু কিন্তু তীক্ষ্ণ কথা-কাটাকাটি চলছিল, মণীন্দ্রনাথ তখন নিকটেই ছিলেন এবং গভীর নিবিষ্টতায় ফুলের পরিচর্যা করছিলেন। ইনস্টিট্যুটের কাছ থেকে যে প্রয়োজনোচিত সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া যাবে না, আর সেই মোতাবেক টেনজিঙের শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশন যে যথোপযুক্ত শেরপা দেবে না—তা ততক্ষণে বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। শেরপা আর সাজসরঞ্জাম ছাড়া কোন হিমালয় অভিযান সম্ভবই হতে পারে না। আমরা অথই জলে ভাসছি।

ইনস্টিট্যুটের তৎকালীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মণীন্দ্রনাথের সম্পর্কটা তখন কেবল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অপেক্ষায়। অন্য কোন বাঙালি এ-অবস্থায় কি করতেন? ভালো মানুষ হলে বলতেন ইনস্টিট্যুটের সঙ্গে রফা করো, কার্যোদ্ধার হোক। আর বিচক্ষণ হলে ইনস্টিট্যুটের বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপারের আরও ক্ষেপিয়ে দিতেন—আমরাও মেহাজ

নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলাম না, একটা অত্যন্ত শক্তিশালী দৈনিক সংবাদপত্রের আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক! —আর খেলাটা জমে উঠলে নির্মল আনন্দ পেতেন। মণীন্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের কাঁদুনি শুনতে শুনতে একবারও ক্যানভাসের দিক থেকে মুখ ফেরালেন না। কাঁদুনি গাওয়া শেষ হবার পরেও তিনি ছবিই এঁকে চললেন। অনেকক্ষণ পরে শুধু বললেন 'নন্দু (জয়াল) বেঁচে থাকলে এমনটা হোত না।' উপদেশও নয়, সান্ত্বনাও নয়, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস।

উপদেশ ও সান্ত্বনার পরিবর্তে মণীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সেবারে আমরা যা পেয়েছিলাম বাইরে থেকে তা আরও তুচ্ছ মনে হবে। আসলে তা অমূল্য। নন্দাঘুন্টি অভিযানের জন্য তিনি একটা পুরনো হ্যাভারস্যাক আর কিছু বহু-ব্যবহৃত মোজা, দস্তানা, টুপি ইত্যাদি আমাদের হাতে তুলে দিলেন। সোজা কথায়, অন্যায়ের সঙ্গে রফা নয়, বিবাদও নয়, যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে নিজের কাজে এগিয়ে চলো।

নাঙ্গা পর্বতের কিংবদন্তী শেরপা আং শেরিঙের সঙ্গেও মণীন্দ্রনাথই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। মজুরীর বিনিময়ে আং শেরিং অনেক অনেকবার মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেরিয়েছে। কিন্তু দুজনের আচার-ব্যবহারে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের লেশমাত্রও নেই। ঠিক বলে বোঝানো শক্ত তবে এক সময়ে প্রবীণ গুরুমশায়ের সঙ্গে পরিণত শিষ্যের সম্ভবত এ ধরনের সম্পর্ক ছিল। উভয়েই উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাবান। আং শেরিংকে চেনা যায় কেবল ওর নম্রতা দিয়ে। এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ নেই যে আং শেরিং সঙ্গে না থাকলে নন্দাঘুন্টি অভিযান কিছুতেই সফল হত না। নন্দাঘুন্টি অভিযান ব্যর্থ হলে এদেশে বেসামরিক পর্বতারোহণ প্রয়াসটির পক্ষে তা হত বিপর্যয়কর। সেদিক থেকে মণীন্দ্রনাথের কাছে এদেশের প্রত্যেক বেসামরিক পর্বতারোহীর অপরিশোধ্য কিছুটা ঋণ আছেই। এই ঋণ কেউ স্বীকার না করলেও সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। এর পরে আমাদের আর সেই যাচাইটুকুও রইল না।

তবে কোন কোন বিষয়ে মণীন্দ্রনাথ গভীরভাবে মর্মাহত ছিলেন। সম্প্রতি-কালের পর্বতারোহীদের, বিশেষ করে বাঙালী পর্বতারোহীদের, হালচাল তাঁর মনঃপূত ছিল না। হিমালয় অভিযাত্রীরা নতমস্তকে কর্তৃপক্ষের সব অন্যায় মেনে নিচ্ছে, তোয়াজ-তোষামোদ করে কেবল নিজেদের জন্য ক্ষুদ্র একটু সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে, এসব দেখলে মণীন্দ্রনাথ গভীরভাবে মর্মাহত হতেন। তিনি বলতেন,

'হিমালয়ে আসা কেন? বদ্ধশ্বাস দৈনন্দিন জীবন থেকে বেরিয়ে এসে বুকভরা দম নেবার জন্যই তো বিপদ-বাধা তুচ্ছ করে হিমালয়ে আসা। তোয়াজ-তোষামোদের জন্য, খানাবাজীর জন্য দিল্লি-কলকাতা-বোম্বাইতে তো সরকারী বেসরকারী অজস্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে—খুটখুট হিমালয়কে ব্যতিব্যস্ত করে তোলবার দরকার কি?'

ইনস্টিট্যুটের বর্তমান পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এক সময়ে, হিমালয়ের পশুপাখি, গাছপালা, ভূতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব, তুষার-হিমবাহ, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে যাঁরা জানেন তাঁদের আমন্ত্রণ করে আনা হত। এখন সে সব চুকে গেছে। এখন রাজনৈতিক নেতারা এসে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। অন্য দিকেও তাই। জয়ালের সময় প্রত্যেক অ্যাডভান্স-কোর্সে একটা করে পর্বতশীর্ষে আরোহণ করা হত, এখন বরফের উপর দু-একদিন তাঁবু করে থাকবার পরই খেল-খতম। শতশত ছেলে প্রতি বছর হিমালয়কে চিনছে না অথচ পর্বতারোহণের ডিগ্রি নিয়ে গর্বিতপদে বেরিয়ে আসছে, শতশত ছেলের সামনে প্রতি বছর স্বাভাবিকভাবে হিমালয়কে জানবার রাস্তাগুলোও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—মণীন্দ্রনাথ এতে গভীরভাবে মর্মাহত ছিলেন।

তবে মণীন্দ্রনাথের গভীরতম মর্মযন্ত্রণা ছিল শেরপাদের নিয়ে। কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়ে অমন বলিষ্ঠ অমন চরিত্রবান একটা জাতি চোখের সামনে ছত্রখান হয়ে গেল। শেরপারা যখন দুজন-চারজন করে এসে দার্জিলিঙের টুংসুং এলাকায় বসত স্থাপন করতে শুরু করে তখন তিনি তা দেখেছেন। শেরপা ঐতিহ্যটাও তাঁর চোখের সামনেই গড়ে উঠেছে—এ-ব্যাপারে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালির মতো তাঁরও কিছুটা দান আছে। শেরপাদের গৌরব যেদিন এভারেস্ট-শীর্ষ স্পর্শ করল সেদিন তিনি—তেষট্টি বছর বয়সে—আনন্দে নেচেছিলেন। তারপরই চাকা ঘুরে গেল। শেরপারা হঠাৎ নিজেদের মহৎ বৃত্তি পরিত্যাগ করে ঝাঁকেঝাঁকে সীমান্ত পুলিসের চাকরির জন্য হন্যে হয়ে উঠল। পুলিসের চাকরিতে ভজনে আঠারোটা মিথ্যে কথা বলতেই হয়, অথচ একসময়ে এমন জনশ্রুতি ছিল যে শেরপারা নাকি চেষ্টা করলেও অসৎ কাজ করতে বা মিথ্যে কথা বলতে পারে না! মণীন্দ্রনাথ বলতেন, ছোট্ট এক বেকত জায়গায়, ছোট্ট একটা উপজাতি—নিজেদের বলিষ্ঠ ভাবধারায় সম্পূর্ণ সুসমৃদ্ধ—আমরা তাদেরও দুর্নীতিগ্রস্ত করে ছত্রখান করে দিয়েছি। এ দেশে জাতীয় সংহতির কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা হয়তো শেরপাদের নামও শোনেন নি!

আসল কথা হিমালয়কে কেউ অপবিত্র অপমানিত বা অপরিচ্ছন্ন করবার চেষ্টা

করলে মণীন্দ্রনাথের তা গায়ে লাগত।' হিমালয়ে আধুনিক যুগের আবাহন হক তা তিনি চাইতেন। কিন্তু আধুনিকতার নামে, উন্নয়নের নামে, জাতীয় সংহতির নামে হিমালয় জুড়ে যে ভূতের নৃত্য চলছে তার পরিণাম কখনোই ভালো হতে পারে না। তিনি বলতেন, 'কোন কিছুর সত্যকারের উপকার করতে হলে তার আগে তাকে ভালো করে জানা চাই। ক্ষতি-করবার জন্ত অবশ্ত কিছু জানবার প্রয়োজন নেই। হিমালয়ের ভালো করবার জন্ত, হিমালয়কে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করবার জন্ত আজ যারা হন্তে হয়ে উঠেছে তাদের কজন হিমালয়কে জানে? কজনা হিমালয়ের চরিত্র বোঝে? জানবার বুঝবার, চেষ্টা মূরস্থান, ইচ্ছে আছে ক'জনার? অবিভার গুণটাও দোষ হয়ে যায়, অপকার করতে করতে মনে হয় দারুণ উপকার করা হচ্ছে। হিমালয় নেহাতই হিমালয়, তাই এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।'

মণীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত—হ্যাঁ ঘুমে-জাগরণে, স্মরণে-বিস্মরণে প্রতিটি মুহূর্ত—ব্যয়িত হয়েছে হিমালয়কে জানবার বুঝবার সাধনায়। হিমালয়কে সম্পূর্ণরূপে জানা বোধ হয় মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মণীন্দ্রনাথ বলতেন, হিমালয়কে জানা মানেই হিমালয়কে সৃষ্টি করা। যে যেদিক থেকে যেমন-ভাবে হিমালয়কে আবিষ্কার করছে, সে সেদিক থেকে ঠিক তেমনিভাবে হিমালয়কে সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি ও মানুষে মিলে এই এক বিচিত্র সাধনা—যার কোন শেষ নেই। পৃথিবীর অন্ত কোন পর্বতে এমনটি হয়নি—ইউরোপে না, রাশিয়ায় না, আমেরিকায় না, এমন কি চীনেও নয়। সেই মহাভারতের যুগেরও অনেক অনেক আগে থেকে কতো সাধক, কতো গৃহী, কতো কবি, কতো অন্ধ-খঞ্জ-তাপিত এই হিমালয়ে এসেছে, এসে হিমালয়কে সৃষ্টি করেছে, তার কি কোন সীমা-পরিসীমা আছে। সেই সৃষ্টির কাজ ভালোয়-মন্দয় আজও চলছে। একটা পর্বতকে কেন্দ্র করে এমন বিচিত্র সাধনা—অন্ত কোন দেশে অন্ত কোন পর্বতকে ঘিরে কোনকালে এমনটা আর হয়নি। সেদিক থেকে পর্বত হিসাবে হিমালয় খুবই ভাগ্যবান; হিমালয়ে যাঁরা আসেন তাঁরাও সমান ভাগ্যবান।

মণীন্দ্রনাথ হিমালয়ের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন। হিমালয় ওঁকে বিত্ত দেয়নি, খ্যাতি দেয়নি, কোন ফেলোশিপ বা ডক্টরেট দেয়নি—কেবল দুর্গমতর ও নির্জনতর উপত্যকাগুলোয় যদৃচ্ছ যথাসাধ্য ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দিয়েছে। ছবি আঁকবার সুযোগও দিয়েছে। আর দিয়েছে হিমালয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবার অধিকার। মণীন্দ্রনাথ প্রাণ উজাড় করে এইসব সুযোগ সুবিধা উপভোগ করেছেন। হিমালয়ের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস কয়লো খোয়া যায় না, তাই

কোন তাড়া ছিল না। ধীরে-সুস্থে যখন যেদিকে যাবার রুচি হয়েছে তখন সেদিকে গেছেন। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে, ১৯৫৫ সনে, দি গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ অতিক্রম করে কৈলাস মানস-সরোবর গিয়েছেন—হিমালয়ের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ না থাকলে ওই বয়সে অমন পরিক্রমা সম্ভবই হতে পারে না।

যতীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন এবং সেজন্য হিমালয়ের কাছে তিনি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন—এই কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতিদিনের কর্মে ও অবকাশে অবিরত প্রকাশিত হত। কোন ক্ষোভ নেই, কোন খেদ নেই—একানব্বই বছরের সুদীর্ঘ জীবন নানাভাবে হিমালয় পরিক্রমা করে চলে গেলেন। এমন লোককে ঈর্ষা করতে হলেও বুকের পাটা থাকা দরকার।

শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে চড়তে গিয়েই গৌরাঙ্গ নিখোঁজ হয়েছে।

সংবাদটিতে যতটা দুঃখিত হয়েছি ততটা বিস্মিত হইনি। গোড়া থেকেই আমি জানতাম যে, গৌরাঙ্গের নিয়তি ভিন্ন রকম হতে পারে না।

পর্বতারোহীদের নিকট সবচাইতে বড় কাম্য না-কি পর্বতে মৃত্যু। কিন্তু তবু এত তাড়াতাড়ি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্ম গৌরাঙ্গকে অভিনন্দন জানাতে পারছি না। কারণ উচ্চতর আরও অনেক পর্বতশীর্ষ গৌরাঙ্গের পদার্পণের প্রত্যাশায় ছিল বলে আমার ধারণা। গৌরাঙ্গ সেইসব পর্বতকে হতাশ করেছে।

অনেক পর্বতারোহীকেও। গৌরাঙ্গের সঙ্গে পার্বত্য পথে চলবার সৌভাগ্য যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন যে ছেলেটি কোন্ শ্রেণীর পর্বতারোহী। একেবারে 'এ-ওয়ান।' গৌরাঙ্গর কাছে তাঁদের অনেক আশা ছিল। গৌরাঙ্গ সবাইকে নিরাশ করল। নাঃ, গৌরাঙ্গকে অভিনন্দন জানাতে পারব না।

দীর্ঘদিন থেকে আমার একটা দৃঢ়-ধারণা ছিল যে, দুটো-একটা বাঙালী ছেলে পাহাড়ে মারা না পড়লে বাংলাদেশের পর্বতারোহণ যথোচিত উৎসাহিত হবে না। সেদিক থেকে গৌরাঙ্গর এই অনির্দেশ্য অন্তর্ধানে অন্তত মনে মনে আমার হয়তো একটু পুলকিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হত।

কিন্তু গৌরাঙ্গ নেহাতই গৌরাঙ্গ বলে গৌরাঙ্গের অন্তর্ধানে কণামাত্র স্বস্তি পাইনি। ও রকম পাহাড়-পাগল ছেলে বাঙালীর ঘরে অন্তত শতকে একটি জন্মায় না। গৌরাঙ্গ নেই বাংলাদেশের পর্বতারোহণ উৎসাহিত হবে কার উদ্যোগে।

আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, গৌরাঙ্গ আজ উপস্থিত থাকলে গৌরাঙ্গের অনুসন্ধানের জন্ম গৌরাঙ্গ অতি-অবশ্যই একটা অনুসন্ধান-অভিযান সংগঠন করত। কলকাতা থেকেই।

গৌরাঙ্গের দুর্ভাগ্য ও বাংলাদেশে জন্মেছিল। ম্যালোরী-আরভাইনের অমরত্ব অর্জন করেও তা ওর আয়ত্তাতীত থেকে যাবে বলেই আমার আশঙ্কা।

নাঃ গৌরাঙ্গর জন্ম অশ্রুবিসর্জন করব না। গৌরাঙ্গ সেটা ঘৃণা করত। হয়তো বা অট্টহাস্যেই ফেটে পড়ত। গৌরাঙ্গের হাসি আর শুনে হয়ে থাকা প্রায় সমার্থক

ছিল। গৌরাঙ্গ ঠিক এই জগতের ছেলে ছিল না।

আবোল-তাবোল বকত, আর আবোল-তাবোল চলত। ভাবখানা : দুনিয়া তো দুদিনের। তোয়াক্কাটা কার?

প্রথম পরিচয়ের দিনই গৌরাঙ্গের ওই চেহারা দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। ১৯৬১ সনের মাঝামাঝি, আমরা তখন নানা-অভিযানের সংগঠনে ব্যস্ত। নন্দাঘুণ্টি অভিযানের পর আমরা সকলেই তখন রীতিমত কেউকেটা-নই।

আনন্দবাজার পত্রিকা-অফিসে বসে একদিন প্রাপ্তিযোগের রেওয়া মিল করছি এমন সময়ে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। একেবারে হয়ে দুয়ারে মধুকৈটভারে বলে সদর্পে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে।

কারো সার্টিফিকেট নেই, কোন রিকমেণ্ডেশন নেই। গৌরাঙ্গ নিজেই নিজের সবকিছু ছিল। বলল, আমি গৌরাঙ্গসুন্দর চৌধুরী অমুক সালে ট্রেনিং নিয়েছি, অমুক সালে নীলগিরি-অভিযানে গিয়েছি। আপনাদের সঙ্গেও যেতে চাই।

"যেতে চাই" বললেই যে যাওয়া হয়, গৌরাঙ্গ সেটা জানত। আরও অনেকে আমাদের সঙ্গে যাবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হয়নি। নানা-অভিযানে গৌরাঙ্গের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আমাকেও কিছু কিছু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

অতঃপর গৌরাঙ্গের প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল হৃষীকেশ ছাড়িয়ে দেবপ্রয়াগের কিছুটা আগে। সেখানে এক বিরাট ধস নেমে রাস্তা বন্ধ। অজস্র গাড়ির পিছনে আমাদের গাড়ি দুটি থামল। কিন্তু রাস্তা আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেও ঠিক হবার নয়। স্থির হল সদস্যরাই পাঁচ টন মাল বয়ে ধসের ও-ধারে নিয়ে যাবে। তারপর যা থাকে কপালে।

কিন্তু দুবার-একবার মাল ধসের ওই ধারে পৌঁছে দিয়ে আসবার পরই দেখা গেল সদস্যদের কপালে এক ঘাম ছাড়া আর-কিছু নেই। তখন ওদের প্রয়োজন জল। পানীয় জল।

কাছে-পিঠে কোন ঝরনা ছিল না। গৌরাঙ্গকে বলা হল, তোমাকে মাল বইতে হবে না। একটু জলের যোগাড় দেখ তো। গলায় কাঁধে আট-দশটা ওয়াটার-বটল নিয়ে গৌরাঙ্গ সেই মুহূর্তেই রাজি।

অবশেষে সব মাল ধসের ও-ধারে চলে গেল। একটা লরি পেয়ে মদন মালপত্র নিয়ে দেবপ্রয়াগের পথে রওনা হয়ে গেল। আমরা ঘণ্টা-দেড়েক বসে আছি।

অতঃপর গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটল। সব কটা ওয়াটার-বট্‌ল্‌ই জলে ভরা। বেচারা একটু ভয়ে পড়েছে। কিন্তু তৃষ্ণার চাইতেও আমাদের তখন উৎকণ্ঠা অনেক বেশী। কেউ কেউ কটূক্তি করতে ছাড়ল না।

কিন্তু গৌরাঙ্গ তখনও পুরোপুরি গৌরাঙ্গ। নিজস্ব ভাষায় নিঃশব্দে একটু হাসল। বলল, কী করা যাবে, 'শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় নামতে হল!'

তৃষ্ণার্ত সতীর্থদের জন্য গৌরাঙ্গ সেদিন অজানা অচেনা পথে অন্তত ৮০০ ফুট নেমে জল এনেছিল। পরে ৮০০ ফুট চড়াই ভাঙবার পরেও ওর আচরণে ক্লান্তিমাত্র ছিল না। একটু কৃতার্থতা ছিল; তৃষ্ণার্ত সতীর্থদের জন্য শেষ পর্যন্ত জল আনা গেছে। একটু সলজ্জ ভাব ছিল; দেরি হয়েছে। সাক্ষী আমি; সাক্ষী আমাদের সেদিনের সকলে।

ইতিমধ্যে যোশীমঠ থেকে মূল শিবিরে যাবার পথেই গৌরাঙ্গ হঠাৎ দ্বিপদ থেকে চতুষ্পদে উন্নীত হল! ওর চলার ক্ষিপ্রগতি দেখে শেরপারা ইতিমধ্যেই ওকে 'বকরি' বলে ডাকতে আরম্ভ করে দিয়েছে। পাহাড়ী ভাষায় বকরি মানে পাহাড়ী ছাগল —যে জীব পাথর থেকে পাথরে স্বচ্ছন্দে লাফিয়ে চলে।

আমার পক্ষে অন্তত মূল শিবিরের গৌরাঙ্গকে ভোলা সম্ভব নয়। ও আমাকে ম্যানেজার বলে ডাকত। একদিন বলল, 'এস ম্যানেজার, তোমার খাঁচায় একটু তেল মাখিয়ে দিই।' আমার খাঁচা বলতে তখন মাত্র পাঁজর ক'টি। গৌরাঙ্গের এই কথা নিয়ে শিবিরে যে হাসির হুল্লোড় পড়েছিল আজও তা মনে আছে। গৌরাঙ্গ তারপর নিজেই আমার গায়ে জল ঢেলে দিয়ে নিজে মজা দেখেছে। সেদিনের কথা মনে পড়লে আজ···কিন্তু না, গৌরাঙ্গের জন্য আজ মন খারাপ করব না।

গৌরাঙ্গ তার চরিত্রের দ্বিতীয় পরিচয় দিল মানা-অভিযানের প্রথম শিবির স্থাপন করতে গিয়ে। মূল শিবিরে পৌঁছবার দিন সান্ধ্য বৈঠকে স্থির হল: আগামীকাল দুজন সদস্য দুজন শেরপাকে নিয়ে পূর্বী কামেত হিমবাহে প্রথম শিবিরের স্থান নির্বাচন করতে যাবে; আর অন্য সবাই শিবির অনুযায়ী ভাগাভাগি করে মালপত্র গোছগাছ করবে।

এই দুজন সদস্যের মধ্যে একজন যে গৌরাঙ্গ, সে কথা বলাই বাহুল্য। অপরজনের নাম সুবিমল। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই ওরা রওনা হল। যাবার আগে ওদের বার বার বলে দেওয়া হল: যেখানেই বেলা আড়াইটে বাজবে ঠিক সেখান থেকেই ফিরে আসতে শুরু করবে। এইটে ছিল দলনেতার

আদেশ। আর অনুরোধ ছিল, সম্ভব হলে যেন ১৯৫৮ সনের নন্দ জয়ালের প্রথম শিবিরের স্থানটি খুঁজে বের করা হয়।

স্বভাব অনুযায়ী গৌরাঙ্গ আদেশটি অমান্য করে অনুরোধটি রক্ষা করেছিল।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটা বেজে যেতেও গৌরাঙ্গ-পার্টি মূল শিবিরে ফিরে না আসায় আমরা প্রমাদ গুনলাম। পর্বতে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। একটা অনুসন্ধানকারী দল পাঠিয়ে আমরা আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। কিন্তু গৌরাঙ্গ-পার্টির তখনও নো-পাত্তা।

অবশেষে দ্বিতীয় একটা অনুসন্ধানী দল যখন রওয়ানা হবার জন্ত প্রায় প্রস্তুত এমন সময় দূর থেকে হঠাৎ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গৌরাঙ্গের গলা। আমরা আশ্বস্ত হলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের উত্মাও ফেটে পড়ল। গরম পানীয়ের সঙ্গে গৌরাঙ্গকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, এখন আর তার নিরাপত্তার প্রশ্নটা তার একার বিবেচ্য নয়; সেটা পুরো অভিযাত্রী দলের দায়িত্ব।

কিন্তু পথিকৃৎ দলের অপর তিনজনের আপত্তি সত্বেও এক গৌরাঙ্গেরই উত্তমে মেজর জয়ালের প্রথম শিবিরের স্থানটি সেদিন সঠিকরূপে নির্ণীত হয়েছিল। উল্লেখ্য: এই আপত্তিকারী তিনজনের মধ্যে একজন ছিল প্রখ্যাতনামা শেরপা আঙ শেরিঙ।

অতঃপর শিবিরের মেজাজ একটু শান্ত হতে গৌরাঙ্গ হঠাৎ বলল: আদেশ মানতে গেলে শেষ পর্যন্ত আর অনুরোধটুকু রাখা যেত না।

আমরাও তৎক্ষণাৎ রক্তচক্ষু: অভিযানে অনুরোধের চাইতে আদেশ বড়—, এ কথা মনে রাখবে।

কিন্তু যতই রক্তচক্ষু দেখাই না কেন, গৌরাঙ্গের এই বেপরোয়া উত্তমে আমাদের যে অন্তত দুটো দিন—প্রায় চার হাজার টাকা বেঁচে গেছে সে কথা আমার আর মদনের চাইতে বেশী কেউ জানত না। মনে মনে অন্তত আমরা সবাই সেদিন গৌরাঙ্গকে বাহবা দিয়েছি।

এর পরেও পাহাড়ের অধিকতর উচ্চতায় গৌরাঙ্গ নিজ নিরাপত্তার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে এই ধরনের একাধিক বেপরোয়া দুঃসাহসিক কাজ করেছে। চন্দ্রের শিরিশাজ দিয়ে যানা পর্বতের উচ্চতম জায়গায় (২৩৫০০ ফুট) এখনও গৌরাঙ্গেরই—আর সহ-অভিযাত্রী মদনের—পদচিহ্ন আছে। গৌরাঙ্গের সেইটেই এপিটাফ।

গৌরাঙ্গ আসলে পাগল ছিল। পাগল না হলে কেউ পর্বতারোহী হয় না।

কিন্তু প্রকৃত পর্বতারোহী হতে হলে পাগলামির সঙ্গে একটু বিচার-বিবেচনা থাকা দরকার। গৌরাঙ্গের তা ছিল না।

গৌরাঙ্গ পর্বতে নিখোঁজ হয়েছে। শেরপাদের নিষেধ সত্ত্বেও ফটো তুলতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। হিমবাহে, বিশেষত গঙ্গোত্রী হিমবাহে—যেখানে বরফের অজস্র চোরা ফাটল—নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীর পক্ষে সেখানে নিখোঁজ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

কিন্তু এই অভিযানের দলনেতা ডাঃ পট্টবর্ধনের কাছে কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে।

১. গৌরাঙ্গ যখন একাই ফোটো তুলতে যাওয়া সাব্যস্ত করল তখন কেন কোন সদস্য অথবা শেরপা ওর অনুগমন করল না?

ক. তৃতীয় শিবিরে কি সেদিন গৌরাঙ্গই একমাত্র সদস্য উপস্থিত ছিল? (যে কি-না দুদিন আগেও তুষারান্ধ!)

খ. তুষারান্ধ, ক্লান্ত গৌরাঙ্গকে ওই দুদিনে কেন মূল শিবিরে নামিয়ে আনা হয়নি?

গ. দলনেতা কি দলের সব সদস্য এবং শেরপাকে এই অত্যাবশ্যক পরামর্শটি দেননি যে, গঙ্গোত্রীর মতো ভয়াবহ হিমবাহে কেউ কখনও একা যাবে না:—এমনকি প্রাতঃকৃত্যের জন্যও নয়! (আমার ধারণা নন্দাঘুন্টি-মানা-কামেট অভিযানের কোন সদস্য উপস্থিত থাকলে এমন উদ্ভট দুর্ঘটনা কখনোই ঘটত না)।

২. ডাঃ পট্টবর্ধন জানিয়েছেন: গৌরাঙ্গের আর কোন হদিসই পাওয়া যায়-নি। মর্মান্তিক সত্য কথা। কিন্তু এই হদিস লাগাবার জন্য ডাঃ পট্টবর্ধন কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ জানতে পারলে ভালো হত।

ক. কবে, কখন, কোথায় বসে প্রথম জানা গেল যে গৌরাঙ্গ নিখোঁজ হয়েছে?

খ. যে শিবিরে নেতার কাছে প্রথম খবর এসে পৌঁছল সেই শিবিরে তখন কোন্ কোন্ সদস্য উপস্থিত ছিলেন?

গ. তাঁদের বিশদ নাম-ঠিকানা কী?

ঘ. নেতা জানিয়েছেন: অনুসন্ধানী দল পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু জানাননি কবে কোথা থেকে, কী কী সরঞ্জাম দিয়ে কতদিনের জন্য। অথবা ফিরে এসে তাদের রিপোর্ট কী?

গৌরাঙ্গের জন্য আর ভাবব না। কিন্তু গৌরাঙ্গের জন্যই ভারতীয় পর্বতা-রোহণের কথা ভাবব। ডাঃ পট্টবর্ধনের দায়িত্বহীনতার কোন তুলনা নেই।

এই কালিম্পঙে বসেও গৌরাঙ্গের মায়ের শোক আমি বুঝতে পারি (রুগ্না মহিলা একদিন গৌরাঙ্গেরই নিমন্ত্রণে আমাদের মাংসের ঝোল আর লুচি খাইয়েছিলেন)। অচিরেই এই শোক গৌরবে উন্নীত হবে। গৌরাঙ্গের মত ছেলে, নিজেরই পুনরাবৃত্তি করছি, বাঙালীর ঘরে শতকে একটা জন্মায় না।

প্রাকৃতিক নিয়মেই গৌরাঙ্গের পারিবারিক শোক একদিন কমে যেতে বাধ্য। কিন্তু বাঙালীর জাতীয় ক্ষোভও কি তাতেই তুষ্ট হবে ?

তবে কি-না ক্ষোভটা এখনও জাতীয় নয়! বাঙালী পর্বতারোহীরাই গৌরাঙ্গকে অর্জিত সম্মান দিয়ে দধীচি করে তুলতে পারত। বাংলাদেশের পর্বতারোহণই তাতে অধিকতর উৎসাহিত হত।

কিন্তু গৌরাঙ্গের অনুসন্ধানে আজ পর্যন্ত কলকাতা থেকে একটিও অনুসন্ধানী দল গঠিত হয়নি !

গৌরাঙ্গের দরিদ্র পরিবারের জন্য অদ্যাবধি বাংলাদেশে কোন তহবিলও খোলা হয়নি।

আবারও নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করব ?

গৌরাঙ্গের দুর্ভাগ্য : ও বাংলাদেশে জন্মেছিল।

জয়ন্তী নন্দাঘুন্টি

নন্দাঘুন্টি অভিযানের সূত্র ধরে ১৯৬০ সনে এদেশে বেসামরিক পর্বতারোহণের সূচনা হয়। গত ১৯৮০ সনে ভারতীয় বেসামরিক পর্বতারোহণের কুড়ি বছর পূর্ণ হল। বছরটিকে তুষার-জয়ন্তী বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব রাখছি।

কুড়ি বছরে পা দিতে না দিতেই এমন ঘটা করে আনন্দোৎসবে মেতে উঠবার আয়োজন অনেকের কাছে একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। সাধারণভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বা ঘটনার পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে রজত-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়, পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে সুবর্ণ-জয়ন্তী। এমনটাই নিয়ম এবং এমনটাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু পর্বতারোহণ ব্যাপারটাই একটু সৃষ্টিছাড়া। নিয়মের গণ্ডি তুচ্ছ করে যুক্তির বেড়া ডিঙিয়ে গেলে তবে পর্বতারোহণের শুরু। সৃষ্টিছাড়া জিনিসের ক্রিয়ানুষ্ঠানও একটু খাপছাড়া হতেই পারে—হওয়াটাই স্বাভাবিক। তুষার-জয়ন্তী প্রস্তাবের পক্ষে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কোন অজুহাতের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

তবুও আর একটা যুক্তির উল্লেখ করব। গত বিশ বছরে বিশ্বসংসারের সব কিছুই অনেক দূর বদলে গেছে। পর্বতারোহণ ব্যাপারটি সৃষ্টিছাড়া হলেও পুরোপুরি বিশ্বছাড়া নয়—এর গায়েও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। পাহাড়ে চড়বার যেসব টেকনিক্যাল পরিবর্তন ঘটেছে—যেসব পরিবর্তনের ফলে পর্বতের কোন দুর্গমতাই আজ আর টেকনিক্যালি অনধিগম্য নয়—সেসব নিয়ে সনাতন পর্বতারোহীদের মনে যত ক্ষোভই পুঞ্জীভূত থাকুক না কেন, তা নিয়ে নালিশ উত্থাপন করা মূঢ়তা হবে। এইসব আবিষ্কারের ফলে পর্বতারোহণের সনাতন আদর্শটায় কিছু রদবদল হবে তাও অপ্রত্যাশিত নয়। মনে দুঃখ পেলেও সেসব না মেনে নিয়ে উপায় নেই। ফরাশডাঙার ধুতি ছেড়ে মানুষ যদি কলে তৈরি কাপড়ের চোঙা-প্যান্ট পরে তবে তার চাল-চলনে কিছুটা পরিবর্তন ঘটবেই—এ পর্যন্ত মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু ধুতির বদলে চোঙা-প্যান্ট পরলে মানুষকে যদি আর মানুষ বলেই না চেনা যায় তবেই বিপত্তি। পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে এহেন ঘটনা ঘটেছে বলে আশঙ্কা করি।

কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে, তবুও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সাধারণভাবে আজকের পর্বতারোহীরা কালকের পর্বতারোহীদের তুলনায়

অনেক বেশি ভব্য-সভ্য, অনেক বেশি প্রকৃতিস্থ এবং দেশের আমলাতন্ত্রকে কেমন করে হাত করতে হয় তা তারা জানেন। শহরের পথে-ঘাটে একজন পর্বতারোহীকে আজকাল আর চট করে একজন 'ভালো ছেলে'র থেকে পৃথক বলে চেনা যায় না। কুড়ি বছর আগে পর্বতারোহীরা অনেক বেশি 'ছিটেল' হতেন একটু বেশি বেপরোয়া হতেন এবং শহরের পথে-ঘাটে তাঁদের দেখলে মনে হত যেন জলের মাছকে ডাঙায় টেনে তোলা হয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলেরা কি আজও পাহাড়ের টানে চাকরি ছেড়ে পালায়? বাধা সৃষ্টি করলে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়?

পাহাড় সম্পর্কে মনোভঙ্গিটাই কি অপরিবর্তিত রয়েছে? থাকবার কথা নয়। পাহাড়কে আগে আমরা যে চোখে দেখতাম, যেমনভাবে ভালবাসতাম আজকের ছেলেরাও কি পাহাড়কে তেমন চোখে দেখে, তেমনিভাবেই ভালবাসে? মনে হয় না। মূল শিবিরে পৌঁছতেই তখন দু-তিন সপ্তাহ সময় লেগে যেত—হিমালয় তখনো কিছুটা দূরে ছিল। মোটর গাড়ি এখন হিমালয়ের অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে —রওনা হতে না হতেই আজকাল মূল শিবিরে পৌঁছে যেতে হয়। ডালপালা ছাঁটা বনস্পতির মতো, হিমালয়ের অনেকখানি পরিচয় এতে করে চোখের ও বোধের বাইরে থেকে যায়। যাকে ভালো করে চিনলাম না বুঝলাম না, তার প্রতি আকর্ষণ কতটুকু গভীর হতে পারে? কতটা উদার?

পর্বতের সঙ্গে পর্বতারোহীর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। যে যতটুকু দেয়, সে সেই অনুপাতে পুরস্কৃত হয়; হিমালয়কে সব কিছু উজাড় করে দিতে পারলে হিমালয়ও সবকিছু উজাড় করে দেয়। কুড়ি বছর আগেও এই দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রটি খুব প্রশস্ত ছিল এমন দাবি করব না, কিন্তু এখন তা আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে প্রায় বুক-ট্রানসফারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার চরিত্রে কিসের প্রভাব কতটা পড়ল তা মেপে দেখবার মত কোন যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি, তবে এ দেশের পর্বতারোহীদের উপর হিমালয়ের উদার প্রভাব যে দিন দিন কমে আসছে তা সবাই স্বীকার করবেন। এমন কিছু কিছু উৎসাহী পর্বতারোহীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে হিমালয় সম্পর্কে যাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন উৎসাহ বা কৌতূহল নেই। হিমালয় সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো বই আছে কিন্তু এঁরা নাকি সেসব বই পড়ে দেখবার সময় পান না। অথচ হিমালয় সম্পর্কে এমন নির্জীব কৌতূহল নিয়েই এঁরা বছরের পর বছর পর্বতারোহণ করে চলেছেন। এই ফাঁকটা ঢাকবার জন্য নানাপ্রকার ফালতু আনুষঙ্গিকের আয়োজন করতেই হয় এবং তাতে করে পর্বতারোহণের মৌল আদর্শটা আরও বিশ বাঁও জলের তলায় চলে যায়। এইসব

কিছুর একটাই পারণাম : অবসাদ। আজকাল পর্বতারোহীদের সঙ্গে কথা কালেই দেখা যায়, তারা অবসাদগ্রস্ত। দিল্লীর মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন সম্পর্কে হতাশা দার্জিলিঙের মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিট্যুট সম্পর্কে উষ্মা, শেরপা ক্লাইম্বার্স এ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে তিক্ততা, অন্ত সব সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ —অবসাদগ্রস্ত পর্বতারোহীরা বলে, আজকাল আর পর্বতারোহণ নিয়ে দেশের লোকের কোন উৎসাহ নেই। অপর দশজনের শুভেচ্ছা, ব্যতিরেকে পর্বতারোহণ অভিযান হয় না সেটা ঠিক কথা, কিন্তু পর্বতারোহীরা পরনির্ভর হয়ে পড়লেও পর্বতারোহণের কৌলিন্ত বাঁচে না।

পাহাড় নির্বাচনে আজ আর পর্বতারোহীদের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই—সেজন্ত দিল্লীর অনুমোদনের প্রতিক্ষায় থাকতে হয়। অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সদস্য হিসেবে কে যাবে এবং কে যাবে না সেজন্তও দিল্লীর মতামত গ্রহণ করতে হবে। কোন অভিযানের জন্ত কি কি সাজসরঞ্জাম দরকার তা স্থির করবে দার্জিলিঙের পর্বতারোহণ সংস্থা। পছন্দমত শেরপা বেছে নেবার অধিকারটুকুও পর্বতারোহীদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে—সেজন্ত শেরপা ক্লাইম্বার্স এ্যাসোসিয়েশনের মর্জির উপর নির্ভর করতে হবে। এইসব এবং আরও অজস্র বিধিনিষেধ সুবোধ বালকের মত হাসিমুখে মেনে নিলে তবেই আজ পর্বতারোহণ সম্ভব। এত সব বিধিনিষেধের পর প্রকৃত পর্বতারোহণের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে ?

তা ছাড়া, যেখানে যত বিধিনিষেধ সেখানে তত অনাচার। মনেপ্রাণে পর্বতারোহী হলেই এ দেশে আর পর্বতারোহণে যাওয়া সম্ভব নয়। পর্বতারোহণে যাবার আগে এ দেশে দিল্লী-দার্জিলিং কলকাতার অনেক অনেক আমলাকে খুশী করতেই হয়। এত সব বিধিনিষেধের গোলকধাঁধায় প্রকৃত পর্বতারোহীরা হতোদ্যম হতে পারে—কিন্তু পর্বতারোহণের ক্ষেত্রেও উদ্যোগী পুরুষের অভাব নেই। এ দেশের পর্বতারোহণে আজ এই সব উদ্যোগী পুরুষদেরই একাধিপত্য। আমলাতন্ত্রকে কেমন করে হাত করতে ও হাতে রাখতে হয় তা যাদের জানা আছে পর্বতারোহণে আজ তাদেরই অগ্রাধিকার।

তা হলে কি গত দুই দশক ধরে এ দেশে পর্বতারোহণের নামে কেবলই পর্বতারোহণ হয়েছে ? তা অবশ্যই নয়। প্রাকৃতিক ও আরোপিত এত সব বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে বাঙালী বেসামরিক পর্বতারোহীরা গত দুই দশকে হিমালয়ের খ্যাত অখ্যাত অনেক পর্বতে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে এসেছে। রেকর্ডটা বিস্ময়কর তো বটেই গৌরবজনকও—এক কথায় অনবদ্য। বিশ-বিজয়ী

পর্বতারোহী ফ্র্যাংক স্মাইথ যে গিরিশৃঙ্গ দেখে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, 'মানুষের অসাধ্য'—সেই মানাশীর্ষে (২৩৮৬০ ফুট) বাঙালী পর্বতারোহীরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে এসেছে। ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত কামেটশীর্ষেও এরা শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে। নামী-অনামী আরও অনেক পর্বতশীর্ষে এদের স্বাক্ষর অক্ষয় হয়ে আছে। হিমালয়ের অনেক অজ্ঞাত উপত্যকায়, অনেক অজ্ঞাত হিমবাহে বাঙালী পর্বতারোহীরাই প্রথম পদার্পণ করেছে। ভয়াবহ এক দুর্ঘটনার পর প্রায় ২২,০০০ ফুট উঁচু তুষার-গাত্র থেকে চারজন আহত শেরপাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে বাঙালী পর্বতারোহীরাই। সুযোগ-সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যত পর্বতাভিযান সংগঠিত হয়েছে ভারতের অন্য কোন রাজ্য থেকে তা হয়নি। এইসব কয়টি অভিযানই সমান গৌরবজনক এমন দাবি করব না। লজ্জাকর ঘটনাও কিছু কিছু ঘটেছে—অনেক বিবাদ, অনেক ইতরামি—কোন কোন ঘটনার কথা স্মরণ হলে আজও মাথা হেঁট হয়ে যায়। কিন্তু অভ্রভেদী গৌরবের পাশে এইসব দীনতা নিতান্তই পিঁপড়ের ঢিবির মতো। অন্তত এটুকু বুক ফুলিয়েই বলা চলে যে, গত কুড়ি বছরে এ দেশে বেসামরিক পর্বতারোহণ প্রয়াসের যে অগ্রগতি—নাকি ঊর্ধ্বগতি!—ঘটেছে তা এক কথায় বিস্ময়কর।

এই বিস্ময়কর অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ ছিল নন্দাঘুন্টি অভিযান। এ বছর সেই নন্দাঘুন্টি অভিযানের বিশ বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষেই—তুষার জয়ন্তী।

এই জয়ন্তী উৎসবে সকলেরই আমন্ত্রণ রইল। গত কুড়ি বছরে যারা একবারও পর্বত আরোহণে গিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে তাঁদের ভূমিকাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের অনেকেই শীর্ষে আরোহণ করেছেন, অনেকেই শেষ পর্যন্ত শীর্ষে আরোহণ করতে পারেননি—কিন্তু সব রকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করেছেন সবাই। কেউ তুষার-দেওয়ালে ধাপ কেটেছেন, কেউ তুষার-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে তৃতীয় শিবির থেকে পঞ্চম শিবিরে রসদ পৌঁছে দিয়ে এসেছেন, কেউ পাহাড়-চূড়োয় পতাকা উড়িয়েছেন, কেউ মূল শিবিরে বসে আলুর খোসা ছাড়িয়েছেন—এদের সকলের সম্মিলিত সাধনায় পর্বতারোহণের গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এদের সুসংহত দুঃসাহসিকতার কথা স্মরণ করে এই উৎসবের নান্দীমুখ হোক।

আরও অনেকে যারা কোনদিনই পর্বত অভিযানে যাননি কিন্তু পিছন থেকে অন্তত একটি অভিযানেও সক্রিয় সহায়তা করেছেন—এই অনুষ্ঠানে তাঁদের অবদানও

কারো চাইতে কণামাত্র কম নয়। একক প্রচেষ্টায় হিমালয় অভিযান হয় না, হতে পারে না। পর্বত অভিযানের জন্য টাকা-কড়ি সাজসরঞ্জাম ছাড়া আরও হাজারো রকমের জিনিস দরকার হয়। চা চাই, চিনি চাই, রান্নার ও মাথায় মাখবার তেল চাই, সিগারেট চাই, টর্চ ব্যাটারি চাই, বিস্কুট ও আচার চাই, লজেন্স চাই, ত্রিপল চাই, রশি চাই, স্টোভ ও প্রেশার কুকার চাই, কেরোসিন চাই, ওষুধ-বিষুধ চাই— এবং আরও কত কি যে চাই, তার সব উল্লেখ করতে গেলে তালিকা শেষ হবে না, আর তার পরেও অনেক আইটেম অনুল্লেখিত থেকে যাবে। বাজারে সব-কিছুই কিনতে পাওয়া যায়।—কিন্তু এই সব কিছুই যদি বাজার থেকে কিনতে হত তবে অধিকাংশ অভিযানকেই হাওড়া স্টেশন পর্যন্তও পৌঁছতে হত না। গত কুড়ি বছর ধরে ডজন ডজন অভিযান যে হাওড়া স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়ে আবার হাওড়া স্টেশনে এসে সশরীরে পৌঁছতে পেরেছে তার পিছনে আছে এইসব এবং আরো অজস্র দ্রব্যের প্রস্তুতকারক অথবা পরিবেশকদের অকুণ্ঠ বদান্যতা। পাহাড়ের নামে এইসব বিষয়ী ব্যক্তিরা যে কেন এমন পাগল হয়ে ওঠেন সেইটে একটা মহা-বিস্ময়কর ব্যাপার। এঁদের উদার সহযোগিতা ছাড়া সেই নন্দাঘুন্টি থেকে একটি পর্বত অভিযানও আদৌ সম্ভব হত না। এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানে এঁদের স্থান পর্বতা-রোহীরাই স্বীকার করবেন, পর্বতারোহীদের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে জয়ন্তী অনুষ্ঠানের তারকাখচিত আসনগুলো যাঁদের জন্য আগে-ভাগেই সংরক্ষিত রাখতে হবে তাঁরা হলেন—শেরপা। পর্বতারোহণের সঙ্গে শেরপাদের যে সম্পর্ক সেটা আজও পর্যন্ত কেউ সঠিক অথবা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানি না। কেবল এটুকু সুনিশ্চিতরূপে বলা চলে যে, শেরপা ছাড়া হিমালয় অভিযান হয় না। একজন বিশ্ববিশ্রুত পর্বতারোহী তো অকপটেই কবুল করেছেন যে, আমরা শেরপাদের কাঁধে চেপে পর্বতারোহণ করি—শেরপাদের কাঁধে চেপেই পর্বত থেকে নেমে আসি—তারপর ধীরে-সুস্থে একখানা রোমহর্ষক অভিযান-কাহিনী লিখে ফেলি। এর সঙ্গে কেবল এটুকু যোগ করতে হয় যে, এই স্বীকারোক্তিতে কণামাত্র অতিশয়োক্তি নেই। ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হয়তো হ্যামলেট নাটকের অভিনয় হলেও হতে পারে, কিন্তু শেরপাদের বাদ দিয়ে হিমালয় অভিযান কদাচ নয়। তুষারপাত্রে তাঁবুর জায়গা নির্বাচন করবে কে? —শেরপারা। ভয়ঙ্কর তুষার-ফাটল বশে আনবার ঝুঁকি নেবে কে? —শেরপারা। রক্ত হিম করা তুষার-প্রপাত রজ্জুবদ্ধ করবে কে? —শেরপারা। বিপজ্জনক তুষার-দেওয়ালে দড়ি লাগিয়ে পথ-খুলবে কে?—শেরপারা। ক্লান্ত

থাকতে বরফ গলিয়ে সকাল হবার আগেই গরম চায়ের মগ এগিয়ে ধরবে শেরপারা, আবার কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে তাঁকে সন্তর্পণে পাহাড় থেকে নামিয়েও আনবে শেরপারাই। অন্যান্যদের কথা অন্যান্যরা বলবেন, তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানি, যে আং শেরিঙের অনুপ্রেরণা বা পাসাং ফুটারের উদ্দীপনা ব্যতিরেকে আমাদের নন্দাঘুন্টি (১৯৬০) অথবা মানা (১৯৬৬) অভিযান কোন কালে সফল হত না। আরও জানি যে, কেবল হাজার এক রকমের আপাতিক দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেই শেরপাদের কাজের পরিধি ফুরিয়ে যায় না। ওরা কেবল পাহাড়ে চড়তেই সাহায্য করে না, পাহাড়কে চিনতে, পাহাড়কে দেখতে এবং পাহাড়কে বুঝতেও শেখায়। হিমালয়ের মেজাজটি এদের অত্যুত্তমরূপে জানা আছে, আর উপযুক্ত আধার মিললে, সেই মেজাজটা এরা নিঃশব্দে সঞ্চালিত করে দেয়। আর এই মেজাজটাই হল হিমালয় অভিযানের একেবারে গোড়ার কথা। অতএব যদিও কেবল টাকার বিনিময়েই শেরপাদের নিয়োগ করা হয়, তবুও ওদের জন্য কয়েকটি ফুলের মালারও ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন— নৈতিক প্রয়োজন।

ফুলের মালার ব্যবস্থা রাখবার একটা গভীরতর কারণ আছে। মজুরী বাড়িয়েও ওদের হয়তো আর অধিকদিন নিয়োগ করবার সুযোগই থাকবে না—শেরপারা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই অবলুপ্তির জন্য কে কতটা দায়ী সেই বিতর্ক তুলে এই তুষার-জয়ন্তী বর্ষের আনন্দ ম্লান করা অরসিকোচিত হবে—কিন্তু একথা ঠিক যে, পূর্ণাবয়ব শেরপা ইতিমধ্যেই নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। শেরপাদের স্বার্থরক্ষার নিগড় ব্যবস্থাবলী চালু হবার পর থেকেই প্রকৃত শেরপারা একে একে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে—শীঘ্রই একদিন কুলে বাতি দেবার জন্যও কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। টাকাপয়সার ব্যাপারে আজকাল আমরা সকলেই খুব টনটনে, শেরপারাও যদি এ বিষয়ে কিছুটা সেয়ানা হয়ে থাকে তবে সেটাই স্বাভাবিক— বিপর্যয়করও—কেননা, খাঁটি শেরপা খুবই দুর্লভ। শেরপাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতই উদ্বেগ থাকুক, ওদের অতীতটা কিন্তু চির-ভাস্বর থাকবেই—সে বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। মনে আছে, মানা পাহাড়ের উত্তর গিরিশিরার শীর্ষ থেকে ফিরে আসবার সময় অন্ধকার ঘনিয়ে এল—সেই সঙ্গে তুষার-ঝটিকা। পাসাং ফুটার, মুখে জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে, একবার খানিকটা নেমে যাচ্ছে, হাতড়ে হাতড়ে বরফে ঢাকা পড়া ফিক্সড রোপ খুঁজে বার করছে, তুষার-গাঁইতি চালিয়ে পথ মেরামত করছে, তারপরে আবার উপরে উঠে এসে বলছে, খোয়া হুঁশিয়ারসে

চলো, আউর থোড়া বাকি হ্যায়, হো—যা। উন্নত প্রকৃতি ও অসহায় মানুষের সেই যোগাযোগের সময় মানা অভিযানের কেউ কেউ উপস্থিত ছিল, অনেকেই ছিল না, কিন্তু সেদিনের সেই পাসাং ফুটার আমাদের সকলের অভিজ্ঞতায় অমর হয়ে আছে। ফুটার নিজে আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু সেদিনের সেই পাসাং ফুটার চিরদিন বেঁচে থাকবে—মৃত্যু কোনদিনও তার নাগাল পাবে না। অতএব শেরপাদের জন্য কেবল ফুলের মালার ব্যবস্থা করলেই চলবে না, তাতে যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে সোনালী তবক মাখিয়ে দেওয়া হয়।

শেরপাদের কথা উঠলেই, তৎক্ষণাৎ, মালবাহকদের কথাও মনে পড়ে যায়। অভিযানের শুরুতে এরা মূল শিবিরে মাল পৌঁছে দিয়ে আসে, অভিযান সাঙ্গ হলে এরাই আবার মূল শিবির থেকে মাল বয়ে আনে। এদের অধিকাংশের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হবার তেমন সুযোগ মেলে না। নন্দাঘুন্টি অভিযানের সময় এদের মজুরীর রেট ছিল দৈনিক পাঁচ টাকা বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আঠারো/কুড়ি টাকা—কিন্তু এরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেছে। পৃথক পৃথকভাবে এদের কোন পরিচয় নেই, নাম নেই—প্রত্যেক অভিযানে এদের একটা করে নম্বর দেওয়া হয়। দারিদ্র্যের তাড়নায়ই এরা অভিযানের মাল বইতে আসে, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই সংক্রামক যে, সময়-সুযোগ পেলে এদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের নেশায় বুঁদ হয়ে যায়। নন্দাঘুন্টি অভিযানের সময় প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝায় যখন দ্বিতীয় শিবির বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল—কয়েকজন শেরপা ও সদস্য সেখানে অন্তরীণ হয়ে আছে অথচ শিবিরে খাদ্য নেই, জ্বালানি-তেল নেই—সেই দুর্যোগের মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে তিনজন ভোটিয়াল মালবাহক দ্বিতীয় শিবিরে রসদ পৌঁছে দিয়েছিল তাদের নেতা ছিল আকেল। পরের বছর প্রথম মানা অভিযানের সময় আকস্মিকভাবেই আবার আকেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আকেল তখন ত্রৈমাসিক চুক্তিতে সরকারী রাস্তা বানাবার কাজে ব্যস্ত—কিন্তু আমাদের দেখা পাবার সঙ্গে সঙ্গে পথের উপরই কোদাল-বেলচা ছেড়ে ও আমাদের সঙ্গ নিল—নির্দ্বিধায়। এই প্রসঙ্গে গাড়োয়ালী মালবাহক সোবা সিংয়ের কথাও বলতেই হয়। রাইকানা ও পূর্বী-কামেট হিমবাহ দুটি যেখানে এসে মিশেছে, সেখানে একটু হাঁচলে-কাশলে একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যাবার আশঙ্কা, দিনের বেলায় যার চেহারা দেখলে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে, হিমালয়ের সেই সুপরিকল্পিত বীভৎসতা অতিক্রম করে রাত একটার সময় প্রথম শিবির থেকে মূল শিবিরে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ বহন করে এনেছিল এই সোবা সিং। সোবা সিংয়ের চৌদ্দ এবং ভগবানের আশীর্বাদে

দুর্ঘটনার আহত চারজন শেরপাই শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠে। আক্কেল ও গোরা সিংকে পয়সার বিনিময়েই নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু কেবল পয়সার বিনিময়ে এ সব জিনিস হয় না। এ ধরনের অভিজ্ঞতা অন্যান্য অভিযাত্রীদলেরও নিশ্চয়ই আছে —যাদের নেই বৃথাই তাদের হিমালয়ে যাওয়া। সে যাই হোক, জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যেন আক্কেল গোরা সিং ইত্যাদির জন্য প্রচুর পরিমাণে 'রকসির' ব্যবস্থা করা হয়। পেটে একটু রকসি না পড়লে ওদের ঠিক মেজাজ আসে না।

জয়ন্তী উৎসবে দিল্লি-দার্জিলিঙ-কলকাতার কিছু কিছু কর্তাব্যক্তিরও প্রবেশাধিকার থাকবে। স্বতঃস্ফূর্ততাই যেকাজের মূলমন্ত্র সেই পর্বতারোহণের উপর কঠোর ও ব্যাপক সরকারী নিয়ন্ত্রণ যে কতদূর ক্ষতিকারক হয়েছে সেকথা আগেই বলেছি। উৎসবের দিনে সেসব আর স্মরণ করে দরকার নেই। তা ছাড়া, প্রতি পদক্ষেপে খর্ব হয়েও, পর্বতারোহণ যে আজও এদেশে বেঁচে আছে তা এঁদেরই কৃপায়। খুবই পরিতাপের কথা যে, এই তুষার-জয়ন্তী উৎসবে কাঁচি দিয়ে ফিতে কাটবার কোন ব্যাপার নেই, থাকলে সেই পবিত্র অনুষ্ঠানটুকু এঁরা সুনিপুণভাবে সম্পাদন করতে পারতেন।

এই দেশজোড়া উৎসবের বিশেষ অতিথি আসলে সর্বসাধারণ। ব্যাপারটিকে যতটা ধোঁয়াটে মনে হয়—রাজনৈতিক দাদাদের মুখে মুখে সর্বসাধারণ কথাটাই কেমন যেন 'উচ্ছিষ্ট' হয়ে গেছে!—ব্যাপারটি কিন্তু ততটাই সুস্পষ্ট। কুড়ি বছর আগে পর্বতারোহণ শব্দটাই এ দেশে অশ্রুত ছিল, কিন্তু মনে আছে, নন্দাঘুন্টি অভিযানের প্রস্তাবটা—তখনো নেহাতই প্রস্তাব—প্রথম যেদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হল সেদিন থেকে পর্বতারোহণ শব্দটি সকলের মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করল। অভিযানের শেষে দেশবাসীর সেই বিস্ময় ও আনন্দ দেখে দাদাস্থানীয় একজন তো বলেই ফেলেছিলেন যে, উনিশ শ' এগারোর সেই মোহনবাগানের পর দেশে আর এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি! নন্দাঘুন্টির সংবর্ধনা শুরু হয়েছিল যোশীমঠেরও দুই পাহাড় দূরে রিনী নামে একটা পাহাড়ী গ্রামে—সেই হুল্লোড় ভোলবার নয়। যোশীমঠে রাশি রাশি টেলিগ্রাম। রেলের প্রতিটি স্টেশনে উৎসুক ব্যক্তিরা অভিযাত্রীদের জন্য ফুলের মালা, সন্দেশের প্যাকেট, এমনকি গাছের পেয়ারা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে। তারপরে হাওড়া স্টেশন থেকে যা শুরু হয়েছিল তার আর বর্ণনা করে দরকার নেই—একেবারে মাথা খারাপ করে দেবার মতো ব্যাপার।

নন্দাঘুন্টি অভিযানকে ছোট করে দেখবার কোন কথাই ওঠে না। কিন্তু

অভিযানটি কি সত্যিই এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সেটি নিয়ে দেশবাসীর উৎসাহ এমন ব্যাপকভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে? তেমন হলে নিশ্চয়ই বংশরোনাথি খুশী হতাম —কিন্তু ক্ষেত্রটি বোধহয় আগে থাকতেই তৈরি করা ছিল, নন্দাঘুন্টি উপলক্ষ মাত্র। সেই অনাদিকাল থেকে সাধনায়, কাব্যে হিমালয় এ দেশের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে আছে—নন্দাঘুন্টি তার নাগাল পেয়েছিল।

এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, দেশবাসীর এই উৎসাহ কেমন করে পর্বত অভিযানের প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হয়—ব্যাপারটি কি অনেকটা মাও-মন্ত্র নিয়ে এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণের মতো হয়ে দাঁড়াল না! না, ঘটনা অতটা ভূতুড়ে নয়। দেশবাসী উৎসাহিত হয়ে উঠলে তার দ্বারা রসদ সরবরাহকারীরাও বেশ উদারভাবে সংক্রামিত হন—এইটে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—এমনকি রেলওয়ের কর্মচারীরাও দারুণ চটপটে হয়ে যান। এ ছাড়া পর্বতের উপরে তুষারাবৃত শেষ প্রতিবন্ধকতাটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন আর দেহে-মনে এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই—তখন হঠাৎ দেশবাসীর আগ্রহ ও প্রত্যাশার কথা মনে পড়ে যায়, তখন আরেকবার লড়াই শুরু হয়।

দেশবাসীর মনে আগে থাকতেই যাঁরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের তাঁরা সবচাইতে সম্মানীয় অতিথি। এঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। সেই বৈদিক যুগেরও আগেই এঁরা হিমালয়ের তাৎপর্য বুঝে নেন এবং তারপর যুগ যুগ ধরে চলেছে হিমালয় জরিপ করবার কাজ—পার্থিব এবং অপার্থিব উভয় রকমের জরিপ। খুব সহজবোধ্য কারণেই এঁদের জন্য অনুষ্ঠানে কোন বিশেষ রকম ব্যবস্থা করবার দরকার নেই

গৌরাঙ্গসুন্দর চৌধুরী, মানে আমাদের গৌরাঙ্গ, তো তেমন কোন আয়োজন দেখলে হেসেই খুন হত। আতিশয্য জিনিসটাকে ও খুব ভয় পেত। অমন পাহাড় পাগল ছেলে বাঙালীর ঘরে ভুল করে জন্মায়, ষড়যন্ত্রটা আঁচ করে কেরানী হবার আগেই তাই গৌরাঙ্গ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়—গঙ্গোত্রী হিমবাহে, ১৯৬৪ সনে। শুধু গৌরাঙ্গই নয়, পাসাং ফুটার, পাসাং শেরিং, কর্মা, আজীবা ইত্যাদি আরও যাঁরা গত কুড়ি বছরে হিমালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন—আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ জানাবার চেষ্টা করলে এঁরা সবাই খুব বিব্রত হবেন। তবে এঁদের জন্য চিন্তা নেই—একান্ত নিভৃতেও যদি কোথাও পাহাড় নিয়ে একটু কথা হয়, বা কারো একটু চিন্তা, তবে এঁরা তৎক্ষণাৎ সেখানে হাজির থাকেন—রাহা-খরচের কথা তো আর ভাবতে হয় না। জয়ন্তী অনুষ্ঠানেও এঁরা আপনা থেকেই এসে উপস্থিত হবেন।

এরপর আর বাকী রইল শুধু নন্দাঘুন্টির সেই উদ্ভুটে ছেলেগুলো—আর যাঁরা সেই অদ্ভুতুড়ে কাজে এসে সহায়তা করেছিলেন তাঁরা। এই লোকগুলোর সত্যিই কোন তুলনা নেই—ভগবান নিজে বাছাই করে নন্দাঘুন্টিওয়ালাদের সঙ্গে এঁদের জুটিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের সুকুমার রায়ের সঙ্গে আনন্দবাজারের কানাইলাল সরকার দার্জিলিঙে যখন আলাপ হয় (১৯৬০, মার্চ) নন্দাঘুন্টি তখনো পর্যন্ত আমাদের স্বপ্নেও সুস্পষ্ট মূর্তি-পরিগ্রহ করেনি—কিন্তু কানাইবাবু আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের নামগোত্রহীন কয়েকটি বাঙালী ছেলে হিমালয় অভিযানে যেতে চায়—এই অসম্ভব প্রস্তাব শুনে ওই একই পত্রিকার সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও উৎসাহে মেতে উঠেছিলেন। উৎসাহের তোড়েই সুবলদা আমাদের যাঁর কাছে নিয়ে হাজির করলেন তাঁর কথা বলবার আগে আমাদের তখনকার অবস্থাটা একটু বিবেচনা করা দরকার।

শেষ পর্যন্ত আনন্দবাজার ভবনে এসে পৌঁছবার আগে নানান দরজায় ঘা খেয়ে খেয়ে আমাদের তখন নাক-মুখ থেবড়ে গেছে, উৎসাহ-উদ্দীপনা চুপসে এসেছে। নন্দাঘুন্টি অভিযানের প্রস্তাব শুনে কেউ কেউ খুব মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন: পাহাড়ে গিয়ে কি হবে?—তার চাইতে এমন কিছু কর যাতে দেশের দশের উপকার হয়। অন্য একটা দৈনিকের জনৈক কর্তাব্যক্তি অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—গেট আউট। অনেকেই আবার এর চাইতেও নিষ্ঠুরভাবে প্রথমে উৎসাহ দিয়ে শেষটায় সাহায্যের কথা উঠলে চুপ মেরে গিয়েছেন। ঘা খেতে খেতে, কোথাও এতটুকু আশার আলো নেই, আমাদের তখন বেপরোয়া অবস্থা।

সেই অবস্থাতেই সুবলদা একদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক খোদ অশোককুমার সরকারের ঘরে নিয়ে আমাদের হাজির করলেন। গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, আমরা মহড়া টহড়া দিয়ে একেবারে তৈরি ছিলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকেই একটু থতমত খেয়ে গেলাম—গণ্যমান্যদের যে ভাবমূর্তি, মানে ইমেজ, তার সঙ্গে এঁর এতটুকু মিল নেই। আমরা আসন গ্রহণ করলে অশোকবাবু কৌতুক ও কৌতূহল মিশ্রিত চোখে আমাদের দিকে তাকালেন—কোন প্রশ্ন করলেন না। আমরা আরও ভ্যাবাচাকা খেয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে থাকলাম। কিন্তু সময় কতক্ষণ পাওয়া যাবে জানি না, তার উপরে আমাদের ওই বেপরোয়া অবস্থা, হঠাৎ এক সময় আমরা পাঁচজনেই একসঙ্গে আমাদের অভিযানের জন্মকাহিনীর অংশটা বোঝাতে শুরু করে দিলাম। নিমাইয়ের মুখের কথা সুকুমার টেনে নেয়, দিলীপের শুরু করা কথাটা বিমল শেষ করে—এ দেশে এমন অভিযান

এর আগে কখনো হয়নি, এই অভিযান হলে বাঙালীই হবে এই ব্যাপারে পথিকৃৎ—হৈ হৈ কাণ্ড। ছোটো একটা বের করলেন কি করলেন না, পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট অশোকবাবু নিঃশব্দে এই অত্যাচার সহ্য করলেন। তারপরে কফি এল। কফি খাওয়া হল। আমাদের শান দেওয়া যুক্তিগুলো কোথায় কতটা সফল হচ্ছে কতদূর কিছুই আঁচ করতে পারছি না—সময় যেন থেমে গেছে—সবাই চুপচাপ। তারপরে টেবিলের খবরের কাগজটির উপর চোখ বুলোতে বুলোতে অশোকবাবু হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন :

পারবেন আপনারা ?

চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

তবে যান।

এমন ঠাণ্ডা মাথায় এত অল্প সময়ে যে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়—ব্যাপারটা যেন আজও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। এই সদাশয়তার বিপরীত দিকটা দেখবার সুযোগও আমাদের হয়েছে।

প্রত্যাশিতভাবেই দার্জিলিঙের তৎসাময়িক বড় কর্তারা নন্দাঘুন্টি অভিযানের প্রতি খুব একটা সদয় ছিলেন না। অজ্ঞাতকুলশীল কয়েকটি বাঙালী ছেলে তাঁদের আশীর্বাদ-অনুমতি ছাড়াই হুম করে একটা বড় মাপের হিমালয় অভিযানের আয়োজন করে বসবে—এতটা কেমন করে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া যায় ? এঁদের অসহযোগিতায় একটা দুঃসহ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। দার্জিলিঙের বর্ষায়, কাকঝোরা থেকে নর্থ পয়েন্ট, দৈনিক দুবার করে উপর্যুপরি কয়েক দিন যাতায়াত করবার পর আমাদের কার্যত বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, ওঁদের কাছ থেকে প্রয়োজন মতো সাজসরঞ্জাম অথবা পছন্দমতো শেরপা কিছুই পাওয়া যাবে না। তবে উপায় ? ঠিক এই সময়ই, যেন অদৃশ্য কারো নির্দেশে, আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বনামধন্য পর্যটক ও চিত্রকর মনীন্দ্রনাথ সেন। একেবারে সাহেবের মতো চেহারা, সাহেবের মতো মেজাজ। পর্বতারোহণের মধ্যেও দুর্নীতিপরায়ণতার অনুপ্রবেশ ঘটছে দেখে তিনি আগে থাকতেই তিক্ত-বিতৃষ্ণ হয়েছিলেন, আমাদের যুবোচিত গোঁয়ার্তুমি দেখে তিনি আমাদের ভালবেসে ফেললেন। বললেন, নন্দাঘুন্টি অভিযান করতেই হবে এবং ওঁদের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য না নিয়েই করতে হবে। সেইটেই হবে ওঁদের দুর্নীতিপরায়ণ ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব।

মিঃ সেনের মধ্যস্থতায় আং শেরিঙের সঙ্গে আলাপ হল। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। শাম্বা-পর্বতে বুদ্ধ বলে খ্যাত সেই ভুবনবিখ্যাত শেরপা আং

শেরিংও নর্থ পয়েন্টের ঘোড়দের উপর আদৌ প্রীত ছিল না। সরকারী তকমা লাগিয়ে ওঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন—নন্দাঘুন্টি অভিযান করে ওঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে হিমালয় কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়।

উৎসাহিত হয়ে, কম্পিত বক্ষে, আমরা অশোকবাবুকে সব কথা লিখে জানালাম। অভিযানের খরচ অযথা বেড়ে যাচ্ছে বলে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম, কিন্তু আং শেরিঙের আশ্বাস পেয়ে তখন আমাদের উৎসাহেরও অন্ত নেই। চিঠিতে এই উদ্বেগ ও উৎসাহ উভয়ের কথাই দুরু-দুরু বক্ষে উল্লেখ করলাম। ফেরৎ ডাকেই নগদ জবাব: এগিয়ে চলো। অশোকবাবুর এই নির্ভীক বদান্যতায় আমরা তো কোন্ ছার—স্বয়ং মিঃ সেন সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

নর্থ পয়েন্টের ঘোড়সরাও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। ওঁদের উপেক্ষা করে আং শেরিঙের নেতৃত্বে তুংসুং বস্তির দোরে দোরে ঘুরে আমরা সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করছি, শেরপা নিয়োগ করছি দেখে ওঁরা শেষ পর্যন্ত দিল্লীর শরণাপন্ন হলেন।

দার্জিলিঙের প্রথম রাউণ্ডে জয়লাভ করে ফিরে আসবার অল্পদিন পরেই হঠাৎ একদিন অশোকবাবুর খাস-কামরায় ডাক পড়ল। হাজির হতেই তিনি নিঃশব্দে আমাদের দিকে একটা চিঠি ঠেলে দিলেন। পত্রলেখকের নাম দেখেই আমাদের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল—স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। দেশের যুবা শ্রেণীর মধ্যে যে এমন দুঃসাহসিক অভিযানের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে সেজন্য কিছুটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই তিনি নন্দাঘুন্টি অভিযানের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন—এটা কি দুঃসাহসিকতা হচ্ছে, না আহাম্মুকি? অভিযান না করলে যে অভিযানের অভিজ্ঞতা হতেই পারে না এই সহজ কথাটি ভুলে গিয়ে পণ্ডিতজী খুব সুস্পষ্ট ভাষায় পরামর্শ দিয়েছিলেন: এই অনভিজ্ঞদের যেন কোনক্রমেই অভিযান করতে দেওয়া না হয়। পণ্ডিতজীর পরামর্শ তখন নির্দেশ বলেই ধরে নেওয়া হত। এমতাবস্থায় কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে আমরা হতভম্ব হয়ে রইলাম। কিন্তু অশোকবাবু হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: বাঃ, কে কোন্ পাহাড়ে যাবে-না-যাবে তাও উনিই স্থির করবেন? এমন হস্তক্ষেপের তো যুক্তি থাকতে পারে না। দেশের যুবকদের উপর যদি এটুকু আস্থাও না থাকে তবে দেশটা গড়ে উঠবে কাদের নিয়ে?—এদিকে অশোকবাবু যতটা উত্তেজিত হচ্ছিলেন, এদিকে আমরাও ভিতরে ভিতরে ততটাই দৃঢ়সংকল্প হচ্ছিলাম: এই চ্যালেঞ্জের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেই হবে। নন্দাঘুন্টি অভিযানটা এমনি করেই যুগপৎ দিল্লী ও দার্জিলিঙের

বিশ্বে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আমরা করতে পেরেছিলাম। অশোকবাবু পিছনে না থাকলে নন্দাঘুন্টি অভিযান আদৌ সম্ভব হত না—এই জয়ন্তী উৎসবেরও তাহলে কোন সুযোগ ঘটত না—অতএব এই অনুষ্ঠানে সবচাইতে বড়র আসনটি তাঁরই জন্য সংরক্ষিত না রাখলে চরম অকৃতজ্ঞতা হবে। পর্বতারোহীরা আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়।

তুষার জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনের এবং বিভিন্ন ঘটনার স্থান নির্ণয়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল—বাকী কেবল সেই বেপরোয়া ছেলেগুলো যাদের মাথায় সর্বপ্রথম নন্দাঘুন্টির পোকা নড়ে উঠেছিল। গত কুড়ি বছরে ওদেরও প্রত্যেকেরই কুড়ি বছর করে বয়স বেড়ে গেছে—ওরা সবাই এখন ঘর-সংসার করে। কিন্তু তাই বলে ওরা সবাই একেবারে ভব্য-সভ্য হয়ে গেছে এমন কথা হলফ করে বলা চলে না। এখনও মাঝেমধ্যে ওরা যখন মিলিত হয় তখন ওদের হাল-চাল দেখে মনে হতে পারে যে গত কুড়ি বছরে সময় একদম নড়েনি। বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না যে এদের নন্দাঘুন্টি অভিযানটা আজও শেষ হয়নি—এখনও তার সংগঠনের কাজ চলছে, তুষারে ধাপ কাটা চলছে, তাঁবুর ভিতরে ঠাট্টা-রসিকতা চলছে, কলকাতার সংবর্ধনা সভায় শালগ্রামশিলার মত বসে থাকাও চলছে—সবকিছু ঠিক আগের মতো। এদের কাছে নন্দাঘুন্টি এমনই একটা অভিজ্ঞতা যার থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই। একসঙ্গে হলেই এদের এখনও পা চুলকোতে শুরু করে, মাথায় নানা মতলবের খেলা শুরু হয়ে যায়।

এই জয়ন্তী বর্ষের জন্যও মাথায় একটা খাসা আইডিয়া এসেছে। নন্দাঘুন্টির জয়ন্তী ওরা নন্দাঘুন্টি গিয়েই পালন করবে—হ্যাঁ সেই অরিজিনাল নন্দাঘুন্টি। একেবারে অভিনব আইডিয়া। আবারও সেই যোশীমঠ ছাড়িয়ে, ঘিনী পেরিয়ে, ঘোন'া গ্রাম হয়ে, আনন্দ-ধূরা অতিক্রম করে সেই থারলোট্টা। পরিকল্পনা (!) অনুযায়ী এবারেও মূল-শিবির হবে থারলোট্টা। সামনেই নন্দিনালা বয়ে যাচ্ছে, চারদিকে পাহাড়ের নির্জনতা, মালবাহকেরাও একদিনেই নিচে নেমে জ্বালানি সংগ্রহ করে আনতে পারে—আর উত্তর-পূর্ব দিকে চোখ তুললেই চিরতুষারাবৃত জোড়াজোড়ি হিমল।

নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে এই জয়ন্তী অভিযানের সদস্য সংখ্যা হবে বারোজনের মতো। ইচ্ছা থাকলেও পুরাতন সদস্যদের সবাই হয়তো সশরীরে এই অভিযানের শরিক হতে পারবেন না, তাই হিসাব ধরা হয়েছে—পুরানো ছয়, নতুন ছয়। আর

শেরপাদের এখন প্রচুর পয়সা হয়েছে কিন্তু তবুও দলে ভেড়াবার জোর চেষ্টা হচ্ছে।

অতি মূল্যবান একটি প্রত্যাশা নিয়ে এই অভিযানের পরিকল্পনা। আগেই বলা হয়েছে যে গত কুড়ি বছরে হিমালয়ের এবং হিমালয় অভিযানের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। সব কিছুরই, সব পরিবর্তনেরও, ভালো মন্দ দুটো দিক আছে। এই অভিযানে পুরানো সদস্যরা পুরানো-ধারার পর্বতারোহী। নতুনেরা নতুনধারার। সবক্ষেত্রেই নতুন ও পুরাতনের মধ্যে একটা চিরদিনের দ্বন্দ্ব আছে—পর্বতারোহণের ক্ষেত্রেও আছে। এই দ্বন্দ্বের আসল কারণ যোগাযোগের অভাব। একের সঙ্গে অপরের লেন-দেন নেই। তাই বাক্যালাপও বন্ধ। এতে উভয়েরই ক্ষতি হয়। এই জয়ন্তী অভিযানে পর্বতারোহণের পুরাতন ও নতুন—এই দুটি ধারাকে একত্রে প্রবাহিত করে দিয়ে দেখাই যাক না কতদূর পর্যন্ত এরা একসঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে! চলতে চলতে সংঘর্ষ বেধে যাবার কোন আশংকা নেই তা বলব না, তবে তার সম্ভাবনা খুব অল্প—কারণ তা হলে অভিযানটাই ভেঙে যাবে। অপরদিকে যদি উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটে, পুরাতন যদি নতুনের সুরটা ধরে নিতে পারে, নতুন যদি পুরাতনের মধ্যে ঐতিহ্যের কিছুটা আভাসও পায়—তবে সকলেরই লাভ। নন্দাঘুন্টি অভিযানের সূত্র ধরে এদেশে পর্বতারোহণের সূত্রপাত হয়েছিল। নন্দাঘুন্টি জয়ন্তী অভিযানের সূত্র ধরে নতুন ও পুরাতন পর্বতারোহীদের মধ্যে মিলন ঘটুক। অলমতিবিস্তরেণ—।

নন্দাঘুন্টি জয়ন্তী অভিযানের জন্য সব ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেছে—বাকি শুধু অর্থ, রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা। এসব যে কোথা থেকে আসবে সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত এদের কোন ধারণাই নেই। অবস্থা হুবহু সেই প্রথম নন্দাঘুন্টির মতো। তবে এদের খুব দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রথমবার যাঁরা যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, এবারেও তাঁরা কেউই পেছ-পা হবেন না। প্রথমবার নন্দাঘুন্টি যেমন একজন একজন করে প্রয়োজনীয় সবাইকে এনে হাজির করেছিল, এবারেও ঠিক তাই হবে।

নন্দাঘুন্টির নজরে একবার যে পড়েছে তার কি আর রেহাই আছে!

কেম্বাজের বিচারে ইদু বোরি-র প্রাণদণ্ড হয়। ভারতবর্ষের অথবা ইংল্যাণ্ডের সুপ্রিম কোর্টে আপীল করবার সুযোগ থাকলে এবং আপীল করা হলে এই দণ্ডাদেশের কোনরকম নড়চড় হত বলে মনে হয় না। জাত-অপরাধী বলে সাধারণত যা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে ইদু বোরি সেই ধরনের এক অতি-দুষ্প্রাপ্য চরিত্র।

ইদু বোরির নিবাস ছিল অধুনা অরুণাচল নামে পরিচিত তদানীন্তন নেফার সিয়াং উপত্যকা। অরুণাচলের সব নদীই অতীব ভয়ংকর; সিয়াং নদীর ভয়াবহতা অরুণাচলের অন্য সব নদীকে ছাড়িয়ে যায়। ভারত-তিব্বত সীমান্তের তুষারাচ্ছন্ন এলাকা থেকে নির্গত হয়ে, অরুণাচলকে উত্তর দক্ষিণে একটি সরল-রেখায় অতিক্রম করে, নদীটি ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এসে মিলেছে। নদীটি খুব একটা প্রশস্ত নয়—পাহাড়ী নদী প্রশস্ত হয় না।

সিয়াং নদীর উপত্যকা বলে কিছু নেই, কেবল খাড়াই—কোথাও পাঁচশ ফুট গভীর, কোথাও দেড়-দুই হাজার ফুট। ঝুঁকে না পড়লে অধিকাংশ জায়গাতেই জল দেখতে পাওয়া যায় না। তবে গর্জন শোনা যায়। আর সেই সঙ্গে বছরের অধিকাংশ সময় নদীবক্ষ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে নদীর দু-ধারের গভীর অরণ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পূর্ব-হিমালয়ের এই দুর্গমতায় ঋতু বলতে কেবল শীত আর বর্ষা। নদীর উচ্ছ্বসিত জলকণা শীতের কুয়াশা ও বর্ষার মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়ে—এবং সেই জলদগম্ভীর গর্জন—পার্শ্ববর্তী অরণ্যাঞ্চলে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করা অপেক্ষা কল্পনা করা সহজ। এমন পরিবেশে আপনা থেকেই নানা গল্পকথা সৃষ্টি হয়। বাস্তব অবাস্তব সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। প্রকৃতির এই খাস-তালুকে ব্রিটিশরাও অনুপ্রবেশ করবার চেষ্টা করেনি কখনো। দু-চার জন দুঃসাহসী পর্যটকের প্রতিবেদন থেকেই দোকানদার ব্রিটিশরা বুঝে নিয়েছিল যে এতদঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করা পড়তায় পোশাবে না।

এই রহস্যাবৃত সিয়াং নদীর দুই ধারে, সেই অনাদিকালের কাছাকাছি সময় থেকেই, বহু বহু উপজাতির বাস। নৃতাত্ত্বিক এবং প্রশাসনিক কাজ চালাতে

হবিবে হবে বলে এই সব উপজাতিকে পরবর্তীকালে যুক্তভাবে আদি বা আডি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় বলতে যেমন বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, পানজাবি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বোঝায়, তেমনি আদি বা আডি বললে বোঝায় গ্যালো, পাইলিবো, মেমবা, প্যাবো, বেকার, আশিং, সিমোং, বোরি প্রভৃতি বহুতর উপজাতি গোষ্ঠী। এরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে; এদের আচার-বিচারেও অনেক ফারাক। আমরা যেমন সাধারণভাবে আমাদের সংবিধান মেনে চলি, এরাও তেমনি সাধারণভাবে এদের আরণ্যক আইন মেনে চলে—সে আইনে ক্ষুধার উদ্রেক হলে বাঘের পক্ষে হরিণ ধরে খাওয়া আইনত দণ্ডনীয় নয়। বিশেষ করে বেয়াদবি করলে, হাতিদের মতোই, এরা বেয়াদবকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

ইচু বোরি কেন বো'র সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল আজ আর তা সঠিকরূপে জানবার উপায় নেই। ইচু বোরির মামলার বিবরণে তার কোন উল্লেখ নেই। ও কি কোন স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি করেছিল? অথবা, পরস্ত্রীর সঙ্গে সহবাস? ওর পক্ষে দুটোই সম্ভব। ও যে অন্য কারো মিথুন মেরে খায়নি বা মূল্যবান পুঁতি পাথর চুরি করেনি, সে কথা হলফ করে বলা চলে। ইচু বোরির আর যত দোষই থাক, রুচিটা স্থূল ছিল না। এমনও হতে পারে যে ইচু বোরি আদৌ সমাজচ্যুত হয়নি। এমনিতেই সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সামাজিক একঘেয়েমি ওর ধাতে একেবারেই সইত না।

ইচু বোরির প্রথম যখন সন্ধান পাওয়া গেল তার অনেক আগেই ও বোরি-সমাজের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছে। একটি স্ত্রী, একটি কিশোরী কন্যা ও একটি শিশু পুত্রসন্তান নিয়ে তখন ও টাংগাম উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে সুখে ঘর-সংসার করছে। ইচু বোরির স্বভাবে নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু ছিল যা অন্য সবাইকে স্বতঃই আকর্ষণ করত। তা নয়তো, একটা উপজাতি গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত হয়ে অপর একটা উপজাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে আশ্রয় পাওয়া বড় সহজ ঘটনা নয়। সিয়াং নদীর ডান ধারে নিডিং গ্রাম—শাখানদী ইয়াং-সাং-চু এখানেই সিয়াং নদীর সঙ্গে এসে মিশেছে। ইচু বোরি এই নিডিং গ্রামের কেবাঙের সম্মানিত সদস্য ছিল।

এই কেবাঙ হচ্ছে আমরা যাকে গ্রাম-পঞ্চায়েত বলি তারই পূর্ণাবয়ব রূপ। আদি বা আডি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি উপজাতি-গোষ্ঠীর প্রতিটি গ্রামে একটি করে কেবাঙ আছে। সাধারণত ছয়-জন সদস্যবিশিষ্ট এই কেবাঙের

হাতেই গ্রামের ভালোমন্দ ভূত-ভবিষ্যৎ সবকিছু। বিধি-প্রণয়ন, বিচার ব্যবস্থা ও গ্রাম-প্রশাসন সবকিছুরই মালিক এই কেবাঙ। অরুণাচলের প্রত্যেকটি উপজাতির মধ্যেই এই কেবাঙের মতো একটি করে সর্বশক্তিমান প্রতিষ্ঠান আছে। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন নাম—টাংসা-রা একে বলে মৌচুন্, সবডি-রা বলে মোকচুপ, কামান-মিশমি-রা বলে কাভাই, ইদু-মিশমি-রা বলে আব্বালা, ডাফলা-রা বলে সিংডু, আপাটানি-রা বলে বুলিয়াং, আকা-রা বলে মেলে, মোনপা-রা বলে সোঙ্গসেন—এই রকম আরও অজস্র। নাম যা-ই হোক এরা হল উপজাতি সমাজের ভাগ্য-বিধাতা—ছোট বড় সব ব্যাপারে। কবে বাঘ শিকার করতে যেতে হবে এবং কবে মাছ ধরতে, কোন্ বছর পাহাড়ের কোন্ ঢালে ঝুম-চাষ হবে এবং কবে কখন সেসব ঢালে আগুন ধরাতে হবে ও বীজ বপন করতে হবে, কোন্ কোন্ উৎসবে শূকর বলি হবে এবং কোন্ কোন্ উৎসবে মিথুন, এমনকি কবে সাধারণ ছুটি পালিত হবে—এই সবকিছুই স্থির করবে এই পর্ষৎ। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত যাবতীয় সমস্যার সুরাহা করা এবং কোন্ ব্যাধির কি চিকিৎসা হবে তারও বিধান দেবে এই পর্ষৎ।

এত সব গুরু দায়িত্ব যে কেবাঙের উপর ন্যস্ত, অনেক রকমের যোগ্যতা না থাকলে সেই কেবাঙের সদস্য হওয়া যায় না। গ্রামবাসীরাই গুণ-বিচার করে সদস্য নির্বাচন করে থাকে। এইসব উপজাতির কোন লিপি নেই অতএব মহাফেজখানাও নেই—উপজাতিদের স্মৃতিশ্রুতিতে প্রচুর ব্যুৎপত্তি না থাকলে কেবাঙের সদস্য হওয়া দুরাশা। তাছাড়া প্রচুর বাস্তব বুদ্ধির প্রয়োজন। ভূগোল, প্রতিরক্ষা, চাষ-বাস, আবহাওয়া তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়েও মোটামুটি দখল থাকা দরকার। অত একটা উপজাতি-গোষ্ঠীর কেবাঙে সদস্য নির্বাচিত হওয়া বড় সহজ কথা নয়। ইদু বোরি সেই পরীক্ষায় সসম্মানে কৃতকার্য হয়েছিল।

ইদু বোরির সামনে তখন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এরপর পণ হিসেবে অনেকগুলি মিথুন গ্রহণ করে মেয়ের বিয়ে দেবে, নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি শিখিয়ে ছেলেটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং তারপরে কেবল বিপদে-আপদে সবাইকে শলা পরামর্শ দেওয়া। এমন কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সশরীরে স্বর্গে যায়।

কিন্তু সে সবের অনেক আগেই একটা বড় মাপের অঘটন ঘটল। ইদু বোরির বাচ্চা স্ত্রী হঠাৎ ওকে ছেড়ে চলে গেল। উপজাতি সমাজে এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে এবং তা নিয়ে কেউই বিচলিত হয় না বা হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধায় না। কেবাঙের একজন কেউকেটা হিসেবে ইদু বোরি একটু চেষ্টা করলেই

ভাবতে পারত যে ওর বউ কার সঙ্গে কোথায় ইলোপ করেছে। দুষ্কৃতিকারীকে ধরে এনে ওর হাত-পা বেঁধে ওকে সিয়াঙের জলে নিক্ষেপ করবার সব সুযোগই ইছু বোরির ছিল—ঘরে-বাইরে ওর সম্মান তাতে আরও বাড়ত বই কমত না। হয়তো দুষ্কৃতিকারীর কাছ থেকে মোটা ক্ষতিপূরণও আদায় করতে পারত—কুড়িটা কি পঁচিশটা মিথুন। গরু ও মহিষের মাঝামাঝি—কুচকুচে কালো রং আর নির্বাক বিস্ময় ও সুগভীর প্রশান্তি ভরা ডাগর ডাগর দুটি চোখ—অতি সুন্দর এই প্রাণীটিই হল এদের একমাত্র লিগ্যাল টেনডার। মিথুনের সংখ্যা গুণে বিত্তের পরিমাণ। ১৯৬১ সনে একটি স্বাস্থ্যবান মিথুনের দাম ধরা হত ভারতীয় মুদ্রায় চার হাজার টাকা। একটা বউয়ের বিনিময়ে যে বিত্ত আসত তাই দিয়ে ইছু বোরি অন্তত ছয়টি বউ কিনতে বা পুষতে পারত।

কিন্তু এইসব উজ্জ্বল চিন্তা ইছু বোরি মোটে মাথায়ই আনল না। এমন সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে স্ত্রীর অন্তর্ধানের আগে থাকতেই ইছুর মেজাজ বিগড়োতে শুরু করে। নিঙিং-গ্রাম, স্রোতস্বিনী ইয়াং-সাং-চু এবং নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নিশ্চয়ই আগে থাকতেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল—স্ত্রীর অন্তর্ধানের ব্যাপারটা হয়তো নেহাতই বোঝার উপর শেষ খড়ের কুটোটি।

স্ত্রী ভেগে যাবার পর ইছু বোরি প্রথমেই কেবাঙে যাওয়া বন্ধ করে দিল। কেবাঙের সদস্য থাকা সম্পূর্ণই সদস্যের নিজস্ব ব্যাপার—কোন কারণ দর্শাবারও প্রয়োজন নেই। ইছু বোরি তারপর নিজের কিশোরী মেয়েটাকে দাসী হিসেবে বেচে দিল পাশের গাঁয়ের একটি লোকের কাছে। এটাও ওর নিজস্ব ব্যাপার—কেবাঙ কেবল হাঁ করে দেখল, কারও ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে অযাচিতভাবে নাক-গলাবার কোন অধিকার নেই কেবাঙের। কিন্তু লোকটার কি সত্যিই মাথা খারাপ?

এর পরে ইছু বোরি আরেক কাণ্ড করে বসল যার পরে আর কেবাঙের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। মেয়েটিকে বেচে দেবার কিছু দিন পরে একদিন নিজের শিশু-পুত্রটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ইছু বোরি বলল—'বনে যাচ্ছি, অনেক অনেক ইঁদুর ধরে এনে মস্ত ভোজ দেব।' দিনের শেষে ইছু যখন বন থেকে ফিরে এল তখন ওর সঙ্গে অনেক ইঁদুর—কিন্তু কাঁধের উপর ছেলেটি নেই। গ্রামবাসীদের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে ইছু সংক্ষেপে জানাল, বনের অপদেবতা উইয়ুদ ওকে খুব আদর করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

উইহুস নিজে এসে দান গ্রহণ করেছে এই খবর শুনে গ্রামবাসীদের আনন্দোৎসবের আর সীমা রইল না। উইহুস-এর কোপদৃষ্টিতেই গ্রামের যত অকল্যাণ। বহু বহু যুগ আগে পৃথিবী যখন তরুণী ছিল তখনই কেবল উইহুস সশরীরে এসে নিঙ্কিং গ্রামের পূজা গ্রহণ করত—গ্রামে তখন সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল। তারপরে বহুকাল হল উইহুস নিরুদ্দেশ। আর সেই থেকে গ্রামেরও দৈন্যদশা। সেই উইহুস যদি এতকাল পরে আবার আবির্ভূত হয়ে থাকে তবে তার চাইতে-সুখের কথা আর কি হতে পারে। ইঁদুরের উপাদেয় মাংসের সঙ্গে সে রাত্রে আপঙের বন্যা বয়ে গেল।

কিন্তু কেবাঙ কেমন করে অত বড় একটা কথা অত সহজে মেনে নেয়? ঋতুতে ঋতুতে কেবাঙের জোটবাই সমারোহ করে উইহুসের পূজা দেয়—মুরগী, শূকর অথবা মিথুন উৎসর্গ করে, উইহুসকে নিজে এসে তা গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়—পুরুষানুক্রমিক এমনি ধারাই চলে আসছে। সেই উইহুস নিজে এসে ইছু বোরির ছেলেকে হাতে ধরে নিয়ে গেছে—এমনটা একেবারে হতে পারে না তা না—কিন্তু তবু একটা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

পরদিন সকাল হবার আগেই কেবাঙের জরুরী নির্দেশে গ্রামের সবাই বনের পথে বেরিয়ে পড়ল। উইহুস যদি সত্যি সত্যি এসেই থাকে তবে নিশ্চয়ই কোথাও না-কোথাও কিছু-না-কিছু চিহ্ন রেখেই গেছে। ইছু বোরিও বেরোল। কিন্তু ও বনের দিকে গেল না, সিয়াং নদীর একটা বাঁকের কাছে সারাদিন ঝিম ধরে বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সত্য উদ্ঘাটিত হল। গতকাল ইছু বোরি ওর শিশুপুত্রকে এই বাঁকের কাছাকাছিই সিয়াং-এর কুজ্ঝটিকায় নিক্ষেপ করেছে। নদীর খাদ এখানটায় এত সঙ্কীর্ণ এবং এতই গভীর যে জল দেখা যায় না—কেবল চাপা গোঙানি আর চাপ চাপ কুজ্ঝটিকা।

ইছু বোরিকে আবার আশ্রয়ের সন্ধানে বেরোতে হল। কেবাঙের নির্দেশে ওকে নিঙ্কিং গ্রাম ছাড়তে হল। কোন অভিযোগকারী যদি উপস্থিত হয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করত তবে কেবাঙ মিথুন ও শূকরের সংখ্যা ঠিক করে দিত, যদি প্রাণদণ্ড দাবি করত তবে ইছু বোরিকে সিয়াং-এর জলে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করত। ইছু বোরি যা করেছে তা খুবই অন্যায়, কিন্তু সেজন্য কেউ যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি অতএব তা দণ্ডনীয় অপরাধ নয়।

সে যাই হোক, নিঙ্কিং গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হবার কিছুকাল পরে ইছু বোরি আবার আত্মপ্রকাশ করল একিং গ্রামে। আগমন তো নয় যেন আবির্ভাব। বাইরে

থেকে দেখলে একটু ক্লান্ত এবং অবসন্ন, মাথার চুলগুলো উস্কো খুস্কো, পরনের লেংটিটুকু জুটি না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এই সব কিছুই তুচ্ছ করে দিয়েছে ওর লোভনীয় স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল ঔদ্ধত্য। চোখ দুটিতে গভীর অবসাদের উপর দুষ্টু কৌতূহলের দ্যুতি। কিন্তু মানুষের বাইরের চেহারা ও ভিতরের চেহারা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হতে পারে। বাইরে থেকে দেখে নারীরা যার দিকে পিপীলিকার মতো উড়ে আসে তারই ভিতরে হয়তো নারী জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুন গনগন করে জ্বলছে। ইদু বোরির পরবর্তীকালের ক্রিয়াকলাপে এই বর্ণনায় প্রচুর সমর্থন পাওয়া যায়।

এটিং গ্রামে এসে পৌঁছবার অল্প দিনের মধ্যেই ইদু বোরি এক এক করে বেশ কিছু সংখ্যক বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলার সঙ্গে বেপরোয়া রকম অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ে। মেট্রোপলিটান জনারণ্যেও এসব ঘটনা বেশিদিন গোপন থাকে না— ছোট্ট এটিং গ্রামে তো এ-প্রান্তে কেউ তেমন কিছু ইশারা করলে তৎক্ষণাৎ তা অপর প্রান্তে জানাজানি হয়ে যায়। এ-ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা সিধে করবার জন্য উপজাতি সমাজের নানাপ্রকার দাওয়াইও আছে—মোটা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারো, ক্রীতদাস করে রাখতে পারো অথবা দা দিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দিতে পারো। কেবাঙের ভূতপূর্ব সদস্য ইদু বোরির এসব বিষয় না জানবার কথা নয়। কিন্তু প্রতিহিংসার আগুন একবার তেমনভাবে জ্বলে উঠলে তখন বিচারবুদ্ধি বিধিনিষেধ সব কিছুই সেই আগুনের ইন্ধন হয়ে ওঠে।

ইদু বোরি মামলার এই অধ্যায়টি কেন্দ্র করে ফ্রয়ডীয় প্রথায় মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বিস্তর সুযোগ রয়েছে। নিডিং গ্রামের সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ জীবনে স্ত্রী ছিল ঘরের একটা প্রয়োজনীয় আসবাবের মতো—সুষ্ঠুভাবে ছেলে মেয়ের জন্ম দিয়েছে, নিঃশব্দে ঘরের সব কাজ করেছে, কেবাঙের কাজে বিশদভাবে আত্মনিয়োগের জন্য অখণ্ড অবকাশ জুগিয়েছে। এমনিধারা চলতে চলতে, সব কিছুতে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর—অকস্মাৎ বউ বেপাত্তা হল। ইদু বোরির আত্মসম্মানে মর্মান্তিক আঘাত লাগল। ক্ষেপে গিয়ে মেয়েকে দাসী হিসেবে বেচে দিল; ছেলেকে খুন করল। তারপর বনবাস। ইদু বোরির এই বনবাস কালের কোন বিবরণ রক্ষিত নেই। কিন্তু এই বনবাসের সময়ই যে ওর দাম্ভিক অহমিকাগুলো টুটে গিয়ে স্ত্রী-জাতি সম্পর্কে ওর কৌতূহল জাগ্রত হয় সেটা সুনিশ্চিত। স্ত্রীজাতিকে এতকাল ও একটা প্রয়োজনীয় আসবাব বলে জানত; অতঃপর ঠাহর হল যে ওরা হয়তো তার চাইতে একটু বেশি রহস্যপূর্ণ। নইলে এত সহজে সব কিছু এমন বিপর্যস্ত

হয়ে যায়। ইচু বোরির মতো উদ্যমী পুরুষ এপদ্ম রহস্যটি উদ্ঘাটনের জন্ত আগ্রহ বোধ করবে তাতে আর বিচিত্র কি।

আবার আসলে হয়তো এসবের কিছুই নয়। সুযোগ-সুবিধা হলে স্বাস্থ্যবান পুরুষ মাত্রই যা করে থাকে ইচু বোরিও ঠিক তাই করেছে—স্ফূর্তি করেছে। এটিং গ্রামে ইচু বোরির উচ্ছৃঙ্খলতা কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল তা জানা না গেলেও গ্রামবাসীরা যে ওর ব্যাপার-স্যাপার দেখে রীতিমত বিচলিত এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল তা বুঝতে পারা যায়। এটিং গ্রাম থেকেও ওকে বের করে দেওয়া হয়—এক লেংটিতে।

এখানে একটু রহস্য অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। ইচু বোরিকে গ্রাম থেকে শুধুই কেন বের করে দেওয়া হল? যে সমাজে সামান্য চুরি ছ্যাঁচড়ামির জন্তও অপরাধীকে সিয়াঙের জলে নিক্ষেপ করবার বিধান আছে সেখানে কেন ওকে শুধু বের করে দিয়েই রেহাই দেওয়া হল? একথা ঠিক যে সহায়-সম্বলহীন ইচু বোরির কাছ থেকে কোনরকম ক্ষতিপূরণ আদায়ের সুযোগ ছিল না, ওকে ক্রীতদাস করে রাখাও না হয় খুব বিপজ্জনক ছিল—কিন্তু ওর মুণ্ডুটা কেটে রাখবার তো কোন নিষেধ ছিল না। তবে কেন ওকে সমুণ্ড ছেড়ে দেওয়া হল। তবে কি এটিঙের নায়িকারাই শেষ পর্যন্ত ওর প্রাণ রক্ষা করে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। অসম্ভব নয়। অরুণাচলের উপজাতি সমাজে নারীদের কোন অধিকারই যে স্বীকৃত নয় সেটা ঠিক। সামাজিক, পারিবারিক এমনকি ব্যক্তিগত সব ব্যাপারেও এরা সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে উপজাতি সমাজেই একটি বউ সংগ্রহ করতে এক এক সময় কয়েক পুরুষের সঞ্চিত অর্থ বিকিয়ে যায়। এমন মূল্যবান সামগ্রীর মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সব সময় লাভজনক নাও হতে পারে—যদি পাগল হয়ে যায়, কিম্বা যদি আত্মহত্যাই করে বসে!

এখানে একটা বাসকক্ষের নিকোবেনসের সুযোগ আছে—হিন্দি ফিল্মের আগ্রহীরা অনুধাবন করতে পারেন। উপজাতিদের আধ কাঠলংটাক লম্বা ঘরের ভিতর আগুন ঘিরে গাঁয়ের অভিভাবকদের ছোট ছোট মন্ত্রণাসভা বসেছে। লম্বা ঘরের ইংরেজি হল লঙ হাউস—নৃতত্ত্ববিদদের দেওয়া নাম। বাঁশের মাচার উপরে বাঁশের বেড়া বিছিয়ে তার উপরে বাঁশের দ-র-জা ঘর—উপরে খড়ের ছাউনি। মালিকের যতগুলি বউ লম্বা ঘরেও ততগুলি আগুন থাকে—আগলহীন, একের পর এক—বউয়ের সংখ্যা বাড়লে আগুনের সংখ্যাও বাড়ে, প্রয়োজন হলে ঘরের দৈর্ঘ্যও বাড়ে। কোন কিছু পরামর্শ করবার দরকার হলে তখন এই সব আগুন ঘিরেই

প্রকম ছোট ছোট মন্ত্রণাসভা বসে। আগুন থেকে আলো অথবা তাপের চাইতে ধোঁয়াই বেশি বেরোয়; সেঁকা মাংসের সঙ্গে বাঁশেরচোঙার আপঙের স্রোতস্বিনী বয়ে যায়; পরামর্শকারীরা যার যত কিছু প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য আছে অবিরাম তা বলে যেতে থাকে। বিভিন্ন আগুনের বক্তব্য ও প্রস্তাব নিয়ে চূড়ান্ত কথালাপের জন্ত শেষ সভাটি বসে মালিকের নিজস্ব আগুনটি ঘিরে। অগ্নিকুণ্ডগুলোর ধোঁয়ায়, আপঙের ক্রিয়ায়, আলোচ্য বিষয়ের উত্তেজনায়, মশালের কম্পমান আলোয় লম্বা ঘরের পরিবেশ তখন দারুণ রহস্তপূর্ণ। এই সময়ে কি অবগুণ্ঠিতা নায়িকা একটি অগ্নিকুণ্ড থেকে আরেকটি অগ্নিকুণ্ডে বারবার আপঙ পরিবেশন করে ফিরছিল? নায়িকার চোখদুটো কি তখন খুব জলজল করছিল? নায়িকা কি তারপরে হঠাৎ এক সময় কিছুক্ষণের জন্ত উধাও হয়ে গিয়েছিল?

যেমন করেই হোক, ইহু বোরিকে এরপরে আমরা দেখতে পাই হুজিং গ্রামে। এই গ্রামটিও সিয়াং নদীর ধার ধরেই আরও কয়েকদিনের পথ দক্ষিণে। উপজাতি সমাজে শ্রমের চাহিদা আছে। শক্ত-সামর্থ লোক পেলেই ওরা তাকে আশ্রয় দেয়— যদি না সে কোন শত্রুগ্রামের বাসিন্দা হয়। ইহু বোরি এখানে একটি টাংগাম পরিবারে আশ্রয় পেল। একটি স্ত্রী, একটি কন্যা ও তার জামাইকে নিয়ে আশ্রয়-দাতার খুব ছোট পরিবার। কিন্তু ইহু বোরি এসে আশ্রয় নেবার অল্পদিনের মধ্যেই বিপর্যয় শুরু হয়ে গেল। মেয়েটি ইহু বোরির প্রেমে পড়ে গেল—একেবারে মরিয়া হয়ে। সেখানেও রেহাই নয়, মেয়েটি বায়না ধরল ইহু বোরিকে ওর ঘরে এসে শুতে হবে। প্রেমোন্মাদিনীর কি আর তখন পথ-ঘাট জ্ঞান আছে; —কাজটি যে আদৌ সহজ নয় সেই সহজ কথাটি কে তখন ওকে বোঝায়! ওর শয়নকক্ষের দখল নিতে হলে তার আগে সেখান থেকে জামাইকে বেরিয়ে যেতে হয়—সেটি খুব সস্তায় হবার নয়। জামাই বাবাজী যদি মওকা বুঝে দর না-ও চড়ায় তা হলেই বা কি। ইহু বোরির একটা শুকর কি পাঁঠা ক্ষতিপূরণ দেবারও সামর্থ নেই। তবে?

মেয়েটি তবুও নাছোড়বান্দা, পথ একটা তাকে বের করতেই হবে। অবশেষে একটা পথ বেরোল। পথটায় একটু ঝুঁকি আছে কিন্তু ইহু বোরির আত্মবিশ্বাস অচেল। প্রথমে ও জামাইটির সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলল। এ ব্যাপারে ইহু বোরি সিদ্ধহস্ত। অচিরেই দুজনের মধ্যে দারুণ ভাব জমে গেল, ওঠা-বসা সব একসঙ্গে। তারপরে দুই স্যাঙাতে মিলে একদিন সিয়াং নদীতে মাছ ধরতে গেল। এমন বেড়ানো করা সুযোগ নষ্ট করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সিয়াঙের খাদে মাছ ধরতে ধরতে, ঠিক সন্ধিক্ষণে, নিপুণ হাতে কাজটা সমাধা হয়ে গেল। মাথাটাকে

থেঁতলে দিয়ে তারপরে হাঁটুর তলা থেকে পা দুটো আহ্লাদে ঝুরঝুর করে দেওয়া হল। পা দুটো অক্ষত ছেড়ে দিলে টোটিয়া প্রেতাত্মারা এক এক সময় প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। তারপরে দলাপাকানো লাশটাকে একটা পাথরের তলায় চাপা দিয়ে ইহু বোরি আবার গ্রামে ফিরে এল।

গ্রামে ফিরে এসে ইহু বোরি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সে কি, লাজাত এখনো ঘরে ফেরেনি? সে যে সেই সকাল বেলায়ই শরীরটা ভালো নেই বলে সিয়াং নদীর ধার থেকে চলে এল।

পথিমধ্যে নিঃসঙ্গ পথিকের উধাও হয়ে যাওয়াটা এতদঞ্চলে খুব একটা চমকপ্রদ ঘটনা নয়। মাঝে মাঝে অমন ঘটে থাকে। কোন বন্যজন্তুর মুখোমুখি পড়ে যাওয়া বা ধসের তলায় চাপা পড়া বা নদী-নালা পেরোতে গিয়ে জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া—এই এলাকায় এসব হামেশাই ঘটে থাকে। পরদিন তবু দূরে ও নিকটের সম্ভাব্য সব জায়গায় গ্রামবাসীরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল···কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তির কোন সন্ধান মিলল না। মাঝে মাঝে এমনও হয়, নিখোঁজ ব্যক্তির সব চিহ্নই লোপাট হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির সদগতি কামনা করে সমারোহপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানের পর ফুজিং গ্রামে আবার স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরে এল। ইহু বোতি এখন গৃহস্বামীর কন্যার সঙ্গে এক ঘরেই শোয়।

কিন্তু এমন মধুর্চন্দ্রিমা কখনোই স্থায়ী হয় না। এ-ক্ষেত্রেও হয়নি। আর যেমন হয়, আঘাতটি এল একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে। মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা—সেই থ্যাতলানো মাথা আর দোমড়ানো ঠ্যাং নিয়ে—নিজের পিসির কাছে এসে নালিশ করল। বলল, ইহুই আমার এমন দশা করেছে। আমি এখন সিয়াং নদীর অমুক জায়গায় যে বিরাট পাথরটা পড়ে আছে তার তলায় চাপা পড়ে আছি পাথরটা তুললেই সব বুঝতে পারবে।

কোন প্রেতাত্মার জবানবন্দী নিয়ে সভ্য জগতে কোন পুলিশ কেস হয় না। কোন মামলাও রুজু করা যায় না,—বছরের পর বছর ঘুরে অবশেষে যখন মামলার তারিখ পড়বে তখন যে প্রেতাত্মা ঘড়ি ধরে এসে সাক্ষী দিয়ে যাবে তার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু ইহু বোরির কপাল খারাপ—এদেশ তখনো অরুণাচল হয়নি, এদেশে তখনো সভ্য বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি।

ফুজিং গ্রামের কেবাং কেসটা টেক-আপ করল। মানুষ মরে গেলেই তার সব কিছু শেষ হয়ে যায়—সিয়াং নদীর বিভীষিকায় সেটা একটা কথাই নয়। বস্তুতির এই খাল তালুকে মধ্যযুগের ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোরা আজো নির্বিবাদে

বিচরণ করে থাকে।

এদেশে তখনো কোন পুলিশ বিভাগ নেই। অতএব দীর্ঘ বিলম্বিত কোন পুলিশী তদন্ত নেই, মানে, রামকে ধরবার ছল করে রাজ্যসুদ্ধ ধরপাকড় লাগানো নেই! তুতের মুখে খবরটি পেয়ে স্থানীয় কেবাং তার পরদিনই একটা শক্তিশালী মোশুপ দলকে নিয়োগ করল তুতের কথার যথার্থতা যাচাই করার জন্য। মোশুপ মানে গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী দল—কেবাঙের নির্দেশমতো জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজে আছে। দিনের শেষে মোশুপ রিপোর্ট দাখিল করল: তুতের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য! নির্দিষ্ট পাথরটি তুলে মৃত ব্যক্তির দলা পাকানো লাশটিকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। ইচু বোরির তখন দারুণ অসহায় অবস্থা।

খুবই পরিতাপের বিষয় যে এদেশে তখনো সভ্য বিচার ব্যবস্থা চালু হয়নি। মামলাটা একবার এজলাসে তুলে দিতে পারলে তখন ঝানু ব্যারিস্টারের জেরার জবাবে ইচু বোরির অতীত জীবনের গুরু-তুচ্ছ প্রতিটি ঘটনার রোমাঞ্চকর বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ শোনা যেত। টুটিং গ্রামের সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলিও বাদ যেত না। বছরের পর বছর চলে যেত, এবং তারপরে ইচু বোরি দোষী সাব্যস্ত হতেও পারত, না হতেও পারত। কেবাঙের অত কায়দা-কেতা নেই। লাশটিকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে, অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপ বিবেচনা করে সর্বসমক্ষেই সাব্যস্ত হল যে, ইচু বোরি দোষী। মৃত ব্যক্তির পিতা ও পিসীর পীড়াপীড়ি বিধায়—ইচু বোরির প্রাণদণ্ড হল অপরাধীর প্রেতাত্মা যাতে পরে কখনো গ্রামের উপরে উপদ্রব না করতে পারে সেজন্য আরও সাব্যস্ত হল যে, ইচু বোরিকে প্রথম পাথর দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে, তারপরে থ্যাতলানো দেহটা সিয়াঙের জলে নিক্ষেপ করা হবে। মাছে খেয়ে ফেললে বা জলে ভেসে গেলে নিশ্চিন্ত।

শেষ দৃশ্যের উপর যবনিকা নেমে আসছে। কেবাঙের অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত শূকরের মাংস ও আপঙে মহোৎসব তখন বেশ জমে উঠেছে আর তার মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে মারতে মারতে ইচু বোরিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সিয়াং নদীর দিকে। উৎসবের হুল্লোড়, ইচুর আর্তনাদ ও সিয়াঙের গর্জন। আর তারই সঙ্গে এক পিশাচিনীর বুক ফাটা কান্না। দোহাই তোমাদের, অপরাধীকে তোমরা ছেড়ে দাও—বিনিময়ে আমার যা কিছু আছে সব দেব। এই পিশাচিনী মাত্রই কয়েকদিন আগে একবার বিধবা হয়েছিল, এখন সে অন্তঃসত্ত্বা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার বিধবা হবে।

নেফা প্রশাসনের মুখ্য উপদেষ্টা ভেরীয়র এ্যালুইন যখন ১৯৫৫ সনে জুডিং

গ্রামে গিয়েছিলেন এই মহিলা তখনো সেখানে ঘর সংসার করছে। ওর আর তৃতীয় কোন বর জোটেনি। তবে ওর কিশোরী মেয়েটির পাণিগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে রেষারেষি জমে উঠেছে।

কোটি শশী পরকাশ

পর্বতারোহীরা হামেশাই বলে থাকেন যে পর্বত অভিযানে জয় বা পরাজয় কোন ব্যাপারই নয়। পাহাড়ে যাওয়াটাই বড়ো কথা, শীর্ষে আরোহণ করে ধ্বজা ওড়ানো একটা আনুষঙ্গিক ঘটনামাত্র—ততোধিক কিছু নয়।

কথাটা যে সবাই পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বলেন তা মনে হয় না। কেননা এই দার্শনিকোচিত উক্তিটি কেবল তখনই শোনা যায় যখন কোন অভিযান পাহাড় থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। বক্তাদের বাচনভঙ্গিতে এই প্রকাশ পায় যে, কেবল নিজেদের লজ্জা ঢাকবার এবং সান্ত্বনা দেবার জন্যই কথাটি আওড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া জয় পরাজয়—মানে সুখ-দুঃখ; জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সব সমার্থক এই পরমহংসোচিত উপলব্ধি পর্বতারোহীদের অধীগত হয়েছে—এতোটা দাবী করা মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি হবে।

আসলে ওই ধ্বজাওড়ানোর ব্যাপারটিকে আমরা যে কতোটা গুরুত্ব দিই তা আমাদের আচার-আচরণে প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পেয়ে যায়। পাহাড় থেকে জয়ী হয়ে ফিরে আসা কিছুদিন আগেও একটা দারুণ গৌরবময় ব্যাপার ছিল। সম্বর্ধনা আর মালা আর করতালির ধূম পড়ে যেত। রাতারাতি অখ্যাতজনেরা বিখ্যাত হয়ে উঠত, বেকার ব্যক্তি চাকরি পেত, পাড়ার মেয়েরা সম্ভ্রমের চোখে তাকাত।

আর পাহাড় থেকে পতাকা গুটিয়ে ফিরে এলে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে তখন আর ঠেলাগাড়ি ডেকে দেবার লোক পাওয়া যায় না। পাড়ার লোকেরা সামনে সমবেদনা দেখায়। আড়ালে বিদ্রূপ করে বলে—দৌড় তো জানাই আছে, কপালজোরে একবার উঠে পড়েছিল। সভা-সমিতি থেকে ডাক আসে না, অফিস থেকে বিশেষ ছুটি মঞ্জুর হয় না। পরবর্তী অভিযানের জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করেও প্রয়োজনীয় টাকা তোলা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

জয় আর পরাজয়ের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য কিছু আছেই। প্রায়ই দেখা যায়, পাহাড় থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে আসবার পর দলের মধ্যে ভাঙন ধরেছে। পরাজিত হবার পর জয়ী হয়েছি বলে দাবী করা হয়েছে এমন নজিরেরও অভাব নেই। হিমালয় নিয়ে মিছে কথা বলতেও মুখে আটকায়নি। পরাজয়ের হতাশা

ও গ্লানি খুব গভীরে গিয়ে না পৌঁছলে এসব ঘটে না।

তাছাড়া যুগের হাওয়াও আছে। পর্বতারোহণের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ যুক্ত হবার পর অবস্থা অধিকতর জটিল হয়েছে। এখন কোন দল হেরে গেলে সেটাকে দেশেরই হার বলে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের এই উপমহাদেশে এই রেষারেষিটা প্রাদেশিক এমনকি সাম্প্রদায়িক স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। এভারেষ্ট জয়ের পর ব্রিটিশদের জাতীয়তাবোধ যতটা উদ্দীপিত হয়েছিল, নন্দাঘুন্টি জয়ের পর বাঙালীর জাতীয়তাবোধও ততটাই উচ্ছ্বসিত হয়েছে। জয়ের একটা আলাদা স্বাদ, আলাদা রোমাঞ্চ আছেই—এই সাদামাটা কথাটা দর্শনের কোন তত্ত্বকথা দিয়ে চাপা দেওয়া যায় না।

এই পার্থক্যটা আমরা বেড়ার এদিক-ওদিক দুদিক থেকেই দেখেছি। ১৯৬০ সন থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত পর্বত অভিযাত্রী সংঘের আমরা মোট সাতটি রীতি-মত বড় মাপের হিমালয় অভিযান করেছি। তার মধ্যে চারটি অভিযান পুরোপুরি সফল হয়েছে, একটি আংশিক সফল হয়েছে, এবং বাকি দুটি ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। জয় ও পরাজয়ের স্বাদে যে কতো তফাৎ তা আমাদের হাড়ে হাড়ে জানা হয়ে গেছে। নন্দাঘুন্টি থেকে আমাদের সেই উচ্ছ্বাসময় প্রত্যাবর্তনের কথা আগেই বলেছি—আমাদেরও তখন মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে, বুঝি-বা বাংলা-মায়ের মুখোজ্জ্বলই করে বসে আছি।

আর ঠিক তার পরের বছরই—১৯৬১ সনে—সেই মানা থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসা! যাত্রীরা চলে যাবার পর হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফর্মটা মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করতে লাগল। অমন শূন্যতা কোনদিন সম্ভব বলে ভাবিনি। আমরা একে-বারে থ' হয়ে গিয়েছিলাম নইলে এই লাইনটি স্মরণ করে সান্ত্বনা পেতাম—ধিক, ধিক ওরে, শত ধিক তোরে নিলাজ কুলটা ভূমি। সে যাই হোক, এখন আমরা খুব নিশ্চিতরূপে জানি যে আজও পর্যন্ত আমরা যে সাতটি হিমালয় অভিযান করেছি তার মধ্যে এই ব্যর্থ প্রথম মানা অভিযানটিই সকলের সেরা। এটি থেকে আমরা হিমালয়কে যতটা দেখেছি এবং বুঝেছি, নিজেদেরকে যতটা চিনেছি ও জেনেছি তেমন আর কোনটি থেকে নয়। আমাদের হিমালয় অভিজ্ঞতার একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে এই ব্যর্থ প্রথম মানা অভিযান। আর এই অভিযান থেকে ফিরে এসেই হাওড়া ষ্টেশনে ঠেলা ডেকে দেবার লোক মেলেনি। অথচ ঠিক তার পাঁচ বছর পরে—১৯৬৬ সনে—এই আমরাই যখন আবার নির্ঘাটে মানা থেকে জয়ী হয়ে ফিরে এলাম তখন হাওড়া ষ্টেশনে মন্ত্রী থেকে, পুলিশ কমিশনার থেকে সবাই

উপস্থিত! আবার সেই শোভাযাত্রা, আবার সেই গডের বাত্তি। মাথা ঘুরে যায়। তাই বলছিলাম, যাত্রার ফল যে কখন মিষ্টি আর কখন টক আমাদের তা উত্তমরূপে জানা আছে।

তবুও এই আমরাই আবার কথায় কথায় বলে থাকি যে পর্বত আরোহণে জয়-পরাজয়টা খুব একটা বড়ো কথা নয়। কথাটা যে আমরা সব সময়ই কপটতা করে বলি তা ঠিক নয়। কথাটা মোক্তারী বলে মনে হতে পারে, তবু বলব, এটা করে আমরা আসলে একটা আদর্শ ব্যক্ত করবার চেষ্টা করি। সেই আদর্শে সবাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু চেষ্টাটি মহান, এমন তীর্থ পথে মরলেও স্বর্গবাস।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমার হিমালয় যাত্রা শুরু হয়েছিল—তীর্থযাত্রী হিসেবে। তখনকার সেই পায়ে চলার পথ, সেই চটিতে সন্ধ্যে নেমে আসা, উনুনের গনগনে আলোয় চটিওয়ালার সেই রুটি সেঁকা আর গুনগুন গান, মন্দাকিনীর সেই খলখল বয়ে যাওয়া—সেই সবকিছুই এখন প্রায় প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এই তীর্থযাত্রায়ও আমার একটা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা আছে।

১৯৫০ সনে ড্যাং-ড্যাং করে কৈলাস-মানস সরোবর করে আসবার পর এমন একটা দম্ভ হয়েছিল, যে মনে হত—চেষ্টা করলে এভারেস্ট শীর্ষও ঘুরে আসতে পারি। আমি আর আমার কৈলাসের বন্ধু নীলমণি হাজরা তাই ১৯৫১ সনের জানুয়ারী মাসে বুকটুকে বেরিয়ে পড়লাম—মুক্তিনাথ। অন্নপূর্ণা ও ধবলগিরি পর্বত-মালার মাঝখানে সে এক অতি দুর্গম তীর্থ—বছরের দুদশজনের বেশী যাত্রী যায় না, যাত্রার সময় মে-জুন। শেষটায় আমাদের দম্ভই আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। যাত্রা ঠিক মত শুরু হবার আগেই নিতান্ত অকারণে আমার পায়ে হঠাৎ চোট লেগে যায়। যাত্রার দ্বিতীয় দিনেই বুঝতে পারি যে ব্যাপারটা এরপর একগুঁয়েমিরও সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল বলে সেদিন নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছিল—কিন্তু স্মৃতিতে তার কোন দাগ নেই। সেদিনের কথা ভাবলে এখন শুধু ধবলগিরির বিশাল তুষার-শরীরের কথা মনে পড়ে। শীতকালের শুষ্ক আবহাওয়ার জন্যই হয়তো, সেই বিশালতাকে সেদিন খুব কাছে বলে মনে হয়েছিল।

এই যাত্রাকে যদি ব্যর্থযাত্রা বলি, প্রথম মানা অভিযানকে যদি ব্যর্থ অভিযান বলি—প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই দুটো উদ্যমই ব্যর্থ বলে নথীভুক্ত হবে—তবে সেই সঙ্গে একথাও কবুল করতে হবে যে সফলতার চাইতেও দামী জিনিস হিমালয়ে

আছে। —আর তা অনেক সময়ই দুর্যোগের ও ব্যর্থতার ছদ্মবেশ ধারণ করে হয়—চিনতে একটু সময় লাগে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠিক জানতে পারা যায়।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে হিমালয় অভিযানে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে সত্যকারের কোন ব্যবধান নেই আমাদের অধিকতর মূল্যবান অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই কেন্দ্রস্থলে আছে সামরিক কোন দুর্যোগ বা ব্যর্থতা।

আনন্দমুখর অভিজ্ঞতারও অভাব নেই—মানা থেকে পরাজিত হয়ে ফেরার পথে, সুরাইথোটা ও জুমমার মাঝামাঝি কোথাও, পাহাড়ের গায়ে খানিকটা সমতল জায়গা পেয়ে, আমরা হঠাৎ ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছিলাম—কোন কারণ ছিল না, এমনিই—সেদিনের কথা চিন্তা করলে আজও এই অর্ধ স্থবির মনটা অকারণ পুলকে একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু এগুলো রিলিফ মাত্র। যাত্রার পালায় যেমন ছুটো খানকুল্লকর দৃশ্যের মাঝখানে সখীরা এসে কিছুক্ষণ নেচে যায়—এও অনেকটা তেমনি। কিন্তু হিমালয় অভিজ্ঞতার আসল স্বস্তু মানে পীলার হলো সেইসব. যখন সারারাত তুষারঝড়ের মধ্যে পাহাড় ভেঙে ভোরবেলা গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জের লিপুধুরা অতিক্রম করা হয়েছে, যখন তিনদিনের পরিশ্রমের পর সেফুকের কাছে উদ্দাম-দুদাম ধৌলীগঙ্গাকে পোষ মানান হয়েছে, যখন দার্জিলিং থেকে দড়ি আনিয়ে দ্বিতীয়বার রজ্জুবদ্ধ করে ভয়াল বিশাল কাক্র হিমপ্রপাত প্রথমবার অতিক্রম করা হয়েছে, যখন মানা পাহাড়ের বাইশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে দুর্ঘটনায় ভয়াবহরূপে আহত চারজন শেরপাকে নিরাপদে নীচে বহন করে আনা হয়েছে, যখন—কিন্তু থাক, এ জাতীয় ঘটনা আরো এত অজস্র আছে যে বলে শেষ হবে না। সাফল্য অসাফল্যের দাগকাটা ফিতে দিয়ে এসব অভিজ্ঞতার মাপ নিতে যাবার কোন মানে হয় না।

কিন্তু এই সহজ সত্যটা মেনে নেবার কিছু বাস্তব অসুবিধা আছে সেকথা আগেই বলেছি। পরাজিত হলে, মানে পতাকা উড্ডীন করতে না পারলে, সমাজের চাহিদা মতো আমরা হতাশ হবই, গ্লানি বোধ করবই এবং তা ঢাকবার জন্য প্রয়োজন বোধ করলে হিমালয় নিয়ে মিছে কথাও বলব। এখন কেবল দেখতে হবে যে এই মিথ্যাচারগুলো একেবারে স্বভাবে না দাঁড়িয়ে যায়। কুয়াশা একসময় কাটবেই এবং কাঞ্চনজংঘাও যথাসময়ে প্রস্ফুটিত হবে, কিন্তু নজর রাখতে হবে যাতে নিজের রসুইঘরের ধোঁয়ায় দৃষ্টিটাই না আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কৈলাস থেকে ফেরার পথে তারাদা'র একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছিলেন, 'বুঝলা ধ্রুব, এই কৈলাস তোমাগো বেশী যত্ন না যে

খাইলা আর মাথায় চড়ল, এই হইল গিয়া পুরানো রুচ—অথন যত পার খাইয়া লও, নিশা জবর পরে।' আসল কথা হল হিমালয়ে যেতে থাকলে জয় ও পরাজয় অতিক্রম করে হিমালয়ের সঙ্গে একদিন পরিচয় হবেই। কেবল নজর রাখতে হবে যাতে আমাদের মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে না রাখে।

জয়-পরাজয়ের প্রশ্নটা অতএব এখন মুলতুবী থাক। শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হিমালয় যাত্রীকে নিজেকেই করতে হয়—নিজেকেই স্থির করতে হয় জয়ী হয়েছি, না পরাজিত হয়েছি। হিমালয়ের এই এক বিচিত্র ব্যাপার—প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজেরাই নিজেদের হার-জিৎ ঠিক করে নেয়।

হার-জিতের প্রশ্নটা না হয় মুলতুবী রইল, কিন্তু লাভ-লোকসানের হিসেবটা বাদ ফেলে রাখা চলে না। সত্যিই তো, এত অর্থ, এত সময়, এত উদ্যম ব্যয় করে যে আমরা পাহাড়ে যাই তার পরিবর্তে কি নিয়ে আসি? যা নিয়ে আসি তাতে কি পড়তা পোষায়? ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈশ্যযুগে তা আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

পাহাড় থেকে আমরা যখন কিছু নিয়ে আসি, তার দুটো হিসেব আছে—অনেকটা ব্যাপারীদের এক-নম্বর আর দু'নম্বর খাতার মতো। একটা পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে একটা পতাকা উড়িয়ে দিলে তাতে বাংলা-মায়ের কতটা মুখোজ্জ্বল হয়, বাঙ্গালীজাতির চুপসে যাওয়া বুক কতটা স্ফীত হয়, বাঙালী যুবকেরা কতটা উদ্দীপিত হয়ে পাড়ার চায়ের দোকান সরগরম করে তোলে—সেসব সূক্ষ্ম হিসেব আমাদের কম্ম নয়। পাহাড়ের চুড়োয় বসে যে-ব্র্যাণ্ডের সিগারেট টেনেছি, ঝড়ের রাতে যে ব্রানডের পানীয় খেয়ে শরীর গরম রেখেছি, পরবর্তীকালে সেসব ব্র্যানডের সিগারেট বা পানীয়ের বিক্রি কতটা বেড়েছে তাও আমাদের জানবার উপায় নেই। তবে এসব ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা সমতা আছে। বছরের পর বছর প্রতিবছর এতগুলি করে হিমালয় অভিযান করবার এত টাকা, এত দ্রব্য-সামগ্রী তো এদেশ থেকেই সংগ্রহ করা হয়। পৃষ্ঠপোষকদের বদান্যতা অক্ষুণ্ণ থাকুক, এইসব বারো-সতেরো হিসেবে আমাদের গিয়ে দরকার নেই।

অপর হিসেবটা আমাদের নিজেদের দিক থেকেই খুব জরুরী। এই হিসেবটা যেহেতু আমাদের নিজেদের নিয়েই, মানে নিজেকে নিয়েই, সেজন্য এখানে পায়ের তলার মাটি একটু শক্ত। হিমালয়কে আমরা কে-কতটা-কী-দিয়েছি এবং হিমালয়ের কাছ থেকে আমরা কে-কতটা-কী-পেয়েছি তার সূক্ষ্ম বিচার সম্ভবও নয়, হাস্যকরও বটে। তবে একটা মোটা দাগের হিসেব করা চলে—সেইটুকুই মন্দ কি!

এ-ব্যাপারে কেবল নিজের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য, অতএব নিজেকেই প্রথম কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। ১৯৫৫ সনে পঁচিশ বছর বয়সে আমার হিমালয় যাত্রা শুরু হয়। সেই থেকে আজও পর্যন্ত ওই একটি নেশায়ই বুঁদ হয়ে আছি। যে বয়সে মানুষ চাকরিতে মন বসায়, ঘর-সংসারের কথা চিন্তা করে, মেঠোপথ ছেড়ে রাজ-পথের উপর উঠে আসে, ঠিক সেই বয়সেই আমি হিমালয় নিয়ে মেতে উঠলাম। আত্মীয়স্বজনেরা বলেন, এজন্যই আমার চাকরিতে কোন উন্নতি ঘটেনি, এজন্যই আমি সংসার চালাতে গিয়ে প্রতিপদে হোঁচট খাই। হবেও বা। তবে আমি এমন অনেক নজির দেখাতে পারি যেখানে হিমালয়ের কোন নেশা নেই, কিন্তু তবুও চাকরিতে পদোন্নতি ও সংসারে শান্তিলাভ ঘটেনি। তবুও একথা ঠিক যে অন্য সবাই যে সময়টা ও উদ্যমটা বিষয়কর্মে ব্যয় করে, আমি সেই সময়টা হিমালয় করে কাটিয়ে দিয়েছি। এ-নিয়ে কখনোই এতটুকু অনুশোচনা হয়নি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। আজ এই বাহান্ন বছর বয়সে যখন রাত জেগে নাইট ডিউটি দিতে হয়, ট্রাম-বাসের ভিড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অফিসে হাজিরা দিতে হয়, তখন এক-একসময় কেমন যেন খট্‌কা লাগে—মূলধনটা হয়তো ঠিকমত নিয়োগ করা হয়নি, দুনৌকোয় পা দিয়ে কোন কূলেই বোধহয় আর পৌঁছনো হল না। মুস্কিল এই, অনুশোচনাটা কখনোই খুব একটা স্থায়ী হয় না। পড়্‌তা কষবার আগেই প্রতিবার হিমালয় এসে হাজির হয় এবং ট্রাম-বাসের ভিড়, বড়বাবুর রক্তচক্ষু, সবকিছু কোথায় আড়াল হয়ে যায়। আজকের এই সুযোগটা তাই নষ্ট করা ঠিক হবে না—হাতের কাছেই কাগজ-পত্র আছে।

লোকসানের দিকটা নিয়ে এর মধ্যেই অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। কেবল এটুকু যোগ করলেই যথেষ্ট হবে যে পাহাড় থেকে নেমে আসবার পর সমতলের গরমটা একটু বেশি দুঃসহ ঠেকে, শহরের কপটতা ও কৃত্রিমতা একটু বেশি গায়ে বাজে, চারিদিকের পুঞ্জীভূত কুশ্রীতা একটু বেশি করে নজর পড়ে। উদরটিকে কলকাতায় রেখে মাথাটিকে হিমালয়ের মেঘালোকে ভাসিয়ে দিলে আরও কতরকমের বিড়ম্বনা ঘটতে পারে আমরা তা পাঠকের কল্পনার উপর ছেড়ে দিলাম —সেটাই নিরাপদ।

এবারে হিসেবের অন্য দিকটা। হিমালয় অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আমি যে সাংবাদিকের চাকরি পেয়েছি সেকথা আগেই বলা হয়েছে। নিছক পেশা হিসেবেও সাংবাদিকতার সঙ্গে কেরানিগিরির বা দালালগিরির কতটা পার্থক্য আছে এখানে সে নিয়ে তর্ক তোলা নিরর্থক। তবে এই সাংবাদিকতার

সুবাদেই আমি একাদিক্রমে দশ বছর ধরে পূর্ব-হিমালয় বিস্তারিতভাবে ঘুরে দেখবার সুযোগ পেয়েছি. সাংবাদিক হিসেবেই অন্তত দুটো পর্বত অভিযানের সহযাত্রী হয়েছি—সব অফিসের খরচায়—এসব কথা গোপন করা অসততা হবে। পেশা ও নেশার এমন অবিচ্ছেদে মিলেমিশে থাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

এই পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে অভিযোগ করে কোন লাভ নেই, তবে হিমালয় হাতের কাছে থাকলে তা আরও অনেক রকম কাজে এসে যায়। উপরওলার কাছে গিয়ে গায়ে পড়ে অপরাধ স্বীকার করে চাকরিরক্ষা করতে হবে—কঠিন কাজ, পা উঠতে চায় না—তখন আমি সূক্ষ্মদেহে ফুড়ুৎ করে লিপুধুরা চলে যাই, কিম্বা পূবী কামেট হিমবাহে—সেখানে রাত্রি গভীরে প্রচণ্ড তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যে প্রাতি-পদক্ষেপে পর্যুদস্ত হয়ে আমরা ধীরে ধীরে তুষার প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছি—আর সূক্ষ্মদেহটা যখন অমিতবিক্রমে তুষার ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করছে ঠিক তখনই স্থূলদেহটাকে উপরওলার সামনে হাজির করে দিই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, তারপরে আর কোন ঝড়-ঝাপটাই গায়ে লাগে না।

তবে কিনা বিপদকালে হিমালয়কে সবসময় হাতের কাছে খুঁজে পাওয়া যায় না।

যতই মূল্যবান হোক না কেন, এই সবই আসলে আজকের হিসেব-রক্ষকের পরিভাষায় যাকে বলে—মিসেলেনিয়াস রিসিপ্টস, মানে তেমন কিছু নয়। হিমালয়ের কায়দাই আলাদা—অধিকতর মূল্যবান জিনিসগুলো আপনা থেকেই নিঃশব্দে, অজ্ঞাতে, হিসেবের খাতা ছাপিয়ে জমা পড়তে থাকে। এখন অনেকসময় সাধ্যোচিত নিরাসক্ত চোখে যখন সম্পূর্ণ হিমালয় যাত্রাটির দিকে তাকিয়ে দেখি তখন আর বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না যে কোন জিনিসটার সঠিক দাম কতো। এসব জিনিসের ক্যাটালগ করা শক্ত—বোধহয় অসম্ভব—তবে ছোট বড় সব কিছু মিলিয়ে যদি এককথায় বলতে হয় যে হিমালয়ে ঘুরে ঘুরে নীট লাভ কী হয়েছে ? পত্রপাঠ জবাব দেব—নীট লাভ হিমালয়।

এর মধ্যে আধ্যাত্মিক কোন ব্যাপার নেই। গত সাতাশ বছরের ঊর্ধ্বকাল ধরে হিমালয়ে ঘুরে ঘুরে নানাকিছু সংগ্রহ করেছি। তার সবকিছুই যে সংগ্রহশালায় সাজিয়ে দেখাতে হবে, এমন কোন কথা নেই, কিছু পায় বলেই বিষয়ী মানুষরাও অর্থব্যয় করে সমুদ্র পাহাড় মরুভূমি দেখতে যায়। কোথাও একটা নাফা না থাকলে এমনটা হত না। তবে এখানে এ কথাটাও বলে রাখা দরকার যে, আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে পর্বতারোহণ হতেই পারে না।

পর্বতারোহণের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক যেদিন পুরোপুরি ঘুচে যাবে—সেদিন খুব দূরে নেই, খুব দূরে নয়—সেদিন থেকে পর্বতারোহীদের নতুন নাম হবে পর্বতে আরোহণকারী।

কিন্তু এইসব কটু কথায় মাছ ঢাকা যাবে না—আমরা খোঁজ করছিলাম যে সুদীর্ঘ হিমালয় যাত্রা করে আসলে কি পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা যদি পুরোটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে হত তবে তা নিয়ে এত কথা বলার অবকাশই মিলত না। অতএব আর ধানাই-পানাই না করে শুরু করে দেওয়া যাক।

আমাদের হিমালয়-যাত্রার সুবিস্তৃত ক্যানভাসটির দিকে তাকালে প্রথমেই যা নজরে পড়ে তা হল—সৌন্দর্য। এই পৃথিবীটা যে বেশ সুন্দর তা কবিদের কবিতায় পড়া ছিল, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় তার তেমন কোন সমর্থন ছিল না। অল্প বয়সেই কলকাতায় চলে এসেছি—সুন্দর বলতে ময়দান আর হুগলী নদী। কিন্তু হিমালয়ে গিয়ে সরেজমিনে দেখেছি যে পৃথিবীতে সৌন্দর্য আছে এবং তার অতি অল্প অংশই এখনো পর্যন্ত কবিদের কবিতায় ধরা পড়েছে। এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে কলকাতাকে নিয়ে সি-এম-ডি-এ যা-ই করুক না কেন, যতদিন হিমালয়ে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত হবে, যতদিন রডোডেনড্রন ফুটবে, এই পৃথিবী ততদিন সুন্দর থাকবেই।

এই সৌন্দর্যের ব্যাপারটা একটু চোখে সয়ে গেলে হিমালয়ের ক্যানভাসের উপর তারপরে যা নজরে পড়ে তা হল মানুষ। হিমালয়ে গিয়ে আমরা প্রকৃত মানুষ দেখতে পেয়েছি—এটা একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। কলকাতার মানুষের থেকে এই হিমালয়ে দেখা মানুষের চেহারা-চরিত্র সবকিছুই সম্পূর্ণ আলাদা। এই মুহূর্তেই কয়েকটি চেহারা মনে পড়েছে।

আক্কেলসিং পলটনসিং এখনো হিমালয়ের পথে পথে মাল বহন করে কিনা জানিনা—জানবার উপায়ও নেই, প্রয়োজনও নেই। আমাদের স্মৃতিতে খোদাই হয়ে আছে নন্দাঘুন্টির সেই আক্কেল আর পলটন। প্রবল তুষারপাতের জন্য দু-নম্বর শিবিরের অগ্রবর্তী সঙ্গে মূল শিবিরের চারদিন ধরে কোন যোগাযোগ নেই। উপরে মদন ও বিশ্বদেবরা যে কি অবস্থায় আছে তা ওরাই জানে, তবে গত দুদিন ধরে যে ওরা অভুক্ত আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপরে যা র‍্যাশন ছিল তাতে ওদের টেনেটুনে দুদিন চলে থাকতে পারে। এই তুষারঝড়ের মধ্যেই অবিলম্বে উপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, উপরে খাদ্য পাঠাতে হবে।

কিন্তু যে কাজ নিজেরা করতে পারি না সে কাজ অপরকে করতে বলি কেমন

করে। বলতে হল না, আক্কেল আর পলটন নিজেরাই এগিয়ে এল। সেদিন পড়ন্ত বেলায় প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে ঘন কুয়াশা ভেদ করে ওদের এগিয়ে আসতে দেখে উপরের ওরা খুব চমকে উঠেছিল—কোন জীবজন্তু বা তুষার মানব-টানব কিছু নয় তো। তারপরেই আসল রগড়: সাহেবরা ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে আক্কেল আর পলটনও খেলায় মেতে গেল। খেলাচ্ছলে, তুষারঝড়ের মধ্যে সারাদিন ধরে ফাটল-সমৃদ্ধ রোনটি হিমবাহ অতিক্রম করবার পর, খেলাচ্ছলে ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে একবার সুড়ুৎ করে নেমে যায় আবার চোখের নিমেষে উপরে উঠে পড়ে! সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমরা হেসে কুটিকুটি হই।

এই আক্কেলই পরের বছর আরেক কাণ্ড করেছিল। নানা অভিযানের পথে আমরা ট্রেক করছি। যোশী মঠ আর তপোবনের রাস্তায় হঠাৎ আক্কেলের সঙ্গে দেখা—কোদাল, শাবল নিয়ে পি-ডবলু-ডির রাস্তা মেরামত করছিল। ওই অবস্থায় আমাদের সঙ্গে চলে এল। কোদাল-শাবল, পাওনা-গণ্ডা? —যো হোগা সো হোগা। কলকাতায় এ ধরনের মালবাহক পাওয়া যায় বলে আমাদের জানা নেই।

কিম্বা যদি গোরা সিং-এর কথাই বলি। চার নম্বর শিবিরের সাড়ে একুশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে আহত পাসাং লাকপাকে বয়ে এনেছিল, সুদীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পূর্বী কামেট হিমবাহ অতিক্রম করে একেবারে মালারী সামরিক ছাউনি পর্যন্ত, এই গোরা সিং। এই অসাধ্য সাধন কাজটুকু চুকিয়ে দেবার পর গোরা সিং-এর মুখে আবার সেই সরল নির্বোধ হাসি। এমন মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পারা ভাগ্যের কথা।

এই প্রসঙ্গে পিথোরাগড়ের ঘনশ্যাম পুনেঠার কথা মনে পড়ছে। ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন মানুষটি। তিনদিন ধরে অবিরত ছোটাছুটি করে আমাদের কৈলাস যাত্রার খুঁটিনাটি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—নিজের ব্যবসাপত্তরের কথা বিস্মৃত হয়ে এবং বলা-বাহুল্য বিনা পারিশ্রমিকে। কৈলাস-যাত্রী এলেই এমন করে থাকেন। অথচ নিজে কখনো কৈলাস যাননি, যদিও ইচ্ছা করলে বছরে দুবার ঘুরে আসতে পারেন। জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন, ডাক পড়লেই যাব, ইয়ে তো আপনা ব্যাবস্তা ঘর হ্যায়। আমাদের কৈলাস স্মৃতির একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র এই ঘনশ্যাম পুনেঠা—এমন মানুষ আর দ্বিতীয়টি দেখি নি।

আরও অনেক মুখ ভিড় করে আসছে—পশ্চিমে গাড়োয়াল থেকে পূর্বে অরুণাচলের সীমা ছাড়িয়ে নানা জায়গা থেকে নানা অভিব্যক্তি। তাদের সকলের

শুধু নামোল্লেখ করলেও জায়গা কুলোবে না, তাছাড়া একের পর এক সকলের নাম মনে পড়বে এমনও আশা করা যায় না। বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে এরা সবাই আমাদের হিমালয় অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ভূমিকা, কিন্তু সব কয়টি ভূমিকাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবু অন্তত দু'জনের কথা একটু উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে—এরা কীচ খাম্পা ও আং শেরিং। কীচ খামপা আমাদের কৈলাস যাত্রার গাইড ছিল, আর আং শেরিং নন্দাঘুন্টিসমেত প্রথম তিনটি হিমালয় অভিযানের শেরপা সরদার। আমার এই নাতিদীর্ঘ জীবনে অভিজাত-অনভিজাত সবরকম সমাজেই মেলামেশা করবার কিছুটা সুযোগ হয়েছে, কিছু কিছু নামীদামী ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছে—কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, কীচ খাম্পা ও আং শেরিং-এর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আমার অভিজ্ঞতায় তৃতীয়টি আসেনি। যেই গুণগুলি থাকা আবশ্যক বলে মানুষকে অনেক আশা করে মানুষ বলা হয়েছে, সেই গুণগুলি এদের দু'জনের কাছেই শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ ব্যাপার ছিল—যা দেখিয়ে বেড়াবার প্রশ্নই ওঠে না।

অনেক সময় দেখা যায় হাতের চাইতে আমটা বড়ো হয়ে গেছে, তখানে প্রতিবেশের চাইতে উপস্থিতিটা। কিন্তু এই দু'জনের বেলায় দেখেছি, হিমালয় আর এদের মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। এদের দু'জনের মধ্যে আমরা সমগ্র হিমালয়কে প্রতিফলিত দেখেছি। এদের মতো সহযাত্রী টাকা দিয়ে বা হুকুম করে পাওয়া যায় না—কপাল থাকা চাই।

প্রতিনিয়ত অপমানিত হতে হতে, ক্ষুদ্র হতে হতে যখন সব আস্থা নিঃশেষ হয়ে যায়, তখনই এরা দু'জন এসে ইশারায় বলে দেয়—মানুষের যাত্রা অব্যাহত আছে অব্যাহত থাকবে।—হুঁশিয়ার হয়ে চল্ না।

মানুষের কথা বলে শেষ হবার নয়, এবারে বরং পরের আইটেমটা ধরা যাক। পরের আইটেম—ভারতবর্ষ। হ্যাঁ, হিমালয়ে গিয়ে আমরা নতুন করে আবার আমাদের নিজেদের দেশ আবিষ্কার করেছি। এটা কারো কারো কাছে একটু মেটাফিজিক্যাল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়, বিষয়টা খুব জরুরী।

ছোটবেলায় ভূগোলের খাতায় ভারতবর্ষের যে মানচিত্র আঁকতাম তার এমনি শিল্প-সুষমা ছিল যে দেখলেই মনে গেঁথে যেত, আঁকতে কোন অসুবিধাই হত না। তারপরে দেশের হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের খুব মন্ত্রী হবার সাধ হল, দেশটাকে খণ্ড ছিন্ন করা হল।

এই দেশবিভাগ আমরা পুঁথিগতভাবে মেনে নিয়েছি, কিন্তু ভেতরে কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড আপত্তি আছে! দেশের কথা ভাবলেই চোখের সামনে একটা কীটদষ্ট বীভৎসতা ভেসে ওঠে, সবকিছু বিষাদ হয়ে যায়। এই অবস্থায় দেশের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াই বাঁচবার একমাত্র রাস্তা। আমরাও কমবেশী সফলতার সঙ্গে এই রাস্তা ধরেই চলছিলাম। কাজটা যে খুব কঠিনতা নয়, তাছাড়া এ ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য সংবাদপত্র সমেত আরও হাজারো রকমের আয়োজন রয়েছে। দিব্যি অফিসে যাচ্ছিলাম আর অফিস থেকে ফিরছিলাম।

দেশ নিয়ে আমাদের কোন উদ্বেগ ছিল না, অতএব এ নিয়ে কোন রকম অনুসন্ধান-কার্য চালাবার কথা আমাদের কখনো মনে হয়নি। কিন্তু আপনা থেকেই কখন ওষুধের কাজ শুরু হয়ে গেছে। হিমালয়ের বিভিন্ন নদী উপত্যকা দিয়ে চলতে চলতে—আর সেই সঙ্গে ইতিহাস ভূগোলের যতটুকু পাঠ্যপুস্তকে পড়া ছিল—আর বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—হিমালয়ের নির্জনতায় পথ চলতে চলতে আমরা খুব স্পষ্ট করে যা বুঝতে পেরেছি র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কলমের এক খোঁচায় তা বদলে যেতে পারে না। আজ যখন পাকিস্তান ক্রিকেট খেলায় জিতলে ভারতীয় মুসলিমরা উৎফুল্ল বোধ করে, বা পাকিস্তানে রাজনৈতিক ওলট-পালট ঘটলে আমরা হর্ষ প্রকাশ করি, তখন অনেকেই একটু অস্বস্তি প্রকাশ করেন—কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা এখন আর বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয় না, বরং আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়। এই থেকেই বোঝা যায় যে বহুকাল আগে এই উপমহাদেশে যেই সাধনা শুরু হয়েছিল নানা বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সেই সাধনা আজও অব্যাহত আছে।—এক র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কলমের খোঁচায় এতদিনের একটা সাধনা মিথ্যা হয়ে যাবে এমন হতেই পারে না। এই উপ-মহাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন আর আমি ততটা চিন্তিত নই। শুধু পথ চলতে হবে হুঁশিয়ারসে।

হিমালয় থেকে আরও যত কিছু সংগ্রহ করে এনেছি—না না, ভয় পাবার কারণ নেই—সেসবের কেবলমাত্র নামোল্লেখ করতে শুরু করলেও তা কোনদিন শেষ হবে না। অনেকের ধৈর্যচ্যুতিরও আশঙ্কা আছে। হিমালয়ে গেলে অবশ্য ধৈর্যের পরীক্ষাও দিতে হয়। এখানে সে তালিকা দেওয়া হবে না কারণ তার অন্য মুস্কিল আছে।

যখনই একটা আইটেমের কথা চিন্তা করে তা তালিকাভুক্ত করতে

যাই তখনই সেটা থেকে আর দশটি আইটেম বেরিয়ে আসে—এবং এমনি ধারাই চলতে থাকে। হিমালয়ের কোন দৃশ্য বা ঘটনার কথা যখনই বা যতবারই চিন্তা করি তখনই এবং প্রতিবারই সেই দৃশ্য ও ঘটনার মধ্যে নতুন কোন অর্থ বা ব্যঞ্জনা খুঁজে পাই। এতে করে হিসেব জুড়তে অসুবিধে হয় বটে কিন্তু তা নিয়ে ক্ষোভ করে লাভ নেই। হিমালয়ের সৃষ্টিই হয়েছে এমনি করে।

যেই হিমালয়ে আমরা গেছি সেটাকে হয়তো একটা নিছক প্রাকৃতিক ব্যাপার বলে প্রমাণ করা সহজ। কিন্তু যেই হিমালয়কে আমরা দেখেছি এবং জেনেছি তার সঙ্গে অনেক সৌন্দর্যানুভূতি, সাধনা, পদযাত্রা এবং আরও অনেককিছু জড়িয়ে আছে। এই হিমালয় সৃষ্টির কাজ যে কত দিক থেকে ও কতদিন ধরে চলে আসছে—ক্রমাগত চলছে—ভেবে তার কূল পাওয়া যাবে না। আগেকার দিনে গৃহস্থরা যখন সারাজীবন ধরে একটি দুটি করে পয়সা জমাত—পরিণত বয়সে হিমালয়ের তীর্থে যাবে বলে—তখন সেই সঞ্চয়ের সময়ই সে হিমালয় সৃষ্টি করেছে। কে বলতে পারে, এই যে আমি আমার বেলেঘাটার বস্তি-পরিবৃত ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়িতে এমনভাবে গলদঘর্ম হচ্ছি, এতে করেও হয়তো হিমালয় সৃষ্টি হচ্ছে—এক ধরনের। হিমালয় অভিজ্ঞতা বড়ই জটিল ব্যাপার, অনেক কাটছাট না করলে একে ডাবল-এনট্রি সিসটেমে আনা যাবে না, আবার একটু কাটছাঁট করলেই হিমালয়কে আর হিমালয় বলে চেনা যাবে না। তাই বলছিলাম যে মুস্কিল অনেক রকমের।

অনেকগুলো মূল্যবান আইটেমই জমা দেওয়া গেল না। তাই নিয়ে খেদ করবার বিধি নেই। হিমালয়ে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যায়—কোন উপত্যকায় হয়তো যাওয়া হয়নি, কোন তীর্থে হয়তো পৌছনো হয়নি, কোন যাত্রা হয়তো পরিত্যক্ত হয়েছে—কিন্তু হিমালয় অভিজ্ঞতায় এইসব নেতিবাচক ব্যাপারগুলোরও একই মর্যাদা। তবুও একটা আইটেমের অন্তত নামোল্লেখ না করলে পাপকাজ হবে।

সেটি হল—আমাদের বন্ধু-মহল। সংক্ষেপে বলতে হবে তাই স্পষ্ট করেই বলছি, হিমালয়ে যে বন্ধুত্বের পত্তন হয় তার কোন ক্ষয় মানে ডিপ্রিসিয়েশন নেই। খুবই সোজা অঙ্ক। যখনই হিমালয়ের কথা ভাবছি তখনই বন্ধুর কথা মনে পড়ছে, হিমালয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যত বাড়তে থাকে, বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও সেই পরিমাণ বাড়তে থাকে। উদাহরণ : আমাদের কৈলাসের সহযাত্রী তারাদা, তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসর গ্রহণ করে এখনও রহড়াতেই থাকেন। বৎসরান্তে একবারও দেখা করা হয়ে ওঠে না। কিন্তু নীলমণি হাজরা সমভিব্যাহারে একবার কোনক্রমে রহড়া গিয়ে পৌছতে পারলে তখনই সেখানে মানস-সরোবরের হাওয়া বইতে

শুরু করে—মনেও থাকে না যে বহুকাল পরে আমরা আবার একত্র হয়েছি।

পরবর্তীকালে পর্বত অভিযানের সময়ও একই ঘটনা ঘটেছে। এমন অন্তিকর বন্ধু জুটেছে যাদের বাদ দিলে আমার জীবনযাত্রার চেহারা কি দাঁড়াত আজ আর তা ভাবতেই পারি না। এসবকে যদি কেউ আদিখ্যেতা বলে মনে করেন তবে ভুল করবেন। এর একটা কার্যকারণ আছে। হিমালয়ে গেলে হিমালয়ের নির্জনতায় এবং দুর্গমতায়, তুষার ঝটিকায় এবং মধুর পবনে, সাধ্যের সীমা অতিক্রম করতে করতে অবশেষে অসাধ্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে---তারপরেও যাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব না হয় তাদের আত্মহত্যা করা উচিত। অবশ্য এমনটা যে সবক্ষেত্রে হতেই হবে তার কোন মানে নেই। না হতেও পারে, আমরাও সব্বাইকে বন্ধু করে নিতে পারিনি। এটাকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে, আমরা বলি--হিমালয়ের মর্জি। হিমালয়কে সবসময় হিমালয়ের আইন মেনে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই।

কিন্তু সাধু সাবধান, কথার স্রোত আবার বইতে শুরু করলে ঝর্ণাধারার মতো এ-নদী সে-নদী হয়ে শেষ পর্যন্ত কোন অকূল পাথারে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। তার চাইতে বরং ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি—সেটি এক কথায় আমাদের হিমালয় অভিজ্ঞতার চুম্বকস্বরূপ।

ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের নন্দাঘুন্টি জয়ন্তী অভিযানের সময় ১৯৮০ সনে। ১৯৬০ সনের মতো এবারেও আমাদের মূলশিবির হয়েছিল খারগাটায়। বলা উচিৎ খারগাটা যেখানে ছিল তার কাছাকাছি কোথায়ও। পুরানো খারাগাটা সেই কচি ঘাসে ঢাকা সবুজ সমতলটুকু, যেখানে কেবল দুঃসাহসিক পশুপালকেরা কচিত কখনো মেষ চরাতে নিয়ে আসত, খাড়া পাহাড়ের গায়ে জায়গাটা এমনভাবে ফিট করা যে কোরবুস্যের সাহেবেরও চোখ ট্যারা হয়ে যেত, সেই খারগাটা এর মধ্যে কখন ধসে গেছে—এগিয়ে আসা রোনটি হিমবাহের উচ্ছৃঙ্খলতায় একাকার হয়ে গেছে। হিমালয় তো আর একটা নির্জীব ব্যাপার নয়—এখানেও প্রতি নিয়তই অদল-বদল চলছে।

এবারে আমাদের মূল শিবির হয়েছিল একেবারে রোনটি হিমবাহের বরফের উপরে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পাথর ও-কোবালির ছাড়াছাড়া অজস্র ঢিবি, তারই লাগোয়া দুটোর ওপর আমাদের মূলশিবির। কীচেনটা হয়েছে পাহাড়ের গায়ে—সেখানে মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে আসে বটে, কিন্তু উনানের আগুনে বরফ গলে পাতাল প্রবেশের ভয় নেই। তাঁবু থেকে কীচেনে যাবার জন্য ওই গড়িয়ে আসা ধুলো-বালি পাথর দিয়েই একটা সাঁকো বা প্যাসেজ

আছে। বুঝতে অসুবিধে নেই যে হিমালয় আমাদের জন্য আগে থেকেই সব সাবস্ত' করে রেখেছে। হিমবাহের তলা দিয়ে হুড়মুড় করে রোনটি নদী বয়ে চলেছে, আরও মাইল দুয়েক বরফের তলায় ফল্গুধারা হয়ে বয়ে যাবার পর নদী-রূপে আত্মপ্রকাশ করবে—তারপর ঋষিগঙ্গা, তারপরে ধৌলীগঙ্গা, তারপরে অলকানন্দা, তারপরে গঙ্গা আর তারও অনেক পরে হুগলি! রাত্রির নিঃঝুমতায় অনেক গভীর থেকে জলের গোঁ গোঁ শব্দ বুকের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়, থেকে থেকে ঝপাস ঝপাস করে বরফের চাই ভেঙে পড়ে। এখন ফিরে এসে এসব কথা লিখতে যত রোমাঞ্চকর লাগছে তখন কিন্তু ততটা লাগেনি। এক কথায় এবারে আমাদের মূল শিবিরটি হয়েছিল একেবারে হিমালয়ের ক্রোড়ের মধ্যে।

আগের দিন সারারাত বরফ পড়েছে এবং তারপরে যেমন হয়—একেবারে স্ফটিকের মতো ঝকঝকে সকাল। উত্তর দিকে ঋষিগঙ্গা পাসের প্রাধার পেরিয়ে সুদূরে জাসকার পর্বতমালার তুষারশৃঙ্গগুলি জটলা পাকিয়ে আছে। কামেট আর মানা-কে চিনতে কোন অসুবিধাই হয় না। ১৯৬৬ সনে মানা-য় একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেই থেকে পাহাড়টিকে স্বপ্নে দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না।

রোনটি নদী দেখতে ক্ষীণাঙ্গিনী বটে, কিন্তু প্রতাপে বাঙালী গৃহবধূর চাইতে কম যায় না। ছুরির ফলার মতো পাহাড় কেটে বেরিয়ে গেছে। হিমবাহটিও একই চরিত্রের। দুদিকের দুটো খাড়া গিরিশিরার মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ একটু পথ কেটে নিয়ে যেন হঠাৎ একটা বরফের বিস্ফোরণ। এত সাদা যে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

মূলশিবিরে দক্ষিণমুখো হয়ে বসলে সামনেই এক মনোরম দৃশ্য। হিমবাহটির পূর্ব পশ্চিম দুদিক থেকে খাড়া দুটি পর্বতগাত্র উপরে উঠে গেছে। তিন থেকে চার-সাড়ে চার হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত। এবড়ো-খেবড়ো গিরিগাত্র—অধিকাংশ জায়গাতেই বরফ দাঁড়াতে পারে না—যেখানে পারে সেখানে ছাকড়া-ছাকড়া বরফ জমে আছে। কোথাও হয়তো পাথরের ফাঁক-ফোকড় দিয়ে অতিক্ষীণ কোন স্রোতস্বিনী বেরিয়ে এসে স্বল্প-পরিসর একটু জায়গায় কিছুটা পলিমাটি জমিয়েছে—সেখানে কয়েকটি পাইন গাছ জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বৃক্ষরাজ্যের এই ছিটমহলগুলো প্রকৃতিরই খেয়ালে কেমন করে হঠাৎ সবুজের এলাকার বাইরে এসে পড়েছে। দুর্ভোগ ওই গাছগুলোর—তুষার-ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, বছরের অন্তত অর্ধেকটা সময় তো বরফের তলায় আবক্ষ নিমজ্জিত

হয়ে থাকতে হয়। ডালপালাগুলি পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পায় না, হেজে যায় এবং ভেঙে পড়ে। অন্নজানের অভাব তাই শরীরের কোন বাড় নেই। পাতা-গুলো লোলচর্মের মতো নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, ক্রমাগত ঝরে পড়ছে। কিন্তু এত প্রতিকূলতা সত্ত্বে গাছগুলো রণে ভঙ্গ দেয়নি—তার কোন লক্ষণই নেই। পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও এমন প্রাণপণ করে লড়াই চালিয়ে যাওয়া—বাহাদুর বটে। কেউ যেন মনে না করেন যে গাছ নিয়েও আমরা একটাহি আদিখ্যেতা করলাম। হিমালয়ের একটি গাছ যে কতো কথা বলে, ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের লেখা দি ট্রি প্রবন্ধটি পড়লে তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে কোনদিন যদি সাব্যস্ত হয় যে গাছ কথাও বলে এবং একটু সাধনা থাকলে তা মানুষের শ্রুতি-গোচরও হয়, তবে আমরা অন্তত বিস্মিত হব না।

যে কথা বলছিলাম, এই সবকিছু ডিঙিয়ে গিরিগাত্র দুটি আরও উপরে উঠে গেছে—মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে আকাশের অসীমতায়। ঢেউয়ের মতো ধাপে ধাপে। মূলশিবিরের পরেও প্রায় আধ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত হিমবাহের উপর ধুলোবালি-জমে আছে—তাকালে চোখ বিস্বাদ হয়ে যায়।

কিন্তু তার পরেই তুষার শুভ্রের দেশ। গিরিগাত্র দুটি যেখানে একটা বাঁক নিয়েছে—প্রায় সতেরো হাজার ফুট উচ্চতায়—হিমবাহের শ্বেতশুভ্র ধারাটি সেই পর্যন্ত উঠে গিয়ে তারপরে হঠাৎ হারিয়ে গেছে। তার পরেই আকাশ—স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নীল-নির্মল আকাশ। আর তারও পরে দূর আকাশের গায়ে বেপরোয়া হিমালয়ের রোদরঞ্জিত তুষার শ্রেণী। এসব সময়ে সবকিছুকে বেশ অর্থবহ বলে মনে হয়।

সে যাই হোক, ঘটনার দিন সকালবেলা অন্যান্যদিনের মতোই দলের পর্বতারোহী সদস্যরা ও মালবাহকেরা রসদপত্র নিয়ে এক নম্বর শিবিরের পথে রওয়ানা হয়ে গেছে। শিবির একেবারে নিঃঝুম। পাহাড়ের গায়ে কীচেনে সুবিমল কুক গোবিন্দ সিংকে রন্ধনবিদ্যা শেখাচ্ছে ও মাঝে মাঝে চা-টা পাঠিয়ে দিচ্ছে, সুবিমল বড় ভালো ছেলে। দূর থেকে ওদের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসছিল। আমি হিমবাহের মাঝখানে তাঁবুর ছায়ায় হাওয়া বাঁচিয়ে পাথরের উপর আধশোয়া হয়ে আছি। এবারে সঙ্গে করে ভাইপোর টেপ রেকর্ডটা নিয়ে এসেছি, আর দেবব্রত-সুচিত্রা-হেমন্ত-কণিকার কিছু বাছাই করা রবীন্দ্রসঙ্গীতের টেপ। অভিযানটা আবার জয়ন্তী অনুষ্ঠানও কিনা তাই সব কিছুরই ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে।

রওয়ানা হয়ে যাবার বেশ অনেকক্ষণ পরে গোরা সিং হঠাৎ উপর থেকে একা নেমে এল। না, পথে কোন বিপদ ঘটেনি, সাহেবরা কিসব ছেড়ে গেছে তাই সংগ্রহ করতে এসেছে। এই গোরা সিং কুড়ি বছর আগে প্রথম নন্দাঘুন্টির সময় আমাদের সঙ্গে ছিল। সেই সৌকুমার্য আজ আর অবশিষ্ট নেই, এখন ওকে দেখলে সেই পাইন গাছগুলোর কথা মনে হয়—তেমনি জরাজীর্ণ ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু লড়াই থামেনি। কিছুক্ষণ পরে গোরা সিং আবার উপরের পথে রওয়ানা হয়ে গেল পিঠে বোঝা নিয়ে।

টেপরেকর্ডার একটার পর একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত বেজে চলেছে প্রেম, পূজা, প্রকৃতি কোন ভেদাভেদ নেই। অলস চোখে হিমবাহের দিকে তাকিয়ে আছি। অনেকক্ষণ পরে গোরা সিং হিমবাহের শ্বেতশুভ্র জায়গাটায় গিয়ে পৌছল, অতিক্রম করতে থাকল। পিঠের বোঝায় একটু নুয়ে পড়েছে, একেবারে একা, চড়াই-উৎরাই পথ। মাঝে মাঝে উৎরাই পথে মিলিয়ে যাচ্ছে, তার পরেই আবার ক্রাম্পনে চড়াই ভেঙে উপরে উঠে আসছে। ক্রমশ আরও উপরে। আরও দূরে বেথরতোলির হিমরেখা। গোরা সিং এগিয়ে চলছে।

এমন একটা অভিজ্ঞতার জন্য সারাজীবন হিমালয়ে কাটিয়ে দিতে রাজি আছি। হিমালয়ের হিসেব মেলানো কোন সমিতিভুক্ত হিসেবরক্ষকের কর্ম নয়।

চরৈবেতি